NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

EPA

PAPER VI
MODULES 21-24

ELECTIVE PUBLIC
ADMINISTRATION
HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধীতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয় পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপিকা (ড.) মণিমালা দাস
উপাচার্য

প্রথম পুনর্মুদ্রণ জুলাই, 2011

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক জন-প্রশাসন (ষষ্ঠ পত্র) সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ ই. পি. এ. —২১-২৪

	রচনা	সম্পাদনা
একক ১-৮	অধ্যাপক নির্মলা মজুমদার	অধ্যাপক সুনীল রায় চৌধুরী
একক ৯-১৬	সুনীল রায়চৌধুরী	ড. রাধারমণ চক্রবর্তী

[এই রচনায় প্রভূত সাহায্য করার জন্য অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য, ড. রাধারমণ চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক অমিয় চৌধুরী লেখকদের কাছে ধন্যবাদার্হ]

ঘোষণা

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) বিকাশ ঘোষ
কার্যনির্বাহী নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ই. পি. এ.—৬

ঐচ্ছিক জন-প্রশাসন

পর্যায়
২১

একক ১ □ রাষ্ট্রের অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার প্রশাসন ৯—২০

একক ২ □ বাজেট ঃ নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী ২১—৩১

একক ৩ □ কর্মভিত্তিক বাজেট ৩২—৪০

একক ৪ □ শূন্যভিত্তিক বাজেট ৪১—৫১

পর্যায়
২২

একক ৫ □ অর্থমন্ত্রক ঃ বাজেট প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ৫৫—৬৮

একক ৬ □ বাজেট গ্রহণ ৬৯—৭৬

একক ৭ □ আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি ৭৭—৮৪

একক ৮ □ সরকারি গণিতক কমিটি ৮৫—৯১

পর্যায়
২৩

একক ৯ □ জন-প্রশাসন ঃ আর্থিক প্রশাসন ব্যবস্থা ৯২—৯৮

একক ১০ □ রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস ঃ কর-ব্যবস্থা ৯৯—১২২

একক ১১ □ রাষ্ট্রীয় ব্যয় ১২৩—১৩০

একক ১২ □ ভারতের আর্থিক প্রশাসন ব্যবস্থা ১৩১—১৩৭

পর্যায়
২৪

একক ১৩ □ রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসন ব্যবস্থা ঃ বাজেট ব্যবস্থা ১৩৮—১৪৮

একক ১৪ □ কেন্দ্রীয় বাজেট প্রণয়ন, অর্থ কমিশনের সুপারিশ ও ভারতের রাষ্ট্রীয় ঋণ ১৪৯—১৬০

একক ১৫ □ কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট ১৬১—১৭৪

একক ১৬ □ বাজেট অনুযায়ী অর্থ-সংগ্রহ, বিভিন্ন ব্যয় এবং আয়ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ ১৭৫—১৮৩

ভূমিকা

শিক্ষার্থী বন্ধু গণ,

জন প্রশাসন ষষ্ঠ পত্রের এটি হচ্ছে প্রথম পর্যায়।

ষষ্ঠপত্রে আর্থিক প্রশাসন সম্বন্ধে আপনারা জানবেন। আর্থিক প্রশাসন কাকে বলে তা আপনারা প্রথম এককেই জানতে পারবেন।

বিষয়টি আধুনিক অর্থনীতি-শাস্ত্রেরও অন্যতম আলোচ্য বিষয়বস্তু। তার ফলে এমন অনেক ধারণা ও শব্দের সঙ্গে আপনারা পরিচিত হবেন যেগুলি শুধুমাত্র জনপ্রশাসন বিজ্ঞানেরই আলোচ্য বিষয় নয়। বলা যায় অর্থ সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সমাজবিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলির সমষ্টিগত উদ্যোগের ফলশ্রুতি।

তবে আপনারা যেহেতু এই প্রথম বিষয়বস্তুটি পড়ছেন বলে ধরে নেওয়া যায়, সেইহেতু যথাসম্ভব সহজ করে বিষয়টি উপস্থিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, আবার এও দেখতে হয়েছে প্রাঞ্জলতা যেন অতিসরলীকরণের দোষে দুষ্ট না হয়ে পড়ে।

যখন কোন বিশেষ শব্দ বা ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে, তখন তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও আপনারা প্রয়োজনীয় পুস্তক বা সংশ্লিষ্ট পরামর্শদাতার সাহায্য নেবেন আশা করা যায়। তা সত্ত্বেও সবকিছু খুঁটিয়ে বুঝতে না পারলে তা যেন আপনাদের পক্ষে অস্বস্তিকর না হয়ে ওঠে। কারণ এই মুহূর্তে এটাই স্বাভাবিক।

আমরা প্রথম পর্যায়ের পাঠ্যসূচী যে ভাবে বিন্যস্ত করেছি তা নিম্নরূপ ঃ

একক-১ ঃ অর্থ সংক্রান্ত প্রশাসন, বিশেষত রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসনের প্রকৃতি ও পরিধি।

একক-২ ঃ বাজেট ঃ নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী তথা শ্রেণী বিন্যাস। এই শ্রেণী বিভাগের মধ্যে রাজস্ব ও পুঁজিকেন্দ্রিক বাজেট নিয়ে আমরা বিশেষীকৃত আলোচনা করব।

একক-৩ ঃ কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থা সমগ্র পৃথিবীতে এখন গুরুত্ব অর্জন করেছে। তৃতীয় এককে এই বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

একক-৪ ঃ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, মন্দা ও সম্পদের স্বল্পতা রাষ্ট্রগুলিকে এখন বাধ্য করেছে ব্যয় সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী গুণগতভাবে পরিবর্তন করতে এই কারণে চতুর্থ এককে শূন্যভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একক ১ ❑ রাষ্ট্রের অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার প্রশাসন ঃ প্রকৃতি ও পরিধি

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ সংজ্ঞা তথা অর্থনির্ধারণ
১.৪ আর্থিক প্রশাসন ঃ গুরুত্ব
১.৪.১ গুরুত্ব প্রসঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষাপট
১.৫ আর্থিক-জনপ্রশাসনের প্রকৃতি
১.৫.১ ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গী
১.৫.২ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী
১.৬ অনুশীলনী - ১
১.৭ আর্থিক জনপ্রশাসনের পরিধি
১.৭.১ পরিধি-সামগ্রিক ও বৃহত্তর রূপ
১.৭.২ পরিধি আলোচনার অপর একটি পদ্ধতি
১.৮ অনুশীলনী - ২
১.৯ সারাংশ
১.১০ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
১.১১ উত্তর সংকেত
১.১২ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারবেন ঃ

- আর্থিক প্রশাসনের সংজ্ঞা
- রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী আর্থিক প্রশাসনের প্রধান পার্থক্য সমূহ
- আর্থিক প্রশাসনের গুরুত্ব
- আর্থিক প্রশাসনের প্রকৃতি, প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহ্যগত ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং
- আর্থিক প্রশাসনের পরিধি ও পরিধি সংক্রান্ত আলোচনার বিবর্তিত রূপ।

১.২ প্রস্তাবনা

রাষ্ট্র নামক সামাজিক সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় অথবা সমাজের অন্যান্য সামাজিক সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কিংবা পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্থসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সেই সিদ্ধান্তের বাস্তব প্রয়োগমূলক প্রবাহমানতা বজায় রাখা জীবদেহে রক্তচলাচল ব্যবস্থার মতই জরুরি।

উপরিউক্ত যে কোন ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে ব্যক্তিগত শ্রম, দ্রব্য, প্রযুক্তি জ্ঞান বা মূল্যবোধের অনুপ্রবেশ ঘটানো প্রয়োজন। আবার এগুলির প্রতিস্থাপন বা সংরক্ষণও জরুরি। এই সবগুলির জন্যই অর্থের ক্রমানুগত যোগান প্রয়োজন। এই যোগানের উৎস সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, উপরিউক্ত বিভিন্নক্ষেত্রে তার বন্টন সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, বন্টিত অর্থব্যয়ের নীতি নির্ধারণ, ব্যয়িত অর্থের হিসাব রক্ষার পদ্ধতি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ—এগুলি ক্রমশ প্রয়োজনীয় আলোচ্যসূচী হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু আর্থিক প্রশাসন নয়, রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসনই আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু। রাষ্ট্র সমাজে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহারকারী কর্তৃত্ব এবং অন্তত তাত্ত্বিকভাবে মনে করা হয় যে এই ক্ষমতা সমাজকে পরিচালনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হবে। পরিচালনার নীতি সংক্রান্ত বিষয় জটিল বিতর্কের জালে আবদ্ধ যা আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু নয়।

কিন্তু বৃহত্তম সমাজিক সংগঠন হিসাবে ও পরিচালনার নীতি সংক্রান্ত বিষয় পারস্পরিক জটিলতম অবস্থানের কারণে অর্থ সংগ্রহ, বন্টন ও হিসাব রক্ষণ পদ্ধতিও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে জটিল হয়ে পড়ে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে রাষ্ট্রের কাজ সমাজব্যবস্থা পরিচালনায় নেতৃত্ব দেওয়া। এক্ষেত্রে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গদের জীবনধারার অন্যতম মূল ভিত্তিভূমি হিসাবে উৎপাদন, জীবিকা ও আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি রাষ্ট্রের মূল বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। ব্যাপারটিকে খুব সহজ ভাবে লয়েড জর্জ (Lioyd George) এইভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ "Government is finance"।

আমরা এখন নিশ্চই বুঝতে পারছি যে কেন জনপ্রশাসন বিজ্ঞান বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসনকে অনুধাবন করছে। তবে গুরুত্বের বিষয়টি ১.৪ এককে আমরা আর একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

১.৩ সংজ্ঞা তথা অর্থ নির্ধারণ

প্রস্তাবনা অংশেই রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসন নামক বিদ্যার সাধারণ অর্থের ইঙ্গিত আপনারা পেয়েছেন। এখানে ব্যাপারটিকে আর একটু বিস্তৃতভাবে বোঝার চেষ্টা আমরা করব।

দুটি প্রচলিত সংজ্ঞার উল্লেখ প্রথমে করা যাক ঃ

(ক) এল. ডি. হোয়াইট - এর (L. D. White) মতে — "রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক প্রশাসন হচ্ছে এমন একটি কার্য্যক্রম যার দ্বারা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরগুলিতে অর্থবরাদ্দ করা সম্ভব হয় যা সেই দপ্তরগুলি আইনসঙ্গতভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করবে"।

(খ) জ্যাজ গ্যাসটনের (Jaze Gasten) মতে আর্থিক প্রশাসন হচ্ছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সমষ্টিগত রূপ (i) অর্থ সংগ্রহ, সংগ্রহ ও বিতরণ, (ii) অর্থ তথা কর সংগ্রহ ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, (iii) রাষ্ট্রের তরফ থেকে

ঋণ গ্রহণ বা প্রদানের কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণ, (iv) বিভিন্ন সরকারি দপ্তরগুলির আর্থিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ।

আর্থিক প্রশাসন সংক্রান্ত যে পুস্তকই আপনারা পাঠ করুন না কেন প্রত্যেকটিতেই প্রদত্ত সংজ্ঞার একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সম্বন্ধে আপনাদের সচেতন থাকতেই হবে। সংজ্ঞা যাঁরা প্রদান করেছেন তাঁরা সেই দিকগুলিকেই তুলে ধরেছেন যে গুলি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কাজ বলে তাঁদের মনে হয়েছে।

কিন্তু অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক অর্থনীতির চরিত্র প্রতিনিয়ত নতুনতর গুণগত চরিত্র সমন্বিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী হিসাবে আপনাদের নিজেদের বোধকে সর্বদাই উন্মুক্ত রাখতে হবে এই কারণে যে রাষ্ট্রের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রগুলি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং আপনারা নিজেরাই প্রকৃত সংজ্ঞা নির্মান-কর্তা।

অনেকটা এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় G. S. Lall - এর "Public Finance and Financial Administration in India" নামক গ্রন্থে যেখানে তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অর্ন্তগত সমস্ত সদস্যের আর্থিক নিশ্চিন্ততা ও সমৃদ্ধির দ্যোতক - রাষ্ট্রের তরফ থেকে এই রকম যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসনের বিষয়বস্তু হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করতে চান। তবে রাষ্ট্রের সব আর্থিক সিদ্ধান্তই জনমঙ্গলকর হবে তার কোন মানে নেই, আর তা না হলে তাকে আর্থিক জনপ্রশাসনের অর্ন্তগত করা যাবে না তাও ঠিক নয়।

আপনাদের কাছে হয়ত রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসনের মূল অর্থ আরো পরিস্ফুট হবে যদি বেসরকারি আর্থিক প্রশাসনের সঙ্গে-এর পার্থক্যের দিকগুলি তুলে ধরা যায়।

জন-আর্থিক প্রশাসন	বেসরকারি আর্থিক প্রশাসন
১। ব্যয়ের সঙ্গে আয়ের সামঞ্জস্য বিধান	১। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান
২। জনগণের নিয়ন্ত্রণ	২। ব্যক্তিগত বা সংস্থাগত নিয়ন্ত্রণ
৩। ক্রম প্রসারণশীল সম্পদ আহরণের ক্ষেত্র	৩। সম্পদ আহরণের নির্দিষ্ট সূত্র
৪। সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা	৪। শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতার অনুপস্থিতি
৫। ঘাটতি বাজেটের প্রবণতা	৫। ভারসাম্যমূলক বাজেটের প্রবণতা
৬। জনগনমুখী ব্যয় পরিকল্পনা।	৬। মুনাফার সর্বোচ্চ বৃদ্ধিকরণ।

১.৪ আর্থিক প্রশাসন ঃ গুরুত্ব

আপনাদের নিশ্চই স্মরনে আছে যে ১.২ এককে আমরা 'গুরুত্বের' বিষয়টি আর একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করব বলেছিলাম। এই অনুধাবনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করলে ব্যাপারটি আপনাদের পক্ষে সহজবোদ্ধ হবে বলে মনে হয়।

১.৩ এককে 'সংজ্ঞা' নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা মন্তব্য করেছিলাম যে আর্থিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা আন্তর্জাতিক ভাবেই দ্রুত পরিবর্তিত কর্মসংস্কৃতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এটি নিজেই একটি ঐতিহাসিক অবস্থা। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিস্ফুট হবে।

বিংশ শতাব্দীর নয়-এর দশকে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশ 'গ্যাট' (GATT-General Agreement

on Trade and Tariff) চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়, ফলে 'বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনের (WTO-World Trade Organisation) কর্তৃত্বাধীনে আসে ও 'কাঠামো' 'পুনর্বিন্যাস কর্মসূচী (Structural adjustment programme) গ্রহণ করে। ভারতীয় আর্থিক প্রশাসনে মূলত ১৯৯১ সালের পরবর্তী সময়কাল থেকে এগুলির প্রভাবের প্রত্যক্ষ অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু এটি হচ্ছে গুরুত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে আধুনিকতম অবস্থা। অন্তত আধুনিক যুগের সূত্রপাতের সময়কাল থেকে গুরুত্ব নির্ধারণের বিষয়টি আমরা বুঝে নিতে পারি।

(১) রেনেশাঁ ও শিল্পবিপ্লবোত্তর আধুনিক যুগে কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে গঠিত বৃহদায়তন জাতীয়তাবাদী সার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম দেয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিকতাবাদের ক্রমান্বয়িক বিস্তার ঘটে অভ্যন্তরীণ বাজার ও জাতীয়তাবাদের স্বার্থেই। এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসন সংক্রান্ত নীতি ও তার বাস্তব প্রয়োগের চরিত্র স্বভাবতই ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থার পূর্বতন যুগগুলির তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন গুণগত চরিত্রের।

(২) বিকাশের এই প্রাথমিক পর্বে উদারনৈতিক বাজার অর্থনীতিতে রাষ্ট্র Laissez-faire নীতি অনুসরণ করে চলত, যার অর্থ রাষ্ট্র সমাজব্যবস্থার সবদিকে সর্বাধিক কম হস্তক্ষেপ করবে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্ব থেকে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রগুলিতে জনপ্রিয়তা অর্জন করে, এমন কি স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিও এই অনুকরণ করা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারেনি। আর্থিক জনপ্রশাসনের গুরুত্ব এর ফলে নতুনতর মাত্রা পায়।

(৩) আমরা জানি যে, ১৯২৯-৩৩ পর্বে উন্নত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রবল অর্থনৈতিক মন্দার সূত্রপাত হয়। সামাজিক ন্যায়, সাম্য জনগণের জীবনযাত্রার একটি ন্যূনতম মান রক্ষণাবেক্ষণ, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি এবং কৃষি ও শিল্প অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের সপক্ষে অর্থনীতিবিদ্ কেইনস্ এর তত্ত্ব সর্বাধিক গুরুত্ব অর্জন করে। এগুলির সুচারু পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয় অনুৎপাদক নয় বলে প্রতিভাত হয়। এই সমস্ত চ্যালেঞ্জটি আর্থিক প্রশাসন বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে হয়।

(৪) আর্থিক জনপ্রশাসনের গুরুত্বের একটি রাজনৈতিক দিকও আছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাস্তবায়নের জন্য জনপ্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি গৃহীত হওয়ার পর সরকারি আয় ও ব্যায়ের অনুমোদন প্রতিনিধিসভার মাধ্যমে হওয়ার পদ্ধতি সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয়।একে রুশো কথিত জনপ্রিয় সার্বভৌকিতার ধারণার অন্যতম বাস্তবায়ন বলা হয়।

(৫) পরিকল্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনা জনপ্রশাসকের কাজের চরিত্র পরিবর্তিত করেছে। এখন আর্থিক বন্টন ও তার উপর নিয়ন্ত্রণই একমাত্র কাজ নয়, আর্থিক জন প্রশাসনকে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও নিতে হয়। এই কারণেই "Performance Budget" বা কর্মভিত্তিক বাজেটের ধারণার সূত্রপাত হয়েছে।

১.৪.১ গুরুত্ব প্রসঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষাপট

সাধারণভাবে এশিয়া আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাগুলিকে তৃতীয় বিশ্ব বলা হয়। মূলত ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের অধীনে দীর্ঘদিন এদের অতিবাহিত করতে হয়েছে এবং ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ এদের শিল্প ও ভূমি ব্যস্থার উপর রাষ্ট্রীয় আধিপত্য বিস্তার করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধ তির জন্ম দিয়েছে।

যেমন ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব পর্যন্ত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের জন্য বেশ কয়েকটি পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করেছিল।

স্বাধীনতার পর এই দেশেগুলি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলায়। যেমন—মিশ্র অর্থনীতি, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন ধরণ, জনকল্যাণকর অর্থনীতি, সোভিয়েত ধাঁচে পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রণয়ন ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই আর্থিক জনপ্রশাসন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃত্বে পরিণত হয়।

তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রশাসন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক বিন্যাসের সঙ্গেও কয়েকটি কারণে যুক্ত হয়ে পড়ে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উপস্থিতি তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রে যে অসংখ্য নতুন সমস্যার জন্ম দেয়, কতকগুলি উদাহরণ দিলে তা পরিস্ফুট হবে। বিশ্বায়ন ও শ্রম, বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি, বিশ্বায়ন ও খাদ্য-নিরাপত্তা ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা অথবা প্রতিরোধ করা শুধুমাত্র রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়ই নয়, আর্থিক জনপ্রশাসনও কোন না কোনভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। বস্তুত সমাজ বিজ্ঞানের কোন শাখাকেই এখন আর বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করা যায় না।

১.৫ আর্থিক জনপ্রশাসনের প্রকৃতি

এই বিষয়টিকে আমরা দু'টি দিক থেকে অনুধাবন করার চেষ্টা করতে পারি। এগুলি হল, (১) ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গী, (২) আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী। বিশ্বব্যাপী সমাজব্যবস্থাগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিরপেক্ষভাবে যত বেশি উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং বিশ্ববাণিজ্য অর্থনীতি যত বেশি গুরুত্ব অর্জন করছে তত বেশি ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব হারাচ্ছে।

১.৫.১ ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গী

এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে 'রক্ষণশীলতা' শব্দটি ব্যবহার করলে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সঠিকভাবে অনুধাবন করা আপনাদের পক্ষে সহজসাধ্য হবে।

এখানে রক্ষণশীলতা বলতে বোঝান হচ্ছে আর্থিক প্রশাসনের সেই প্রকৃতিগত বিন্যাসকে যেখানে এর স্বাধীন স্বকীয় অস্তিত্বকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত বিন্যাসের মধ্যে তা ক্রিয়াশীল সেটি মূলত বিবেচ্য নয়।

ব্যাপারটির সরলীকৃত উপস্থাপনা এই রকম ঃ (১) রাষ্ট্রের কর্মকান্ড বৃহৎ এবং তা অসংখ্য রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। আর্থিক প্রশাসন তথা প্রশাসকের কাজ হচ্ছে বিত্ত সংগ্রহ ও সংগ্রহের নতুন ক্ষেত্র আবিস্কার, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে তার বন্টন ও সংগঠনগুলির সঠিক বিকাশ ও কার্যকারিতার জন্য তাদের আর্থিক কাজকর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ।

(২) এই ব্যাপারটিকেই ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গীর (systems analysis) দিক থেকে একটি স্বতন্ত্র উপব্যবস্থা বলে অভিহিত করা চলে।

(৩) আর্থিক প্রশাসনের এই প্রকৃতি যে চিরায়ত তাত্ত্বিকদের (Pure theorists) বক্তব্যে পরিস্ফুট হয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন সেলিগম্যান (Seligman)। তাঁর মতে আর্থিক প্রশাসন সরকারি আয়, ব্যয় ও ঋণ নিয়ে বিষয়গতভাবে আলোচনা করবে এবং এক্ষেত্রে কোন মূল্যবোধ অথবা যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হবে না।

(৪) এর ফলে ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মূল্যবোধ নিরপেক্ষতার একটি ধারাবহিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, আর্থিক প্রশাসনের আর এক দিকপাল জ্যাজ গ্যাসটন (Jaze Gaston) স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে গিয়েও বস্তুত সেলিগম্যান-এরই প্রতিধ্বনি করেছেন যখন তাঁর মতে আর্থিক প্রশাসনের একমাত্র কাজ হচ্ছে সরকারি অর্থ সংগ্রহ, রক্ষা ও বিতরণ করা।

তবে সেলিগম্যান বা গ্যাসটনের পুস্তক সংগ্রহ করে পড়ে নেওয়া প্রাথমিকভাবে আপনাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হতে পারে। এই এককটির শেষে উল্লিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করাই সেক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে।

১.৫.২ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী জনপ্রশাসনশাস্ত্রের বৃহত্তর জগৎ থেকে আর্থিক প্রশাসনকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করে না। জনপ্রশাসনের সমস্তক্ষেত্রে নিয়োজিত সমস্ত ব্যক্তির কার্যকলাপকেই আর্থিক প্রশাসনিক কার্যকলাপের আওতাভুক্ত করা চলে। কারণ সরকারি প্রশাসনে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গরা ক্রমান্বয়ে যে সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছে তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর্থিক প্রশাসনিক চরিত্র বহন করে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে সরকারি প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ তথা আমলাতন্ত্র বলতে সাধারণভাবে প্রশাসনের নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের ধরা হয় না।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী মূল্যবোধ নিরপেক্ষতার পূর্বতন দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করেছে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃতিকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করতে পারি।

(১) জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে সমানতাধর্মী মান আনয়ন করা আধুনিক আর্থিক প্রশাসনের অন্যতম কাজ। সামাজিক স্তর বিন্যাসের বিস্তৃত পরিধিকে কমিয়ে আনা এর লক্ষ্য। এক্ষেত্রে আর্থিক নীতিকে এমনভাবে রূপায়ণ করা হয় যাতে সম্পদশালীদের কাছ থেকে বিত্ত অধিক হারে আহরণ করা যায় যা দরিদ্রদের স্বার্থে অধিকাধিক ব্যবহৃত হতে পারে।

(২) আধুনিক আর্থিক প্রশাসনের কর্মনির্বাহী ভূমিকা আছে। এর দুটি অর্থ।

(ক) কোন একটি আর্থিক ব্যবস্থা নিজে থেকে ক্রিয়াশীল থাকে না। প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা আরোপ, তার বিতরণ ও নিয়ন্ত্রণ আর্থিক ব্যবস্থার চলমানতা বজায় রাখে।

(খ) এই চলমানতার সঙ্গে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ক্রমান্বয়ে সংযোজিত হতে থাকে। এদের মধ্যে মূল বিষয় হচ্ছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও জীবিকার ব্যবস্থা করা।

(গ) অর্থনীতিকে গতিশীল করে তোলা অর্থনৈতিক প্রশাসকের অন্যতম কাজ। বিনিয়োগের ক্রমানুগত প্রবাহমানতা বজায় রাখা এবং তার যথোপযুক্ত ব্যবহার জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। আধুনিক অর্থনৈকি প্রশাসকের এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রায় বাধ্যতামূলক।

(ঘ) একটি দৃঢ়বদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বার্থে আধুনিক অর্থনৈতিক প্রশাসককে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় এবং বাজারে পণ্যের মূল্যের স্থিরতা বজায় রাখার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এরজন্য রাজস্ব সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন

হয়ে পড়ে।

(ঙ) আধুনিক রাষ্ট্রকে উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করতে হয়। এর দুটি দিক আছে। প্রথমতঃ বেসরকারি কর্তৃত্বাধীন উৎপাদন ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেওয়া এবং সে ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন উৎপাদন ব্যবস্থাকে কোন কোন ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়া ও তৎসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ।

উভয়েরই লক্ষ্য জনকল্যাণের বৃদ্ধি। আধুনিক অর্থনৈতিক প্রশাসনকে এই কাজটিও দায়িত্ব নিয়ে করতে হয়। এক কথায় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আর্দশগত মূল্যবোধের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। এক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপের ধারা আমাদের ব্যাপারটি বুঝতে সাহায্য করে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা অথবা স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসৃত মূল্যবোধ অনুসরণ করে না। এটি প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈচিত্র্য ও সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধের বিভিন্নতা অর্থনৈতিক প্রশাসনের নীতির বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার জন্ম দেয়।

১.৬ অনুশীলনী -১

প্রশ্ন

(১) রাষ্টীয় আর্থিক প্রশাসনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করুন।

(২) সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রশাসনের পারস্পরিক পার্থক্য কি?

(৩) প্রশাসন বিজ্ঞানে আর্থিক প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের বিষয়টি ব্যাখা করুন।

(৪) রাষ্টীয় আর্থিক প্রশাসনের প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহ্যগত ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মূল পার্থক্য কি?

১.৭ আর্থিক জনপ্রশাসনের পরিধি

এতক্ষণ আমরা মূল যে তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি (সংজ্ঞা, গুরুত্ব, প্রকৃতি) তাদের সমষ্টিগত রূপকে পরিধি বলে অভিহিত করা যায়। এই অর্থে পরিধি নির্ণয় আপনারা নিজেরাই করতে পারেন। তবুও কাজের সুবিধার জন্য আমরা সমস্ত বিষয়টিকে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করতে পারি।

১। সংজ্ঞা বা অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে আমরা আর্থিক প্রশাসনের নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলাম—

(ক) সরকারি অর্থের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ।

(খ) সরকারি আয় (Revenue) ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা।

(গ) সরকারের প্রয়োজনে ঋণ হিসাবে অর্থ সংগ্রহ অথবা ঋণ হিসাবে অর্থ বিনিয়োগ।

(ঘ) সরকারের অর্থনৈতিক কর্মপ্রক্রিয়ায় সাধারণ নিয়ন্ত্রণ।

আধুনিক সরকারি ব্যবস্থায় উপরিউক্ত সমস্ত কাজগুলিই মূলত অর্থদপ্তর বা তার অধীনস্থ বিভাগগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যদিও অর্থদপ্তরকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃত্ব বলা যায়, তথাপি আর্থিক প্রশাসন ও অর্থ

বিভাগ— এই দুটিকে আপনারা যদি সমঅর্থবাহক বলে মনে করেন তবে ভুল হবে। অর্থদপ্তর মূলত আর্থিক ব্যবস্থার পরিচালনায় (management) রত থাকে, আর্থিক প্রশাসনে নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মূলত অর্থদপ্তরের কাজ যার জন্য তাকে বিভিন্ন রকম পদ্ধতি, প্রকরণ ও ব্যবস্থার জন্ম দিতে হয়। এই সবগুলিই আর্থিক প্রশাসনের অন্যতম অঙ্গ, কিন্তু আর্থিক প্রশাসন নিজে এর তুলনায় অনেক বৃহৎ বিষয়।

(২) তাত্ত্বিকদের আর একটি অংশ একটু ভিন্নভাবে পরিধির বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করেছেন যা নিছক আইনসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গী বলে অভিহিত হতে পারে। এক্ষেত্রে মনে করা হয় আইনসভা যে ভাবে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তাই অর্থনৈতিক প্রশাসনের আলোচ্য বিষয়বস্তু। বিপরীতদিক থেকে বলা যায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসনবিভাগীয় আর্থিক কাজকর্ম যেভাবে আইনবিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও তার কাছে দায়বদ্ধ তাই আর্থিক প্রশাসনের বিষয়বস্তু । এক্ষেত্রে আইন বিভাগের নির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব আছে এবং বিভিন্ন প্রকরণ-পদ্ধতি তাকে অনুসরণ করতে হয়। এগুলির বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অপ্রয়োজনীয়।

কিন্তু আমরা আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে পারি যে রাষ্ট্রীয় অর্থিক ব্যবস্থাপনায় আইন সভার ভূমিকা আনুষ্ঠানিকতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। রাজনৈতিক শাসনবিভাগ, আমলাতন্ত্র, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার চরিত্র এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে আইনসভার গুরুত্বের ক্রমহ্রাসমানতার কারণ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

এছাড়াও আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে 'সংজ্ঞা' ও 'প্রকৃতি' সংক্রান্ত আলোচনার পরে, আমরা নিছক আইনগত আনুষ্ঠানিক পরিধির বিপরীতে, 'মূল্যবোধের' গুরুত্বের কথা বলেছিলাম।

(৩) রাষ্ট্রীয় বাজেটের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক প্রশাসনের পরিধি নির্ণয়ের একটি পদ্ধতিগত কার্যক্রম চালু আছে। এর মূল বক্তব্য হ'ল বাজেট প্রণয়ন, গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন আর্থিক প্রশাসনের কাজ। কিন্তু বাজেট প্রণয়নের পূর্বের দীর্ঘ আর্থিক কাজকর্ম এবং বাজেট বাস্তবায়নের পর্বে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আর্থিক ফলাফল বিবেচনায় আনা দরকার। রাষ্ট্রের আর্থিক পরিকল্পনার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটটি মনে রাখা প্রয়োজন। এই জন্য নিছক বাজেট সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ থাকতে পারি না।

১.৭.১ পরিধি - সামগ্রিক ও বৃহত্তর রূপ

পরিধির একটি সামগ্রিক রূপ প্রদান করত গেলে ১.৬.১ এককে উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গীগুলির পারস্পরিক সম্মিলন যেমন প্রয়োজন, তেমনি পরিবর্তিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটি সর্বদাই স্মরণে রাখা প্রয়োজন। মূল্যবোধের প্রশ্নটিকেও আমরা ইতিপূর্বে বার বার গুরুত্ব দিয়েছি। এইভাবে নিম্নলিখিত রূপরেখাটি উপস্থাপন যোগ্য।

(১) **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা**—সীমিত অর্থে বাজেটকে আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়। কারণ সরকারের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। সেগুলির বাস্তবায়নের জন্য বাজেট অন্যতম হাতিয়ার। কিন্তু 'বাজেটকেই' একমাত্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলা ভুল। বাজেট একটি নির্দিষ্ট সময়কালে সীমিত লক্ষ্যসাধিত করতে পারে।

পূর্বতন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী, আধুনিক পরিকল্পনা ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে সুদূর প্রসারী সময়ের প্রেক্ষাপটে ভাবতে চায় এবং তার বাস্তবায়নের জন্য বাজেট একটি পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাজেট আধুনিক পরিকল্পনার একটি অঙ্গ মাত্র।

তবে বাজেট ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা প্রয়োজন (Planning programming-Budgeting system)। এই পর্য্যায়ে আর্থিক প্রশাসন অর্থসংগ্রহের ক্ষেত্রে ও তার বিভিন্ন রূপ নির্ধারণ করে, ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ব্যয় কি হতে পারে তা স্থির করে, আর্থিক বিকাশের বর্তমান হার ও ভবিষ্যতে এই হারের কি প্রগতিশীল পরিবর্তন হওয়া উচিৎ তা নির্ধারণ করে এবং বিনিয়োগের পরিবর্তিত ক্ষেত্রগুলি কি হতে

পারে তা স্থির করে।

(২) বাজেট — আর্থিক প্রশাসন তথা প্রশাসকের কাছে অবশ্য প্রাত্যহিক কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে অন্যতম দিশারি হচ্ছে সেই বছরের জন্য গৃহীত বাজেট। পরবর্তী এককে (একক নং ২) এই ব্যাপারটি নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব।

(৩) সম্পদ সংগ্রহ— বিভিন্ন ধরনের কর আরোপ ও তার সংগ্রহ সম্পদ সংগ্রহ কর্মের অন্তর্গত। সরকারের দাবি এবং সরকারের সমস্ত রকম দায়-দায়িত্ব বিপুল পরিমানে বেড়ে যাওয়ায় বাজেট ঘটতি (Deficit budget) সরকারি আর্থিক কর্মকান্ডের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দঁড়িয়েছে। কিন্তু ঘাটতি বাজেট একটি পদ্ধতি হিসাবে যদি অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে সে ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা বাড়ে। আর্থিক প্রশাসন এই পদ্ধতি অনুসরণ করে চললে তা ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এর মোকবিলা করা আর্থিক প্রশাসকের কাছে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। কর ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজ।

যে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেই আইন বহির্ভূত সমানুপাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরী হয়েছে। এর মোকাবিলাও প্রশাসকের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি।

বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করা রাষ্ট্রীয় সম্পদ সংগ্রহের অন্যতম পদ্ধতি। লক্ষ্য রাখতে হয় এইভাবে আহৃত সম্পদ পুঁজি হিসাবে যেন উৎপাদনমুখী কর্মে নিয়োজিত হয়। তা না হ'লে ঋণ পরিশোধ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

(৪) বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত—বর্তমান যে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিভিন্নক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করে থাকে । তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিতে শিল্পে বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম ছিল না। 'গ্যাট' চুক্তি পরবর্তী মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অবশ্য এই প্রবণতা কিছুটা পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

কোন একটি প্রকল্পে পুঁজি বিনিয়োগের পূর্বে তার আর্থিক ও সামাজিক উপযোগিতা এবং ফলাফল পর্য্যালোচনা করে নেওয়া জরুরি। আর্থিক প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত আছেন এমন যে কোন প্রশাসকের পক্ষে প্রকল্প পর্যালোচনা কি বোঝায় তা জানা জরুরি অথবা পর্যালোচনার পদ্ধতি-প্রকরণ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা জরুরি।

(৫) ব্যয় নিয়ন্ত্রণ— বিশ্বের যে কোন সরকারেরই এখন ব্যয়ের ক্ষেত্র অসীম, এর তুলনায় সরকারি সম্পদ সীমিত। সম্পদ আহরণের জন্য অনিয়ন্ত্রিত কর আরোপ অর্থনীতির তত্ত্বের দিক থেকে অবৈজ্ঞানিক । এতে পণ্যের দাম ও মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে এবং ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়ায় দুষ্টচক্র হিসাবে পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রি কমে।

অতএব সম্পদের ব্যবহার অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে করা প্রয়োজন। আর্থিক প্রশাসকের ভূমিকা এক্ষেত্রে বিপুল। প্রশাসন ঠিকভাবে এই কাজটি করছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য আইন বিভাগের কাছে দায়বদ্ধতা জরুরি।

(৬) হিসাব রক্ষণ ও পরীক্ষা—অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর শাসন ও আইন বিভাগ-উভয়ের নিয়ন্ত্রণের জন্যই এই বিষয়টি প্রয়োজন। ভারতবর্ষে এই কাজটি করে থাকে যথাক্রমে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক (Comptroller and Auditor General) এবং ভারতীয় হিসাব সংরক্ষণ ও পরীক্ষণ বিভাগ (Indian Audit and Accounts Departmet)। এদের প্রতিবেদন আইন সভায় পেশ করা হয়। প্রসঙ্গত কতকগুলি পাঠ্যপুস্তকে CAG -কে 'হিসাব তৈরি ও পরীক্ষার সর্বোচ্চ অধিকর্তা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে ঐক্যমত রাখা ভাল।

১.৭.২ পরিধি আলোচনার অপর একটি পদ্ধতি

আমরা নির্দিষ্ট ও বিস্তৃতভাবে পরিধির বিষয়টি আলোচনা করার চেষ্টা করছিলাম। অর্থনৈতিক জনপ্রশাসন-বিজ্ঞানীরা পরিধির উপরিউক্ত আলোচনাকে আরো সূক্ষ্ম ভাবে ভিন্ন পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। বিন্যাসের সেই প্রকরণটি জেনে নিলে পরিধি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান মোটামুটি পূর্ণ হতে পারে।

(১) রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসনের মূল তিনটি ক্ষেত্রকে তাত্ত্বিকরা চিহ্নিত করেছেন। এগুলি হল—

(ক) রাষ্ট্রীয় আয়

(খ) রাষ্ট্রীয় ব্যয়

(গ) রাষ্ট্রীয় ঋণ

(২) এই তিনটি উপাদান নিজেরা নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্বের জন্য অবস্থিত থাকে না, রাষ্টীয় তথা জনগনের স্বার্থে এগুলির অবস্থিতি। সেইজন্য চিন্তাবিদ্‌দের একটি অংশ উপাদানগুলির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর্থিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পরিধির অন্তর্ভুক্ত করতে চান। উদাহরণ হিসাবে POSDCORB সংক্রান্ত ধারণার উল্লেখ করা যায়, যা লুথার গুলিকের অবদান। (এই বিষয়টি আপনারা তৃতীয় পত্রের প্রথম পর্যায়ে পড়েছেন।)

Planning — অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ।

Organising — অর্থনৈতিক সংগঠন ও অর্থদপ্তর।

Staffing — অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ।

Directing — অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্দেশ বা পরামর্শ প্রদান।

Coordinating — আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান।

Reporting — অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ, যেমন-হিসাব পরীক্ষা।

Budgeting — অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শাসন ও আইন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ।

(৩) POSDCORB — এর ধারণাটিকে আবার যদি সঠিকভাবে বুঝতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোন প্রশাসনিক সংগঠনিক ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত নিম্নলিখিত ৩ টি উপাদানের সমষ্টিগত রূপ ঃ

(ক) ব্যক্তি মানুষ

(খ) কাজ ও তার কাঠামো

(গ) ব্যবস্থা ও তার পদ্ধতি

(ক) ব্যক্তি মানুষ বলতে মানব সম্পদকে বোঝান হচ্ছে। যেমন করদাতা, সরবরাহকারীগণ, সরকারি কর্মচারীগণ, রাজনীতিবিদ্‌গণ, সেবাগ্রহীতাগণ তথা সাধারণ মানুষ।

(খ) কাজ ও কাঠামো বলতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি --

আইন বিভাগ ও তার অর্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি সমূহ, ক্যাবিনেট অর্থবিভাগ, বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর সমূহ, শাসন বিভাগ, হিসাব সংরক্ষণ ও পরীক্ষণ দপ্তর।

(গ) ব্যবস্থা ও পদ্ধতি বলতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করতে পারি—

পরিকল্পনা ব্যবস্থা, বাজেট ব্যবস্থা ও তার পদ্ধতি, নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা, যেমন হিসাব সংরক্ষণ ও পরীক্ষণ। আর্থিক প্রশাসনের পরিধি সংক্রান্ত কোন আলোচনাই শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হয় না যদি না নিম্নলিখিত দুটি বিষয় উল্লখিত হয়—

(১) আর্থিক প্রশাসনের একটি বাহ্যিক পরিবেশ আছে যা প্রশাসনের উপাদানগুলিকে ক্রমাগত প্রভাবিত করতে থাকে। আর্থ-সমাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশকে এই বাহ্যিক পরিবেশ বলা যায়।

(২) আর্থিক প্রশাসনের একটি অভ্যন্তরীণ পরিবেশ থাকে। আর্থিক প্রশাসনের লক্ষ্য, মূল্যবোধ, আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি এর অন্তর্গত।

১.৮ অনুশীলনী - ২

প্রশ্ন

(১) রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসনের পরিধি আলোচনা করুন। এই পরিধি কি ক্রমপ্রসারণশীল?

১.৯ সারাংশ

সমস্ত সমাজব্যবস্থায় সাধারণ প্রশাসনের অন্যতম উপরিভাগ হিসাবে আর্থিক প্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা বুঝতে পেরেছি। আমরা এও বুঝতে পেরেছি যে সমাজব্যস্থার চরিত্র বিচারে নিরপেক্ষভাবেই উপরি উক্ত বক্তব্য সত্য।

মানবিক মঙ্গলকে চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত কর্তৃত্বে উন্নীত করতে গেলে আর্থিক প্রশাসনের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগগত বিশ্লষণ ও গবেষণা জরুরি। মূলত এই কারণেই আমরা দেখেছি যে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আর্থিক প্রশাসন বিজ্ঞান আর্থ-সামাজিক দাবির বর্দ্ধিত প্রেক্ষাপটে নিজের পরিধিকে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে চলেছে। নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্ততা থেকে সৃজনশীল মূল্যবোধের দিকে এই যাত্রা।

১.১০ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

প্রশ্নঃ

(১) রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসনের সংজ্ঞা ও প্রশাসন বিজ্ঞানে এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। এই প্রসঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষাপটটি বিশ্লেষণ করুন।

(২) আর্থিক জন প্রশাসনের প্রকৃতির বিষয়টি ঐতিহ্যগত ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করুন।

(৩) আর্থিক জনপ্রশাসনের গুরুত্ব ও প্রকৃতি আলোচনা করুন।

(৪) বিভিন্ন পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আর্থিক জনপ্রশাসনের পরিধি বিশ্লেষণ করুন।

১.১১ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী - ১

প্রশ্ন-

১— একক ১.৩

২ — একক ১.৩ (শেষ অংশ)

৩ — একক ১.৪ ও ১. ৪. ১

৪ — একক ১. ৫.১ ও ১.৫.২ এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা।

অনুশীলনী - ২

প্রশ্ন-

১ — একক ১.৩, ১.৪, ১.৪.১.

২— একক ১.৫, ১.৫.১, ১.৫.২

৩— একক ১.৪, ১.৪.১, ১.৫, ১.৫.১, ১.৫.২

৪— একক ১.৭ থেকে ১.৭.২

১.১২ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

1. Public Finance in Theory and Practice — Musgrave and Musgrave McGraw Hill. New York.
2. Financing Government —H. N. Grover — Henry Holt and Company. New York.
3. Indian Public Finance and Financial Administration — K P M Sundharam. S. Chand and Sons. New Delhi.
4. Public Finance and Financial Administration in India — G. S. Lall, Kapoor. New Delhi.

একক ২ ❑ বাজেট ঃ নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ বাজেট — সংজ্ঞা তথা অর্থ নির্ধারণ

২.৪ বাজেট — আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

২.৫ বাজেটের কাজ বা উপযোগিতা

২.৬ অনুশীলনী - ১

২.৭ বাজেট — দৃষ্টিভঙ্গী তথা শ্রেণীবিন্যাস

২.৭.১ উদ্দেশ্যভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

২.৭.২ কর্মনির্বাহী শ্রেণীবিভাগ

২.৭.৩ অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ

২.৭.৪ কর্মনিবহী ও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের সম্মিলিত রূপ

২.৭.৫ হিসাব রক্ষামূলক শ্রেণীবিভাগ

২.৭.৫.১ উন্নয়ন ও উন্নয়ন বহির্ভূত ব্যয়

২.৭.৫.২ পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়

২.৭.৫.৩ রাজস্ব ও পুঁজি কেন্দ্রীক বাজেট

২.৮ অনুশীলনী -২

২.৯ সারাংশ

২.১০ সর্বশেষ প্রশ্নবালী

২.১১ উত্তর সংকেত

২.১২ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারবেন ঃ

- শিল্পবিপ্লবোত্তর আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বাজেট
- বাজেটের অর্থ নির্ণয়, বৈশিষ্ট্য এবং উপযোগিতা সমূহ
- বাজেট সংক্রান্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী বা শ্রেণী বিন্যাস এবং
- রাজস্ব বাজেট ও পুঁজি কেন্দ্রিক বাজেটের বিস্তৃত আলোচনা, যেহেতু পাঠ্যসূচীতে এর বিশেষ উল্লেখ আছে।

২.২ প্রস্তাবনা

বাজেট বস্তুত একটি মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যবস্থা। এই মূল্যবোধ বস্তুত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ । আমরা জানি গণতন্ত্র প্রথমে উদারনৈতিক চরিত্র নিয়ে শিল্পোবিপ্লবোত্তর পর্বে আবির্ভূত হয় এবং পরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ও তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্র অর্জন করে। কিন্তু যে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই চরিত্র নিরপেক্ষভাবে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়। বাজেট হচ্ছে এই দায়বদ্ধতার একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি।

এই অর্থে বলা যায় বাজেট সংক্রান্ত সরকারি ব্যবস্থাপনার আবির্ভাবের একটি ঐতিহাসিকতা আছে। বাজেট বলতে এখন আমরা যা বুঝি তা মূলত আধুনিক যুগেরই ব্যবস্থাপনা।

প্রশ্ন হল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেখানে নেই সেখানে বাজেট সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার অবস্থানের চরিত্রটি কি রকম? আমাদের মনে রাখতে হবে বাজেট নিছক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গেই যুক্ত নয়, তা আধুনিক যে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার রাজস্ব আদায় এবং বন্টন কর্মপদ্ধতির নির্ধারিক হিসাবেও পরিণত হয়েছে। এই অর্থে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও বাজেট আবশ্যিক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। তবে তার সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বভাবতই কম।

সরকার কর্তৃক রাজস্ব সংগ্রহ অথবা তার ব্যয় অথবা রাজস্বের অসংখ্য উৎসের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট উৎস এবং অসংখ্য সরকারি ব্যায়ের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট ব্যয় - এর কোনটিই নিছক পারস্পরিক ভাবে বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। কারণ সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্য যদি হয় জনকল্যাণ, তবে ব্যয় নির্বাহের জন্য জনগণের উপর করের বোঝা চাপান আবশ্যক হয়ে পড়ে। এটি একটি উদাহরণ এবং সেখান থেকে এই প্রশ্ন উথাপিত হয় যে এই অবস্থাটির মধ্যে ভারসাম্য কি ভাবে রক্ষা করা যাবে? আবার মোট রাজস্ব আয় যদি জনগণের জন্য ব্যয়ের বাধ্যবাধকতার তুলনায় কম হয় সেক্ষেত্রে এই সমস্যার মধ্যেই বা ভারসাম্য কি করে রক্ষিত হবে?

যদিও আমরা বাজেটের সংজ্ঞা তথা অর্থ নিয়ে ২.৩ এককে আলোচনা করব, তথাপি উপরি উক্ত সমস্যাগুলির প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে সাধারণভাবে বাজেট হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা যার সাহায্যে সম্পদের সীমিত যোগানকে দাবির অসংখ্য বৈচিত্রের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বন্টন করার চেষ্টা করা হয়।

আধুনিক বাজেটের উদ্দেশ্য ও পরিধি বিস্তৃততর হয়েছে এবং তা জটিলতম রূপ পরিগ্রহ করেছে। বস্তুত ঐতিহাসিক পরিক্রমার পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যাপারটি ব্যাখা করা যেত, যদিও সেই বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে খুব একটা নেই। এই জটিলতার কারণ খুঁজতে হবে বাজেট সংক্রান্ত চিরায়ত বক্তব্যের মধ্যে নয়, যেখানে বলা হয়েছে বাজেট হচ্ছে সরকারি আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা (যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি), অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, নিরাপত্তা—ইত্যাদি দায়বদ্ধতার মধ্যে আধুনিক বাজেটের জটিলতার কারণকে অন্বেষণ করতে হবে। অন্য কথায় রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির সঙ্গে অর্থনৈতিক নীতির (Fiscal Policy vs Monetary Policy) পার্থক্যের মধ্যে আধুনিক বাজেটের জটিলতাকে খুঁজতে হবে।

২.৩ বাজেট — সংজ্ঞা তথা অর্থ নিধারণ

বাজেট হচ্ছে আগামী আর্থিক বছরের জন্য একটি ভবিষ্যতবাণী। এই ভবিষ্যতবাণীর মুখ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে সরকারের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ কত হতে পারে এবং ব্যয়ের সম্ভাব্য পরিমাণ কি হতে পারে তা পরিসংখ্যানগত ভাবে হাজির করা।

দ্বিতীয়ত, এই সম্ভাব্য আয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণের একটি পদ্ধতি গত কার্যক্রম তথা পটভূমি থাকে, ভবিষ্যতে সরকার কি করতে চায় বাজেট হচ্ছে তার একটি দলিল। বলা যায়, আগামী বছরের জন্য পরিকল্পিত বাজেটের প্রতিফলন পরের বছরের জন্যও প্রবাহিত হবে, যদিও পরের প্রত্যেকটি বছরের জন্য পৃথক পৃথক বাজেট হবে।

তৃতীয়ত, এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, পরিকল্পনাই বাজেট নয়, কিন্তু যে কোন বাজেটই একটি পরিকল্পনা।

চতুর্থত, এই পরিকল্পনার সূত্র ধরে যে কোন বাজেটেই কতকগুলি সার্বজনীন বিষয়বস্তুর তালিকা থাকবে (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি) এবং সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের জন্য আদায়ীকৃত রাজস্ব প্রয়োজনানুযায়ী বরাদ্দ করা হবে। এর পরেই তা ব্যয়িত হতে পারে। একই সঙ্গে রাজস্ব তথা কর আদায়ের সূত্রগুলি উল্লেখ থাকে,যাতে ব্যয়ের জন্য আয়ের পথগুলি আইনসঙ্গত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সরকারি আয়-ব্যয়ের বিষয়টি অর্থনীতি শাস্ত্রে নিজেরা আবার অসংখ্য প্রকরণে বিভক্ত, যা আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই।

পঞ্চমত, কোন একটি নির্দিষ্ট বছরের জন্য বাজেট উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি হতে পারে। সমস্ত কর ও রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ব্যয়ের তুলনায় বেশি হলে বাজেট উদ্বৃত্ত হবে, এর বিপরীত অবস্থা হলে বাজেট ঘাটতি হবে। আয় ও ব্যয় ভারসাম্য মূলকও হতে পারে। এই তিনটি ক্ষেত্রেই অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় তার প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন। এই ব্যাপারটিও এই মুহূর্তে আমাদের আলোচ্য নয়।

ষষ্ঠত, আগামী বছরের সম্ভাব্য আয় ব্যয়ের কর্মসূচী গ্রহণের প্রেক্ষাপটে বিগত বছরের আয় ব্যয়ের বাস্তব চিত্রটি প্রকাশ করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। কোন একটি আর্থিক বছরের বাজেটে বিগত বছরের কাজের হিসাব দেওয়া বাধ্যতামূলক। এইভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যারা বাজেট বরাদ্দের অংশীদার এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগ রাজস্ব ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাস্তবে যে কাজ করেছে তার অর্থনৈতিক ও পরিসংখ্যানগত চিত্র আমরা পাই।

২.৪ বাজেট — অরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

আপনারা জানেন ২.৩ এককে আমরা বাজেটের অর্থ নিধারণের চেষ্টা করেছি কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে। আপানাদের জেনে রাখতে হবে যে প্রচলিত পুস্তকগুলিতে প্রথম বৈশিষ্ট্যটিকেই সংজ্ঞা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে । বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়ে নিজেদের মতো করে সংজ্ঞা তৈরি করতে আপনারা নিশ্চই পারবেন।

পৃথিবীর সব রাষ্ট্রেই এই নির্দিষ্ট উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির বাইরে আরো কতগুলি বিশেষীকৃত বৈশিষ্ট্য দেখা যেতে পারে। যেমন ফ্রান্স ও ভারতবর্ষে ব্যয়ের উপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার প্রচেষ্টা বাজেটে লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি বিষয়ে সর্বোচ্চ ব্যয় পূর্ব-নির্ধারিত।

দ্বিতীয়ত, কোন একটি রাষ্ট্রে নয়,পৃথিবীব্যাপী সমস্ত রাষ্ট্রে, কোন একটি আর্থিক বছরের বাজেটে গৃহীত পরিকল্পনা পরিসমাপ্ত না হলে পরের বাজেটে তার স্থায়িত্ব ও প্রবাহমানতা অক্ষুন্ন থাকে। এই উদ্দেশ্যে কমা বা বেশি আর্থিক সংস্থান চলতেই থাকে। তবে আমরা চতুর্থ এককে দেখব যে এই বক্তব্য সর্বদাই ঠিক নয়।

তৃতীয়ত, বাজেটে সাধারণভাবে উপকরণের সঙ্গে উপপাদের সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা করা হয় না। অর্থাৎ

ব্যয়ের সঙ্গে প্রাপ্তি সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে কিনা তা দেখা হয় না। এই বক্তব্যও সর্বদাই ঠিক নয়।

চতুর্থত, কোন কোন দেশের বাজেটে এক ধরনের ব্যবসায়িক নীতি কাজ করে (যেমন নেদারল্যান্ড)। Accrual-based Accounting বা Deprecition Allowance -এর উদাহরণ।

পঞ্চমত, এটিও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন কোন দেশে (যেমন জাপান) রাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাজেট বর্হিভূত পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে রাজস্ব আদায় বা ব্যয়ের কোন কোন ক্ষেত্র বাজেট মুখাপেক্ষী নয় তথা বাজেটের অনুমোদনের উপর নির্ভর করে না।

২.৫ বাজেটের কাজ বা উপযোগিতা

সরকারের হাতে বাজেট একটি শক্তিশালী হাতিয়ার যার সাহায্যে বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধন করা চলে।

(১) দায়বদ্ধতা — বাজেট সংক্রান্ত আধুনিক ব্যবস্থাপনার উদ্ভবের প্রাথমিক কালে আইনবিভাগের কাছে শাসনবিভাগের দায়বদ্ধতার অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে একে দেখা হত। আয় ও ব্যায় সংক্রন্ত প্রস্তাব অনুমোদনের ভিত্তিতে আইনসভা এই কাজটি করে থাকে। একই দায়বদ্ধতা শাসন বিভাগের অথবা সরকারে যে কোন বিভাগের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে। কারণ যে কোন বিভাগের প্রশাসন পারস্পরিকভাবে স্তরবিন্যস্ত থাকে এবং বাজেটের দ্বারা বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অধস্তন বিভাগ উর্দ্ধতন বিভাগের কাছে দায়বদ্ধ থাকে।

(২) পরিচালনা— বাজেট একটি প্রশাসনিক তথা পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনাও বটে। অধুনিক পরিচালনা ব্যবস্থা অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে বাজেট পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ন, সমন্বয় সাধন, প্রতিবেদন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলি সাধন করে।

আমরা ২.৭ নং এককে কতভাবে বাজেটের শ্রেণী বিভাগ করা যায় তা সংক্ষেপে অলোচনা করব। এই শ্রেণী বিভাগ নিজেই আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থার অন্যতম আবিষ্কার এবং বিপরীত দিক থেকে এগুলি আবার পরিচালন ব্যবস্থার গবেষণাগুলির ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হয়ে থাকে। বিশেষত শূন্য ভিত্তিক বাজেট (Zero-bassed Budget) এবং কর্ম-ভিত্তিক বাজেট (Performance Budget) মূলত পরিচালনা ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩) নিয়ন্ত্রণ — নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ধারণাকে 'দায়বদ্ধতা'-র বর্দ্ধিত রূপ বলা যায়। আইনসভার সদস্যরা আর্থিক ব্যবস্থাপনার জটিলতাকে অধিকাংশ সময়েই অনুধাবন করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যাটির সমাধানকল্পে আইনসভা কমিটি তৈরি করে যা একটি বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থা হিসাবে নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টি আপনারা পর্যায়-২ -এ বিস্তৃতভাবে জানতে পারবেন।

যে কোন রাষ্ট্রীয় কাঠামোতেই আর্থিক ব্যবস্থার দৈনন্দিন কার্যকলাপকে বাৎসরিক ভিত্তিতে পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে যা একটি আলাদা বিভাগের দ্বারা সাধিত হয়। ভারতবর্ষে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক (Comptroller and Auditor Genearal) বাজেট কর্তৃক বরাদ্দ অর্থের ব্যয়ের বিষয়টি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করেন।

(৪) পরিকল্পনা — আগামী আর্থিক বছরের জন্য বাজেট একটি পরিকল্পনা সূচী। যে কোন পরিকল্পনার নিম্নলিখিত দিকগুলি থাকা আবশ্যক ঃ

(ক) তাৎক্ষণিক ও সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্যগুলির সমাবেশ,

(খ) এই উদ্দেশ্যগুলির পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ,

(গ) গুরুত্বের ভিত্তিতে উদ্দেশ্যগুলির শ্রেণীবিভাগ।

উদ্দেশ্যগুলির বাস্তবায়ন কিভাবে হবে সে সম্বন্ধে সাধারণ রূপরেখা বাজেটে সাধারণত উল্লেখিত থাকে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হয় —

(ক) সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার,

(খ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা,

(গ) আয়ের সমানতাভিত্তিক বন্টন,

(ঘ) অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা।

২.৬ অনুশীলনী -১

প্রশ্ন ঃ

(১) বাজেট বলতে কি বোঝায়?

(২) বাজেট ব্যবস্থার সাধারণ বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা করুন।

(৩) বাজেটের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

২.৭ বাজেট — দৃষ্টিভঙ্গী তথা শ্রেণীবিন্যাস

বাজেট নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী প্রণীত হয়। বাজেট কি দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী প্রণীত ও পরিচালিত হচ্ছে তা জানা জরুরি। এক্ষেত্রে বাজেটের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত আলোচনার অবতারণা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর যেকোন দেশের বাজেট এই শ্রেণী বিভাগের মধ্যে একটি বা কয়েকটির সমন্বিত রূপ অনুসরণ করে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীবিভাগ সমূহ নিম্নরূপ ঃ

২.৭.১ উদ্দেশ্যভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ (Object-wise classification)

মূলত বিগত দিনগুলিতে এই ভিত্তিতে বাজেট প্রণীত হত। এখানে সরকারি বিভাগগুলির ব্যয় সংক্রান্ত কাজকর্ম কঠোরভাবে আইনসভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে বাজেটকে কয়েকটি বিভাগে (Section) বিভক্ত করা হয় যা সরকারের সমস্ত বিভাগ এবং প্রত্যেকটি বিভাগে সমস্ত স্তরের জন্য প্রযোজ্য। প্রত্যেকটি সরকারি বিভাগ ও তার স্তরগুলির জন্য বাজেটের বিভাগ নিম্নরূপ হতে পারে—

(১) বেতন
(২) মজুরি
(৩) ভ্রমণ ভাতা
(৪) দপ্তরের বিবিধ খরচ
(৫) যন্ত্রপাতি ক্রয়
(৬) বিশেষ অনুদান ইত্যাদি।

বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়ের পারস্পরিক তুলনা এর দ্বারা হতে পারে। প্রত্যেক বছরেই যেহেতু এই তুলনামূলক চিত্রটি পাওয়া যাচ্ছে সেইহেতু প্রত্যেকটি বিভাগের কাজের ধারাবাহিকতার সঠিক পরিচয়—এর ভিত্তিতে পাওয়া যায়। বিভাগীয় কাজের গতি সন্তোষজনক না হলে সেক্ষেত্রে প্রতিকারের পদ্ধতি অন্বেষণ করার প্রক্রিয়া শুরু করা যায়।

এক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও আছে। বাজেটের পশ্চাৎগত দর্শন শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ায় যে বরাদ্দ খরচ করাই হচ্ছে প্রাজ্ঞতার লক্ষণ। ব্যয়ের পরিণতি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় নয়। এক্ষেত্রে বিভাগগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ তাদের কাজের খতিয়ানের ভিত্তিতে হচ্ছে না। অতএব পদ্ধতিগত নিয়ম ঠিকমত মানা হচ্ছে কিনা তাই মূল বিবেচ্য বিষয়। সরকারের নীতি, কর্মসূচী উদ্দেশ্য এবং এগুলির পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তাৎক্ষণিক দাবিই এক্ষেত্রে গুরুত্ব পেতে থাকে, সেই সমস্ত বিষয় যার ফল সুদূর প্রসারী তা যথোপযুক্ত গুরুত্ব পায় না।

২.৭.২ কর্ম-নির্বাহী শ্রেণীবিভাগ (Functional classification)

এই শ্রেণীবিভাগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকার যা যা কাজ করতে চাইছে তার ভিত্তিতে ব্যয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ স্থির করা। স্বভাবতই এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি গৃহীত হয়।

এর ফলে বৃহত্তর সামাজিক উপযোগিতা ও আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে মেল-বন্ধন ঘটানো সম্ভব হয়। এছাড়াও বিষয়ভিত্তিকভাবে ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায়।

ফলত প্রতিযোগিতা ও সরকারি দায়বদ্ধতার বিষয়টি অনেক স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। পরিকল্পানামাফিক উন্নয়ন ও বাজেটের বরাদ্দকে অনেক সুষম চেহারা দেওয়া যায়। এর ফলে সরকারি ব্যয়ের প্রকৃতি প্রগতিশীল হয়ে ওঠে। নিম্নলিখিত তালিকা ব্যাপারটি বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে ঃ

বিষয়	সংজ্ঞা	উদাহরণ
কাজ (Function)	সরকারি প্রচেষ্টার বিভিন্ন বিভাগ যা বিশেষীকৃত সেবা প্রদান করে।	(১) শিক্ষা (২) স্বাস্থ্য (৩) প্রতিরক্ষা (৪) কৃষি
কর্মসূচী (Programme)	কাজের এক একটি অংশ যার বিশেষীকৃত উদ্দেশ্য আছে।	(১) প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রযুক্তিগত শিক্ষা। (২) ম্যালেরিয়া দূরীকরণ কর্মসূচী।
উদ্যোগ (Activity / Project)	কর্মসূচীর স্বতন্ত্র বিভাগ সমূহ যা এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মদ্যোগ	(১) স্কুল গৃহ নির্মাণ (২) বীজ-সার ক্রয়

'কাজ', 'কর্মসূচী', 'উদ্যোগ' ইত্যাদি শব্দগুলির যদিও নির্দিষ্ট অর্থ আছে, তবুও কোন কাজ করার ক্ষেত্রে কঠোর ভাবে শব্দগুলির নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে তার কোন মানে নেই।

২.৭.৩ অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ (Economic classification)

সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর সামগ্রিকভাবে বাজেটের একটি প্রভাব আছে। এর সুবিশাল আকৃতি, আয় ও ব্যয়ের বিপুলতম সমাহার, অসংখ্য নীতি ও প্রকল্প যা-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় তা অর্থনীতির গতি, প্রকৃতি ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। অতএব এক্ষেত্রে বাজেটকে ভিন্নতর পদ্ধতিগত কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে রূপায়ণ করা হয়।

অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ সরকারি ব্যয়কে যেভাবে অর্থনীতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের ভিত্তিতে বিন্যস্ত করে তার কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আপনাদের কাছে পরিস্ফুট হবে—

(১) বিনিয়োগ
(২) ভোগ
(৩) আয়ের বৃদ্ধি ও নতুনতর ক্ষেত্র নির্মাণ
(৪) পুঁজি সঞ্চয় ও পুঁজি গঠন
(৫) সরকার কর্তৃক দ্রব্য ও সেবামূলক কাজের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ
(৬) কর এবং কর নয় - এই জাতীয় রাজস্বের পরিমাণ (Tax and non-Tax revenue)
(৭) আয়ের ভিন্ন উৎস হিসাবে বাজার থেকে আহৃত ঋণ, অন্তঃসরকারি ঋণ, সাহায্য ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আলোচনাকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সমাজিক পরিষদ যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে তা বোঝা অতঃপর আপনাদের পক্ষে সহজবোধ্য হবে— "Economic classification provides an analysis of the transaction of government bodies according to homogenous economic categories of transaction with the other sectors of the economy directly affected by them."

ভারত সরকারের অর্থদপ্তর "Economic and Functional Classification of the Central Govt. Budget" বলে একটি সুলিখিত দলিল প্রকাশ করেছে।

নিম্নলিখিত তালিকাটি আপনাদের পক্ষে সাহায্যকারী হতে পারে—

সমগ্র ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ

(১) ভোগমূলক ব্যয়
  (ক) প্রতিরক্ষা
  (খ) অন্যান্য সরকারি প্রশাসনিক ব্যয়
(২) বণ্টনমূলক ব্যয়
  (ক) সুদ প্রদান
  (খ) ভর্তুকি
  (গ) রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে অনুদান
  (ঘ) অন্যান্য

(৩) পুঁজির সৃষ্টি

(ক) বস্তুগত ক্ষেত্র

(খ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্র

(৪) অন্যান্য

(৫) সামগ্রিক ব্যয়

এক্ষেত্রে বাৎসরিক ভিত্তিতে পারস্পরিক তুলনার দ্বারা বোঝা যায় যে বাজেট বরাদ্দের দ্বারা পুঁজি তৈরির বিষয়টি গত আর্থিক বছরের তুলনায় অগ্রসর হয়েছে না পিছিয়ে গিয়েছে। যদি পিছিয়ে যায় সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে ভোগমূলক বা বন্টনমূলক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৭.৪ কর্মনিবাহী ও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের সম্মিলিত রূপ

এক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়কে উভয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিন্যস্ত করা হয়। যেমন কর্মনিবাহী শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী চিকিৎসা খাতে ব্যয়কে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী নিম্নলিখিত খাতে শ্রেণীবিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

(১) চলতি ব্যয়

(২) পুঁজির সৃষ্টির জন্য ব্যয়

(৩) বিভিন্ন ধরনের ঋণের জন্য ব্যয় ইত্যাদি। বিপরীত দিক থেকে পুঁজি সৃষ্টির জন্য ব্যয়কে কর্মনির্বাহী ভিত্তিতে বিভক্ত করা যেতে পারে।

২.৭.৫ হিসাব রক্ষামূলক শ্রেণীবিভাগ (Accounting Classification)

তিনটি পৃথক শ্রেণীবিভাগের সমষ্টিগত রূপকে এই নির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এগুলি হল—

(১) রাজস্ব ও পুঁজিকেন্দ্রিক ব্যয়

(২) উন্নয়ন ও উন্নয়ন বহির্ভূত ব্যয়

(৩) পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীবিভাগটি আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করে নিয়ে অতঃপর প্রথম শ্রেণীবিভাগটি নিয়ে আলোচনা করব, যেহেতু পাঠ্যসূচীতে তা বিশেষীকৃতভাবে আলোচনা করতে বলা হয়েছে।

২.৭.৫.১ উন্নয়ন ও উন্নয়ন বহির্ভূত ব্যয়

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে উন্নয়মূলক বাজেট ও ব্যয়ের ধারণা যুক্ত। পরিকল্পনা সময়কালে বাজেটের মাধ্যমে যাতে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় তার হিসাব করাই লক্ষ্য। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, কৃষি,যোগাযোগ, সমবায়—ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় উদাহরণ।

উন্নয়ন বহির্ভূত ব্যয়, যেমন—পুনর্বাসন,প্রশাসন, ত্রাণ ইত্যাদি শেষ পর্যন্ত উন্নয়নের স্বার্থেই কাজে লাগে।

প্রথাগতভাবে তফাৎ করা হলেও উভয়ের মধ্যে বস্তুত কঠোর তফাৎ করা সম্ভব নয়।

উন্নয়নমূলক ব্যয়ের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ উন্নয়ন বহির্ভূত ব্যয়ের গুরুত্বহ্রাস করে এবং এর ফলে পরোক্ষ অর্থনীতির সমৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

২.৭.৫.২ পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়

নির্দিষ্ট কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে যে ব্যয় তাকে পরিকল্পনা ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সরকারি পরিকল্পনার বাইরে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যে ব্যয় তাকে পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় বলা যায়।

তবে এই শ্রেণীবিভাগ প্রশাসনিক স্তরে সুবিধা প্রদান করতে পারলেও এর অর্থনৈতিক তাৎপর্য মূলত নেই।

২.৭.৫.৩ রাজস্ব ও পুঁজিকেন্দ্রিক বাজেট

নিম্নলিখিত শব্দগুলির সঙ্গে প্রথমে আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

(১) রাজস্ব বাজেট (Revenue Budget) — সরকারের বিভিন্ন সূত্রে রাজস্ব প্রাপ্তি এবং সেই রাজস্ব থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয়।

(২) রাজস্ব ব্যয় (Revenue Expenditure) —সরকারের বিভিন্ন বিভাগের স্বাভাবিক পরিচালনা জনিত ব্যয়।

(৩) পুঁজিকেন্দ্রিক বাজেট (Capital Budget) — এটি পুঁজিখাতে প্রাপ্তি ও ব্যয়কে বোঝায়।

(৪) পুঁজিখাতে প্রাপ্তি (Capital Receipts) — এগুলি হচ্ছে বিভিন্ন রকম ঋণ যা জনগনের নিকট থেকে সরকার আহরণ করে। যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ বা বাজার থেকে আহৃত ঋণ ইত্যাদি।

রাজস্ব ও পুঁজিকেন্দ্রিক ব্যয়ের প্রধান পার্থক্য হল একটির দ্বারা সম্পদের সৃষ্টি হয় না এবং অপরটির দ্বারা হয়। কোন একটি আর্থিক বছরে কত পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ব্যবহৃত হ'ল তা এর দ্বারা বোঝা যায়, বিপরীত দিক থেকে কোন একটি আর্থিক বছরের ব্যয় কতটা রাজস্ব তৈরি করতে পারবে কি পারবে না—তাও বোঝা যায়।

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী বাজেটে রাজস্ব ব্যয়কে অন্যান্য ব্যয় থেকে পৃথক করে দেখাতে হয়। ভারত সরকারের বাজেট রাজস্ব বাজেট ও পুঁজিকেন্দ্রিক বাজেটের সমষ্টিগত রূপ। রাজস্ব বাজেটে সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তি (কর রাজস্ব ও অন্যান্য রাজস্ব) ও রাজস্ব থেকে ব্যয়ের হিসাব উল্লেখিত থাকে। রাজস্ব ব্যয় প্রধানত সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও সেবামূলক কার্যাদির জন্য অথবা সরকার কতৃক আহৃত ঋণের সুদ প্রদান করার জন্য অথবা অনুদান দেওয়ার জন্য ব্যয়িত হয়। বৃহত্তর অর্থে পুনরায় উল্লেখ্য যে, সেই ব্যয় যা সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয় না তাকে 'রাজস্ব ব্যয়' বলে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি পুঁজিকেন্দ্রিক বাজেট হচ্ছে পুঁজিকেন্দ্রিক আয় ও ব্যয়ের সমষ্টিগতরূপ। পুঁজি কেন্দ্রিক প্রাপ্তির কয়েকটি ক্ষেত্র আমরা ইতমধ্যেই চিহ্নিত করেছি। কেন্দ্রীয় সরকার অন্য রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পায় আথবা রাজ্যসরকার বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে ঋণ পায় তাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা চলে :

দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য ব্যয় ব্যতিরেকে যে কোন ব্যয়কে পুঁজিকেন্দ্রিক ব্যয় বলা চলে। এর প্রভাব ও ফলাফল কোন একটি নির্দিষ্ট বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না এবং উন্নয়নের একটি প্রবাহমান ধারাবহিকতার সুত্রপাত হয়। এই ব্যয়ের অন্যতম আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি নির্দিষ্ট খাতে

বরাদ্দের অধিকাংশ অংশ পুঁজি হিসাবে নিয়োজিত হয়।,কিন্তু এর মঙ্গলকর প্রভাব পরের বছর গুলিতে চলতে থাকে।

১৯৫১ সালে পরিকল্পনা গ্রহণের বছর থেকে পুঁজিকেন্দ্রিক ব্যয় আমাদের পরিকল্পনা ব্যবস্থায় ও বাজেটে অত্যন্ত গুরুত্ব অর্জন করেছে। এর যেমন উন্নয়নমূলক প্রভাব আছে তেমনিই এর অর্থনৈতিক প্রভাবও আছে। তবে অর্থনৈতিক প্রভাবটি নির্ভর করে পুঁজির বিনিয়োগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল আমরা কতদিন পর পাবো তার উপর।

কেন্দ্রীয় রাজস্ব বাজেটের উপরও এর প্রভাব আছে। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ অথবা রাজস্ব কেন্দ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে কি হ্রাস পাবে তা অনেকটাই নির্ভর করে পুঁজি কেন্দ্রিক বাজেটের উপর।

পরিশেষে উল্লেখ্য, পাঠ্যসূচীতে কর্মভিত্তিক বাজেট (Performance Budget) ও শূন্য কেন্দ্রিক বাজেট (Zero-base Budget) বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। পরের একক দুটিতে যথাক্রমে আমরা তা করব।

২.৮ অনুশীলনী - ২

(১) বাজেটের উদ্দেশ্যভিত্তিক শ্রেণীবিভাগের ধারণাটি আলোচনা করুন।

(২) বাজেটের কর্মনির্বাহী শ্রেণীবিভাগের ধারণাটি বিশ্লেষণ করুন।

(৩) বাজেটের অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ বলতে কি বোঝেন?

(৪) হিসাব রক্ষামূলক শ্রেণী বিভাগের বিভিন্ন বিভাগগুলি কি কি?

২.৯ সারাংশ

বাজেট হচ্ছে আগামী বছরের জন্য একটি বাৎসরিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন যেখানে সরকারের রাজস্ব-আয় ও ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ থাকে। রাজস্ব আদায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও ব্যয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র এখানে চিহ্নিত হয়। যে কোন বাজেটই মূলত ব্যয় বরাদ্দমূলক এবং তার জন্যই আয়ের পথ অনুসন্ধানকারী। যে কোন বাজেটই সরকারের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও নীতি অনুসরণকারী। বাজেটের বহুধাবিভক্ত শ্রেণী বিভাগের তথা দৃষ্টিভঙ্গীর এটিই মূল কারণ।

এই উদ্দেশ্যটির চরিত্রের বিস্তৃতায়ন ঘটেছে, এবং সরকারের অর্থনৈতিক কাজ কর্মের উপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণই আর মুখ্য বিষয় নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থার পদ্ধতি একে জটিলতম রূপ দিয়েছে।

শুধু দৃষ্টিভঙ্গী বা উদ্দেশ্য নয়, বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতিও অনুধাবন করা যেতে পারে এর শ্রেণী বিভাগের ভিত্তিতে।

আমরা এই এককটিতে শ্রেণী বিভাগ সমূহের আলোচনাও করেছি।

২.১০ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(১) আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বাজেটের ভূমিকা আলোচনা করুন।

(২) বাজেটের শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বাজেটের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(৩) রাজস্ব ও পুঁজিকেন্দ্রিক বাজেটের ধারণাটি আলোচনা করুন।

২.১১ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী - ১

প্রশ্ন- ১ — একক ২.৩

২ — একক ২.৩ ও ২.৪

৩ — একক ২.৫

অনুশীলনী - ২

প্রশ্ন- ১ — একক ২.৭.১

২ — একক ২.৭.২

৩ — একক ২.৭.৩

৪ — একক ২.৭.৫

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

প্রশ্ন- ১ — একক ২.২ থেকে ২.৫

২ — একক ২.৭ থেকে ২.৭.৫.৩

৩ — একক ২.৭.৫.৩

২.১২ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

1. The Theory of Public Finance — A Study in Public Economy - Richard A.Musgrave McGraw Hill.
2. Government Budgeting and Expenditure Control : Theory and Practice — A. Premchand. IMF. Washington DC.
3. Government Budgeting - Jesse Burkhead. John Wiley and sons. New York.
4. Government Budgeting in India — M.M. Sury. Commonwealth Publishers. New Delhi
5. Fiscal Policy in Under developed countries with special reference to India — R.J. Chelliah. George Allen and Unwin. London.

একক ৩ ☐ কর্মভিত্তিক বাজেট (Performance Budgeting)

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ কর্মভিত্তিক বাজেটের পশ্চাৎ পটভূমি সম্বন্ধে আরো কয়েকটি বক্তব্য

৩.৪ কর্মভিত্তিক বাজেট ঃ অর্থ নির্ধারণ

৩.৫ কর্মভিত্তিক বাজেটের উপাদানসমূহ

৩.৬ অনুশীলনী -১

৩.৭ কর্মভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন

৩.৮ প্রণয়ণ পদ্ধতির তুলনামূলক মূল্যায়ন

৩.৯ অনুশীলনী-২

৩.১০ ভারতবর্ষে কর্মভিত্তিক বাজেট

৩.১১ অনুশীলনী -৩

৩.১২ কর্মভিত্তিক বাজেট - সমালোচনা মূলক মূল্যায়ন

৩.১২.১ কয়েকটি পদ্ধতিগত সমস্যা

৩.১৩ সারাংশ

৩.১৪ সর্বশেষ প্রশ্নবলী

৩.১৫ উত্তর সংকেত

৩.১৬ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন ঃ

- কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার উদ্ভবের প্রয়োজনীয়তার পটভূমি
- এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও প্রথাগত বাজেট ব্যবস্থার সঙ্গে পার্থক্য
- কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্নস্তর সমূহ
- ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা
- কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার সমালোচনামূলক মূল্যায়ন।

৩.২ প্রস্তাবনা

পর্যায় ১-এর প্রথম ও দ্বিতীয় এককে আপনারা যে মূল দুটি বিষয় অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন তা হল—

(১) আর্থিক জনপ্রশাসন বলতে কি বোঝায়?

(২) আর্থিক জনপ্রশাসনের অন্যতম মূল বিষয়বস্তু হিসাবে বাজেটের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়?

আমরা এই প্রাসঙ্গিকতা সংক্রান্ত আলোচনার একটি বিবর্ধিত রূপ হিসাবে একক- ৩ এর প্রসঙ্গের অবতারণা করব।

আমরা জানি, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে 'জনকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থার' ধারণা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বর্তমানে চরিত্র নিরপেক্ষভাবে প্রায় সব রাষ্ট্র অন্তত এই নীতি অনুসরণ করার কথা বলে। কর্মভিত্তিক বাজেটের ক্ষেত্রে একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

সমস্ত ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থারই কর্মভিত্তিক বাজেটের উপর গুরুত্ব দেওয়ার স্ব স্ব কারণ আছে।

(১) প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক মন্দাকে কাটিয়ে উঠে উৎপাদন ও উন্নয়মূখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কর্মভিত্তিক বাজেটের কথা উন্নত উদারনৈতিক রাষ্ট্রগুলিকে বলতে হয়।

(২) সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি তাদের পূর্বতন ঔপনিবেশিক প্রভুদের কাছ থেকে আগত এই মডেল অনুসরণ করে, এছাড়াও স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে উন্নয়নের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক তাগিদ ছিল। এর ফলে ক্রমান্বয়ে কর্মভিত্তিক বাজেটের ধারণা স্থায়ী আসন করে নেয়।

(৩) ঠান্ডা-লড়াই পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক চীনের অর্থনৈতিক ও বাজেট সংক্রান্ত নীতির বিস্তৃত খবর এখন আমরা পাচ্ছি। মুক্ত বিশ্ব অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতা কর্মভিত্তিক বাজেট নীতিকে অনুসরণ করতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলিকেও বাধ্য করেছে।

(৪) ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ যদি আমরা ধরি সেক্ষেত্রে দেখব বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং যান্ত্রিক স্থবির নিয়মের দ্বারা বদ্ধ। স্বাধীনতার পরে আর্থিক প্রশাসনকে কর্মভিত্তিক নীতির দ্বারা পরিচালনা করার চেষ্টা করা হয়, যার পরিণতি হিসাবে পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও উদ্যোগ সমূহের মধ্যে দক্ষতা, মিতব্যয়িতা ও উন্নয়ন আনা সম্ভব হবে। এরই পরিণতি হিসাবে ভারতবর্ষে কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় যা ৩.৪ নং এককে আমরা আলোচনা করব।

অবশ্য 'গ্যাট' (GATT) চুক্তি পরবর্তী বিশ্বে তৃতীয় বিশ্বসহ সমগ্র পৃথিবীতে বাজেট সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত কি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে তা এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে পরিস্ফুট নয়।

৩.৩ কর্মভিত্তিক বাজেটের পশ্চাৎপটভূমি সম্বন্ধে আরো কয়েকটি বক্তব্য

আমরা যদিও এখন পর্যন্ত ধারণা হিসাবে কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থাকে ব্যাখা করিনি, তবুও সেই অলোচনার পূর্বে রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্র নিরপেক্ষভাবে এর উদ্ভবের পশ্চাৎপটভূমিকে তাত্ত্বিকভাবে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

যে কোন পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বাজেটকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট দুটি দিক থেকে ব্যবহার করা যায়।

প্রথমত, পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও বাজেটের একটি যুক্তিসঙ্গত সমষ্টিগত রূপের অবস্থান।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থার অন্যতম একটি যন্ত্র হিসাবে বাজেটের উপস্থিতি।

এর ফলে রাষ্ট্র নামক সাংগঠনিক ব্যবস্থায় বাজেট নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারে, এগুলি হল, (১) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, (২) পারস্পারিক সংযোগসাধন, (৩) মূল্যায়ন ও (৪) নিয়ন্ত্রণ।

এছাড়াও সাম্প্রতিককালে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ অত্যাধিক বেড়েছে। সম্পদের সমানতাকামী বন্টন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি স্থিতিশীল ক্ষেত্রে ধরে রাখা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার এই জাতীয় শক্তিগুলিকে উৎসাহদান, মূল্যের উর্দ্ধগতি — এগুলি মূলত সরকারি ব্যয়ের বৃদ্ধির কারণ।

এই জটিলতার প্রেক্ষাপটে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তা হল—

(১) কিভাবে ক্রমবর্ধমান সরকারি ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যায়।

(২) কি ভাবে আরো দক্ষতার সঙ্গে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাকে পরিচালনা করা যায়।

কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থায় এই সমস্ত প্রসঙ্গ ও প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়।

৩.৪ কর্মভিত্তিক বাজেট ঃ অর্থ নির্ধারণ

কর্মভিত্তিক বাজেটে সরকারের ব্যয়কে সরকারের কাজ, কর্মসূচী, প্রকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে অনুধাবন ও প্রকাশ করা হয়। এর ফলে উপকরণ নয়, সরকারি কাজের উপপাদ সংক্রান্ত দিকটি এবং তার জন্য ব্যয় মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

সরকারের সমস্ত কর্মপ্রক্রিয়াকে বাজেটে মূল তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয় যেগুলি হল —

(১) কাজ (Function) (২) কর্মসূচী (Programme) এবং (৩) উদ্যোগ (Activity/Project)

কাজ হচ্ছে সরকারি প্রচেষ্টার বিভিন্ন বিভাগ যা বিশেষীকৃত সেবা প্রদান করে। যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, কৃষি ইত্যাদি।

কর্মসূচী হচ্ছে কাজের এক একটি অংশ যার বিশেষীকৃত উদ্দেশ্য আছে, যেমন— প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা বা প্রযুক্তিগত শিক্ষা, ম্যালেরিয়া দুরীকরণ কর্মসূচী ইত্যাদি।

উদ্যোগ হচ্ছে কর্মসূচীর স্বতন্ত্র বিভাগ সমূহ বা এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মদ্যোগ। যেমন, স্কুল-গৃহ নির্মাণ, বীজ ও সার ক্রয় ইত্যাদি।

এই পরস্পর সম্লিষ্ট তিনটি বিষয়কে আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থার সাহায্যে আধুনিক পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করা হয়।

উপস্থাপনার এই পদ্ধতির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মদ্যোগের কতটুকু অংশ বাস্তবায়িত হয়েছে তা জানা, তার ফলে কি করা সম্ভব হয় নি তা জানা, এর ভিত্তিতে চলতি কর্মদ্যোগগুলির কতটা পরিমার্জন, পরিবর্দ্ধন বা

অবলোপ প্রয়োজন তা অনুধাবন করা, ফলত নতুন প্রকল্প সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আধুনিক পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের সাহায্যে পরিচালনার এই সমস্ত স্তরে ব্যয়ের বিষয়টিরও একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

কর্মসম্পাদনা এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কর্মসম্পাদানার উপায় বা পদ্ধতি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা পূর্বেই বলেছি এই কারণেই উপপাদ সংক্রান্ত আলোচনা এক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উপকরণ সংক্রান্ত আলোচনা একেবারেই গুরুত্বহীন তা নয়। কারণ প্রত্যেকটি কাজ, কর্মসূচী বা উদ্যোগের ব্যয়, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বা বস্তুগত অবস্থা পূর্ববিচেনার অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৩.৫ কর্ম-ভিত্তিক বাজেটের উপাদানসমূহ

কর্মভিত্তিক বাজেটের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে যেগুলি সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন থাকা প্রয়োজন ঃ

(১) প্রত্যেকটি সংগঠনের কাজ, কর্মসূচী ও উদ্যোগের শ্রেণীবিভাগ যার ফলে সেই সংগঠনের কর্মদ্যোগের সমগ্র চেহারাটি পরিস্ফুট হয়।

(২) প্রত্যেকটি কর্মসূচীর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের রূপরেখা প্রণয়ন।

(৩) কাজের পরিধি ও ফলাফলের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন।

(৪) প্রত্যেকটি কর্মসূচীর জন্য বাজেট বরাদ্দকে কাজের পরিমাণ, কর্মসূচীর উপাদানমুখীনতা ও প্রয়োগকুশলতায় মানের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করা।

৩.৬ অনুশীলনী - ১

(১) কর্মভিত্তিক বাজেটের উদ্ভবের পটভূমিকে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখা করুন।

(২) কর্মভিত্তিক বাজেট সংক্রান্ত ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

(৩) কর্মভিত্তিক বাজেটের মূল উপাদানসমূহ কি কি ?

৩.৭ কর্মভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন

এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত স্তরগুলি পর পর অনুসৃত হবে ঃ

(১) প্রত্যেকটি প্রশাসনিক সংগঠনকে তার অভ্যন্তরীন সাংগঠনিক কাঠামো এবং এই নির্দিষ্ট প্রশাসনিক সাংগঠনিক ব্যবস্থার অবস্থিতির উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে।

(২) এই কাঠামোগত বিন্যাস ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত ধারণা ঠিক করে প্রশাসনিক সংগঠনটির কাজকর্মের পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তব কাজকর্ম কি চরিত্রের হবে।

(৩) এর পরে আর্থিক প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত একটি তালিকা তৈরী করা হয়। কর্মভিত্তিক বাজেটের এটি সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তিনটি মূল উপাদান নিয়ে এই তালিকাটি গঠিতঃ

(ক) প্রাশাসনিক সংগঠনটির কাজকর্মকে কর্মসূচী ও উদ্যোগের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত করা। যাতে সংগঠনটির সামগ্রিক কাজকর্ম সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরি হয়।

(খ) আমরা বাজেটের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে প্রথমে উদ্দেশ্যভিত্তিক শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ করেছিলাম (একক ২.৭.১)। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বিভাগের উদ্দেশ্যের একটি সাধারণ শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের বরাদ্দের একটি সমতা থাকতে পারে। এখানে উদ্দেশ্য বলতে মূলত প্রশাসনিক বিভাগ চালানোর জন্য আবশ্যিক ব্যয়কে বোঝান হচ্ছে।

(গ) রাজস্বের উৎসগুলি নির্ধারণসহ 'ক'-তে বর্ণিত ব্যবস্থার প্রয়োজনানুযায়ী রাজস্ব বরাদ্দ করা।

(৪) প্রশাসনিক বিভাগের বাজেট বরাদ্দের পর সেই বরাদ্দের আবার যথোপযুক্ত প্রয়োজনীয় শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এগুলি হল কাজ, কাজের উপবিভাগ (sub function), কর্মসূচী, কর্মসূচীর উপবিভাগ (sub-programmes), প্রকল্প ও কর্মোদ্যোগ এবং তার উপবিভাগ, বিভিন্ন করণীয় কাজ (Tasks) ইত্যাদি

(৫) এই বিভাগ এবং উপবিভাগের শুধু শ্রেণীবিভাগ ও বাজেট বরাদ্দই নয়, এগুলির ক্রমান্বয়িক মূল্যায়ন, উন্নয়ন ও পরিধির ক্রম ব্যাপ্তি বাজেট পদ্ধতির অন্যতম অঙ্গ।

(৬) বরাদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত বিভাগ ও উপবিভাগগুলি শেষ পর্যন্ত বাস্তবে কি কাজ করল অর্থাৎ তাদের কাজের 'উপপাদ' জনিত অবস্থান, কর্মচারীদের শ্রমক্ষমতার ব্যবহারের পরিমাণ ইত্যাদি নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ হিসাব-শাস্ত্র ও অর্থনৈতিক প্রশাসনের পারস্পরিক প্রয়োগ এখানে ঘটনো হয়।

(৭) বাজেট বরাদ্দ পরবর্তী বাস্তবায়নের পর্ব সম্বন্ধে আরো কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ্য।

(ক) কোন একটি প্রশাসনিক বিভাগের অধস্তন বিভাগগুলিকে বাজেট বরাদ্দ সম্বন্ধে যাবতীয় খবর যথাসময়ে জানানো,

(খ) বাজেটে উল্লেখিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ,

(গ) বরাদ্দ ও ব্যয়ের আনুপাতিক হার ও প্রবহমানতা অক্ষুন্ন রাখা,

(ঘ) বরাদ্দের বাইরে অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ,

(ঙ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত কর্মসূচী সমাপ্ত করা যাতে বাজেট বরাদ্দ সময়ানুযায়ী ব্যবহার করা যায়।

(৮) উদ্যোগুলির জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দের বাইরে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক ব্যয়ের প্রসঙ্গও বাজেটে উল্লেখিত থাকে।

(৯) মনে রাখা প্রয়োজন যে কর্মভিত্তিক বাজেটের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্বে মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি। এই মূল্যায়ন বাইরের কোন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা হতে পারে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৩.৮ প্রণয়ন পদ্ধতির তুলনামূলক মূল্যায়ন

বাজেটের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত আলোচনা আপনারা ইতিমধ্যে পাঠ করেছেন। সেখানে একটি বিষয় হয়ত আপনারা খেয়াল করেছেন যে গুণগত চরিত্রের পার্থক্য সত্ত্বেও প্রত্যেকটি বাজেট কতকগুলি সাধারণ সমজাতীয় বৈশিষ্ট্য বহন করে। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে কর্মভিত্তিক বাজেটের মূল পার্থক্যের ক্ষেত্রগুলি কি কি?

এগুলিকে আমার নিম্নলিখিত ভাবে বিন্যস্ত করতে পারি ঃ

(১) প্রশাসনিক সংগঠনগুলি তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনাকে শুধুমাত্র রাজস্ব ব্যয়ের পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না, কর্মদ্যোগের ফলাফল নামক বৃহত্তর দায়িত্ববোধ এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে একটি দৃঢ় সংবদ্ধ চিন্তাধারা বলা যায় এবং বাজেট হচ্ছে সেই চিন্তাধারার বাস্তবায়ন। কর্মভিত্তিক বাজেটকে চিন্তা ও কর্মধারার সমন্বিত রূপ বলা যায়।

(২) কর্মসূচী তথা Programme সংক্রান্ত ধারণাটি নিয়ে অতিরিক্ত আরো কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। এর ফলে প্রথাগত ব্যবস্থার সঙ্গে পার্থক্য আরো ভাল করে বোঝা যাবে। কর্মসূচী হচ্ছে কাজের একটি অংশ এবং কর্মসূচীর একটি নিজস্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ চরিত্র থাকে। এই কর্মসূচীগুলি স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী,এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার স্বার্থে প্রণয়ন করতে হয়। কর্মসূচীগুলিকে রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লষণ করতে হয়। অর্থাৎ কর্মসূচীগুলির জন্য যথোপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা করা এবং বৃহত্তর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর তার প্রভাব কি পড়বে তা যাচাই করা বাধ্যতামূলক।

সাধারণত জটিল কর্মসূচীগুলিকেই কতকগুলি উপরিভাগে বিভক্ত করা হয় যাকে আমরা উদ্যোগ /প্রকল্প (Activity/Project) বলেছি। প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সাহায্যকারী হয়।

(৩) বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রথাগত বাজেট ব্যবস্থার সঙ্গে কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। ঐতিহ্যগতভাবে, বরাদ্দের ক্ষেত্রে পূর্ব বছরের বরাদ্দ এবং ব্যয়ের হিসাবের ভিত্তিতে আগামী বছরের প্রয়োজন নির্ধারিত হয়, আগামী বছরের কর্মসূচী, উদ্দেশ্য বা উদ্যোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি এক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় নয়। কর্মভিত্তিক বাজেটের ক্ষেত্রে কর্মসূচী এবং তাদের শ্রেণী বিভাগের ভিত্তিতে বরাদ্দের প্রয়োজন স্থিরীকৃত হয়। বিগত কাজকর্ম, তার জন্য ব্যয় ও বরাদ্দ এবং আগামী বছরে কি জাতীয় ফলাফল আশা করা হচ্ছে— এই সমস্ত কিছুই দায়িত্বের সঙ্গে সমাধা করার চেষ্টা করা হয়।

অনেক সময় প্রয়োজনের ভিত্তিতে কর্মসূচীগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হয় এবং অনেক সময়েই রাজস্বের ঘাটতি হেতু ব্যয়বরাদ্দ ছাঁটাই হতে পারে। এর ফলে সাধারণভাবে সমস্ত ব্যবস্থাটির মধ্যে ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয় না, কারণ কর্মসূচীর অগ্রাধিকারভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ করার সময় পূর্ব থেকেই এটি অনুমিত থাকে যে বাজেট ঘাটতি হতে পারে।

৩.৯ অনুশীলনী - ২

(১) কর্মভিত্তিক বাজেট প্রণয়নেরণ বিভিন্ন পর্যায়গুলি ব্যাখা করুন।

(২) প্রথাগত বাজেট ব্যবস্থার সঙ্গে কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার মূল পার্থক্যের ক্ষেত্রগুলি কি কি?

৩.১০ ভারতবর্ষে কর্মভিত্তিক বাজেট

ভারতবর্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রণয়নের পরবর্তী সময়পর্বে কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ইতিপূর্বে প্রচলিত বাজেট ও তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি যথোপযুক্ত ও পর্যাপ্ত নয় বলে মনে হতে থাকে। কারণ বাজেট ব্যবস্থায় উপকরণ উপপাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তথা

বাজেট বরাদ্দ এবং বাস্তব কার্যকারিতার পারস্পরিক সম্পর্কমূলক আধুনিক প্রয়োজনীয়তা পূর্বতন ব্যবস্থার দ্বারা সাধিত হতে পারছিল না।

ভারতের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কর্মভিত্তিক বাজেটের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে ১৯৫৩ সালে Dean Applelay প্রতিবেদন পেশ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে লোকসভায় আনুমানিক ব্যয় কমিটি (Estimates Committee) তাদের বিংশতি রিপোর্টে উল্লেখ করে যে "..... বাজেটে যে প্রকল্পগুলির উল্লেখ থাকে তাদের সঠিক কার্যকারিতা ও মূল্যায়নের জন্য কর্মভিত্তিক বাজেটই আদর্শ, এই ব্যবস্থা বৃহদায়তন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর ক্ষেত্রে আরো অধিক প্রযোজ্য। অতএব কর্মভিত্তিক বাজেট আমাদের আদর্শ হওয়া উচিৎ, যে লক্ষ্যে আমরা ক্রমান্বয়ে পৌঁছাব।" এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারি ব্যয়ের উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণকে আরো শক্তিশালী করা।

১৯৬০ সালে ৭৩ তম প্রতিবেদনে আনুমানিক ব্যয় কমিটি পুনরায় যত দ্রুত সম্ভব কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার বাস্তবায়নের সুপারিশ করে। ১৯৬১ সালে কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তর এই সুপারিশ গ্রহণ করে এবং সরকার অধিগৃহীত বিভিন্ন সংস্থাকে তা রূপায়ণ করতে বলে। কিন্তু কার্যকারিতার পথে কিছু সমস্যার জন্য শেষপর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয় নি।

১৯৬৪ সালে পরিকল্পনা কমিশন ব্যাপরটিকে পাদপ্রদীপে নিয়ে আসে, এক্ষেত্রে কমিশনের বক্তব্য ছিল "কর্মভিত্তিক বাজেট গ্রহণের যথোপযুক্ত পদ্ধতি আবিষ্কার করা দরকার, যার ফলে পরিকল্পনা কমিশনের কাজের ক্ষেত্রে বা পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত হতে পারে।" নিজেদের এই অবস্থানের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য পরিকল্পনা কমিশন ১৯৬৫ সালে " Committee of Plan Project" এর অধীনে একটি "কমলভিত্তিক বাজেট ইউনিট" গঠন করে। এই ব্যবস্থার সুবিধাজনক দিকগুলি বোঝানোর জন্য এই ইউনিট অনেকগুলি পর্যবেক্ষণ চলায়, যার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি ব্যবহার করেছিল। প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি নিজেও কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থা সম্বন্ধে বক্তব্য পেশের জন্য দক্ষ ব্যক্তিদের একটি কমিটি গঠন করেছিল । এই কমিটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে পর্যায়ক্রমে কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলে।

প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি আরো যে সুপারিশ করেছিল তা হল ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেটে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং ১৯৭০-৭১ সালের বাজেটে তা চূড়ান্ত করতে হবে।

এর ভিত্তিতে ভারত সরকার সমস্ত মন্ত্রীদপ্তর, বিভাগ এবং রাজ্য সরকারকে ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছর থেকে কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলে।

৩.১১ অনুশীলনী - ৩

(১) ভারতবর্ষে কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থা গ্রহণের বিবর্তিত পর্যায়গুলি আলোচনা করুন।

৩.১২ কর্মভিত্তিক বাজেট ঃ সমালোচনামূলক মূল্যায়ন

কর্মভিত্তিক বাজেট আইনসভার কাজকর্মের চরিত্রের গুণগত উন্নতি ঘটায়। কারণ আইনসভার সামনে প্রত্যেকটি মন্ত্রীদপ্তর ও তার অধস্তন বিভাগগুলির কাজের সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপিত হয় এবং সেক্ষেত্রে মূল্যায়নের কাজটি

অনেক সুচারুভাবে করা যায়।

পরিকল্পনা এবং বাজেট ব্যবস্থার মধ্যে একধরনের জৈবিক যোগাযোগ এখানে ঘটেছে এবং ফলত উন্নয়নের পূর্বচিন্তিত পথ অনুসৃত হতে পারছে।

কর্মভিত্তিক বাজেট সরকার ও জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে তথা জনসংযোগের গুণগতমানের উন্নতি ঘটায়। কারণ কাজ ও কর্মসূচীসমূহ মূলত জনমঙ্গলকেন্দ্রিক। এই অর্থে এর চরিত্র গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল। জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পরিমাণও বাড়ে।

তথ্যের প্রাপ্তি ও যোগাযোগ মাধ্যমের উন্নততর অবস্থানের উপর ভিত্তি করে আধুনিক সংগঠন সম্পদের বন্টন, দায়িত্বের বন্টন, কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ইত্যাদি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। তথ্য সংক্রান্ত এই আবশ্যিক প্রয়োজনীয় উপাদনাটি কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থায় যথোপযুক্তভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ এখানে হিসাব রক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত বিকেন্দ্রিত ও পারস্পরিক প্রতিবেদন পেশের বিষয়টি আবশ্যিক কর্তব্য হিসাবে পরিগণিত হয়।

সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি কর্মভিত্তিক বাজেট, (ক) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে অনেক কার্যকারী করে, (খ) আইনসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণকে অনেক অর্থবহ করে, (গ) দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রিত করে, (ঘ) জনসংযোগ বৃদ্ধি করে।

৩.১২.১ কয়েকটি পদ্ধতিগত সমস্যা

ভারতে প্রায় সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মদ্যোগের ক্ষেত্রেই বিগত প্রায় তিন দশক ধরে কর্মভিত্তিক বাজেট পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। পৃথিবীর আরো বহু দেশের অভিজ্ঞতার তথ্যও আমাদের সামনে আছে। দেখা যাচ্ছে সমস্ত অভিজ্ঞতাই সুখকর নয়।

যে মূল সমস্যাগুলি জানা আপনাদের পক্ষে আপাতত যথেষ্ট তা হল—

(১) সরকারের কর্মদ্যোগকে 'কাজ', 'কর্মসূচী' ও 'উদ্যোগ' যে ভাবে শ্রেণী বিন্যস্ত করা হয় বাস্তবে এই নির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগের অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে অথবা করা সম্ভব নাও হতে পারে।

(২) বাস্তবে দেখা গেছে যে অনেক সময় 'কর্মসূচী' ও 'উদ্যোগ' এই শ্রেণীবিভাগ উভয়েই এত বৃহৎ বৃহৎ কর্মসূচীকে নিজেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে যে বাজেট বরাদ্দ করা সমস্যাজনক হয়ে পড়েছে অথবা পরিচালন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে।

(৩) মূল্যয়নের ক্ষেত্রে গুণগত মূল্যায়ন নয়, পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি অনুসৃত হওয়ার প্রবণতা থাকে।

(৪) কোন একটি 'কর্মসূচী' বা 'উদ্যোগের'র জন্য বরাদ্দ পরিমাপের পদ্ধতি প্রায়শই অস্পষ্ট ও অর্থহীন।

(৫) বিভিন্ন কর্মসূচীগুলির মধ্যে আন্তঃতুলনামূলক আলোচনা বাজেট পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কর্মভিত্তিক বাজেট এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সমস্যাটির সম্পূর্ণ সমাধান করতে পারে না। কারণ এক্ষেত্রে প্রথমে প্রয়োজন বিনিয়োগ ও লাভের সুনিপুণ বিশ্লেষণ । পরোক্ষ ও প্রচ্ছন্ন ব্যয় অত্যন্ত বেশি হয় বলে কর্মভিত্তিক বাজেটে এই সুনিপুণ বিশ্লেষণ প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

৩.১৩ সারাংশ

কর্মভিত্তিক বাজেট হচ্ছে একটি যন্ত্র বা পদ্ধতি, এর লক্ষ্য হচ্ছে সরকারি ব্যয়কে কাজ ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে বিন্যস্ত করা যার ফলে উপপাদ অবস্থাকে সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়। জনমঙ্গলকর দায়িত্ববোধ ও আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থার নীতির পারস্পকি সংযোগ এখানে ঘটে।

এই ব্যবস্থা যেহেতু একটি যন্ত্র বা পদ্ধতি সেই হেতু সাফল্য বা প্রয়োগযোগ্যতা অনেকটাই নির্ভর করে যন্ত্রটির নির্মাণকর্তাদের দক্ষতার উপর। দক্ষতা, কল্পনা, শক্তি ও উৎসাহ—এই সমস্তই এক্ষেত্রে দরকার। কোন একটি দেশের পরিকল্পনা ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্যকে ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়িত করতে থাকে এই অবস্থা। এক্ষেত্রে শাসন, আইন প্রশাসন ও পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে দায়বদ্ধ।

৩.১৪ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(১) কর্মভিত্তিক বাজেটের অর্থ ও উপাদান নির্ধারণ করুন। এই ব্যবস্থার উদ্ভবের পশ্চাৎগত শর্তগুলি কি কি?

(২) কর্মভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি আলোচনা করুন এবং প্রথাগত বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতির সঙ্গে তুলনামূলক মূলায়ন করুন।

(৩) কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করুন।

৩.১৫ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী - ১

প্রশ্ন (১) একক ৩.২, ৩.৩

(২) একক ৩.৪

(৩) একক ৩.৫

অনুশীলনী - ২

প্রশ্ন - (১) একক ৩.৭

(২) একক ৩.৮

অনুশীলনী - ৩

প্রশ্ন - (১) একক ৩.১০

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

প্রশ্ন- (১) একক ৩.২, ৩.৩, ৩.৪, ৩.৫

(২) একক ৩.৭, ৩.৮

(৩) একক ৩.১২, ৩.১২. ১, ৩.১৩

৩.১৬ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

1. Performance Budgeting -A. Premchand. Academic Book. Bombay.
2. Financial Administration in India — M. J. K. Thavaraj. Sultan Chand and Sons. New Delhi.
3. A manual for programme and performance budgeting — U. N. Publications, New York.

একক ৪ ☐ শূন্য ভিত্তিক বাজেট (Zero Base Budget)

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ প্রস্তাবনা
৪.৩ শূন্য ভিত্তিক বাজেট — অর্থ তথা ধারণা
৪.৪ শূন্য ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার উদ্ভব
৪.৫ শূন্য ভিত্তিক বাজেটের উদ্দেশ্য
৪.৬ শূন্য ভিত্তিক বাজেট ও প্রথাগত বাজেট ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা
৪.৭ অনুশীলনী - ১
৪.৮ বাজেট প্রনয়নের বিভিন্ন পর্যায়
৪.৮.১ চারটি প্রধান পর্যায়
৪.৯ ভারতবর্ষে শূন্য ভিত্তিক বাজেটের প্রবর্তন
৪.১০ শূন্য ভিত্তিক বাজেট - সুবিধা ও সমস্যা
৪.১০.১ প্রয়োগ-জনিত সমস্যা
৪.১১ অনুশীলনী - ২
৪.১২ সারাংশ
৪.১৩ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
৪.১৪ উত্তর সংকেত
৪.১৫ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারবেন ঃ

- শূন্য ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার অর্থ ও ধারণা
- ঐতিহ্যগত বাজেট ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে শূন্য ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার পার্থক্য
- শূন্য ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের কারণ
- এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্যসমূহ
- এই ব্যবস্থার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়সমূহ
- এই ব্যবস্থার সমস্যা ও সুবিধাসমূহ ।

৪.২ প্রস্তাবনা

ঠান্ডা লড়াই পরবর্তী পৃথিবীতে ভারতবর্ষসহ সমস্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থাই নতুন বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। এর ফলে চরিত্র নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলি পারস্পরিক তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। কিন্তু এটিও প্রধান কারণ নয়, প্রথাগত ভাবেই সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা তাদের গুণগত চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে স্ব স্ব প্রকৃতির কঠিন অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সমস্যার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং হচ্ছে।

কিন্তু এইরকম বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাপরটিকে না দেখে যদি তাত্ত্বিকভাবে ব্যাপরটিকে আমরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে শূন্য ভিত্তিক বাজেটের প্রসঙ্গে আমাদের আসতে হয়, যা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দৃঢ় সংবদ্ধ রাখার একটি পদ্ধতি।

শূন্য ভিত্তিক বাজেট অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি পদ্ধতি যা মনে করে কোন একটি সংগঠন তার বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে পূর্ববছরের ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ হিসাবের মধ্যে রাখবে না, নতুন করে শুরু করতে হবে -- অর্থাৎ বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নতুন করে নিতে হবে।

এর অর্থই হচ্ছে যে কাজ বা কর্মসূচীগুলি চলছে তাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে পরীক্ষা করতে হবে এবং নতুন মূল্যায়ন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তাদের যেতে হবে। এই মূল্যায়নের লক্ষ্য হবে কর্মসূচীর প্রবহমানতার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা যাচাই করা।

পরের এককে শূন্যভিত্তিক বাজেটের অর্থ আমরা বিস্তৃতভাবে জানার চেষ্টা করব।

৪.৩ শূন্য ভিত্তিক বাজেট—অর্থ তথা ধারণা

সম্পদের আরো উন্নতর বরাদ্দের মাধ্যমে শূন্যভিত্তিক বাজেট সংগঠনকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছিয়ে দিতে চায়।

অতএব এই ব্যবস্থা এক ধরনের আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থা যার লক্ষ্য হচ্ছে কোন নতুন বাজেট প্রণয়নের সময় নতুন বা পুরোনো যে কোন সরকারি কর্মসূচী নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিকভাবে দেখা। এর অর্থ হচ্ছে কোন সরকারি বিভাগ তার আগামী আর্থিক বছরের বাজেট বরাদ্দ দাবির ক্ষেত্রে গত আর্থিক বছরে কি অর্থ ব্যয় করেছে এবং কি অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল তাকে ভিত্তি হিসাবে ধরবে না।

আলোচনাকে আমরা সংজ্ঞার মধ্যে সংবদ্ধ করার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

Peter Sarant এর সংজ্ঞাটি এইরকম ঃ "শূন্য ভিত্তিক বাজেট স্থিত পরিকল্পনা, বাজেট ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরিপূরক কৌশল। এক্ষেত্রে স্বল্প সম্পদের কার্যকারী ব্যবহারের দ্বারা নির্দিষ্ট লাভ ফলাফল প্রাপ্তির জন্য বিকল্প ও দক্ষ পদ্ধতি অন্বেষণ করা হয়। এটি হচ্ছে একটি নমনীয় পরিচালন - ব্যবস্থা যা সম্পদ--ব্যবহারের পরিমাণ বা পদ্ধতির পুনর্নবীকরণে বিশ্বাসী। এটি করতে গিয়ে বর্তমান বছরের কর্মসূচীর কার্যকারিতা ও বরাদ্দের পরিমাণকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়।"

৪.৪ শূন্য ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার উদ্ভব

১৯২৪ সালে বৃটিশ বাজেট বিশেষজ্ঞ হিলটন ইয়াং (Hilton Young) প্রথম এই জাতীয় বাজেট প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। ১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর "কর্মসূচী পরিকল্পনা-বাজেট ব্যবস্থা"

(Programme Planning and Budgeting System) প্রণয়ন করেন। এর প্রকৃতি শূন্য ভিত্তিক বাজেটের মত। সর্বশেষে ১৯৬২ সালে মার্কিন কৃষিদপ্তর এই বাজেট ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করে এবং ১৯৬৪ সালে এর ভিত্তিতেই এই বিভাগের বাজেট প্রণীত হয়।

বহুবিধ কারণে এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করেনি, যার বিস্তৃত বর্ণনা এখানে অপ্রয়োজনীয়।

১৯৬৯ সালে এর সাফল্যজনক প্রয়োগ ঘটান Texus নামক একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের জনৈক আধিকারিক পিটার ফির (Peter Pyhrr)। পিটার ফির এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়েছিলেন আর্থার বানর্স (Arther F. Burns) নামক জনৈক বিশেষজ্ঞের বক্তব্য থেকে। পিটার ফির-এর উদ্দেশ্য ছিল পরিকল্পনাকে শূন্য থেকে শুরু করা যায়। ফলে প্রতিনিয়ত কর্মচারী পিছু খরচ ও লাভের সঠিক অনুপাত বোঝা যাবে যা শেষ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ কমাবে। তাঁর গবেষণা প্রকাশিত হলে তৎকালীন জর্জিয়ার গভর্নর জিমি কার্টার জর্জিয়া রাজ্যে এটির প্রয়োগের অনুরোধ জানান।

এইভাবে কোন একটি সরকারি ব্যবস্থায় জর্জিয়া রাজ্যে ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে প্রথম শূন্য ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। জিমি কার্টার-এর রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন ১৯৭৯ সালের যুক্তরাষ্ট্রীয় বাজেটে এর প্রয়োগ ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ছাড়াও বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার, ৩৬টি পৌরসভা এবং প্রায় ২৫টি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান এখন এই পদ্ধতি অনুসরণ করছে।

এই ব্যবস্থার সপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে যুক্তিগুলি দেখানো হয় তা হল—

(১) কোন একটি বিভাগের সমস্ত স্তরে স্থিত ব্যক্তিবর্গদের বাজেট পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ।

(২) স্থিত প্রকল্পের যৌক্তিকতাকে সম্পূর্ণ নতুন করে দেখা ও নতুন প্রকেল্পের যৌক্তিকতা নিরূপণ।

(৩) উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার বিকল্প পদ্ধতি অন্বেষণ।

(৪) বিভাগের প্রত্যেকটি স্তরের আধিকারিকদের কাছে 'উদ্দেশ্য' সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জানানো এবং এক্ষেত্রে তাঁদের পরামর্শ শোনা ইত্যাদি।

শুধু মাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে শূন্যভিত্তিক বাজেটের উদ্দেশ্য বা সুবিধা আলোচান করা অপ্রয়োজনীয়। কারণ আমরা পৃথক দুটি এককে এগুলি নিয়ে আলোচনা করব। (একক নং ৪.৫ ও ৪ ১০)। ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ নিয়ে ৪.৯ এককে আলোচনা করা হাবে।

৪.৫ শূন্য ভিত্তিক বাজেটের উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষের অর্থ দপ্তরের ব্যয় মঞ্জুরি সংক্রান্ত বিভাগের বক্তব্য অনুযায়ী "শূন্য ভিত্তিক বাজেট উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত ও সুনির্দিষ্ট করে, উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার বিবিধ বিকল্প পথগুলিকে অন্বেষণ করে, ব্যয় ও সাফল্যের তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ বিকল্পটিকে চিহ্নিত করে, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে, কম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর জন্য নির্দিষ্ট ব্যয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীতে স্থানান্তরিত করে এবং উপযোগিতা হারিয়েছে এমন কর্মসূচী পরিত্যাগ করে।"

সুতরাং শূন্য থেকে শুরু করতে গেলে বিভাগীয় আধিকারিকদের প্রমাণ করতে হচ্ছে যে,

(১) দাবি করা নির্দিষ্ট পরিমাণ বাজেট বরাদ্দের যৌক্তিকতা কোথায়?

(২) এই ব্যাপারটি প্রমাণ করতে গেলে প্রকল্পের যৌক্তিকতাও প্রমাণ করতে হয়।

(৩) সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে কোন একটি কাজ সর্বাধিক ভালভাবে কিভাবে করা যাবে এবং সেই নির্দিষ্ট কাজটির জন্য আদৌ অর্থ ব্যয়িত হবে কেন?

(৪) অতএব সমস্ত কর্মসূচীর মধ্যে উপকরণ (ব্যয়) - উপপাদ (ফলাফল) পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করা দরকার

(৫) সমস্ত কর্মসূচীর এই যৌক্তিকতা নিরূপণের চেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়।

(৬) এর ফলে অপচয় বন্ধ হয়,

(৭) কারণ সমস্ত কর্মসূচীকে সর্বদাই মূল্যায়নের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

আধুনিক বাজেট ব্যবস্থার সূত্রপাত ও শূন্য ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। অর্থাৎ যে কোন বাজেট শূন্য থেকেই শুরু হয়। এর পরে প্রত্যেক বছর এই অভিজ্ঞতার পুনরাবর্তন চলতে থাকে। এর অর্থ এই নয় যে পূর্বে যে কাজ সাধিত হয়েছে তা আদৌ বিবেচনার মধ্যে আনা হয় না। যা করা হয় তা হল প্রত্যেকটি দপ্তরকে এই বিশ্লেষণ করতে হবে যে পূর্বের সমাধা করা কাজের যৌক্তিকতা ও গুণগতচরিত্র কি রকম ছিল যার ভিত্তিতেই পরের বছরের বরাদ্দের বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন করে ভাবতে হয়। এর ভিত্তিতে বরাদ্দ বাতিল হতে পারে, কমতে পারে, বাড়তে পারে বা একই থাকতে পারে।

৪.৬ শূন্য ভিত্তিক বাজেট ও প্রথাগত বাজেট ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা

শূন্য ভিত্তিক বাজেটের অর্থ ও উদ্দেশ্য আরো পরিস্ফুট হবে যদি প্রথাগত বাজেট ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনার ভিত্তিতে এর অর্থ আরো পরিস্ফুট করা যায়।

পূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পেরেছি যে 'শূন্য ভিত্তিক বাজেট' শব্দটির মধ্যেই এর অর্থ নিহিত আছে। পার্থক্যের প্রশ্নটিকে যদি কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার (যা আমরা পূর্বের এককে আলোচনা করেছি) পূর্বের অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করি যাকে আমরা object-wise বা বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ বলেছি, সে ক্ষেত্রে দেখব যে এই ব্যবস্থায় সরকারি বিভাগগুলির দৈনন্দিন কার্যপরিচালনাকে বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমায়িত রাখাই যেন মূল উদ্দেশ্য এবং এটি প্রতি আর্থিক বছরে মূল্যস্তরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। শূন্য ভিত্তিক বাজেট প্রাত্যহিক দৈনন্দিন কর্মপ্রক্রিয়া নয়, অথবা যান্ত্রিক ভিত্তিতে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়ে যাওয়া নয়।

আপনারা কর্মভিত্তিক বাজেটের প্রেক্ষাপটে পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারেন। দৈনন্দিন কর্মপরিচালনা নয়, কাজ-কর্মসূচী—উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে বাজেটে বরাদ্দ কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। এখানে বাজেট বরাদ্দ পূর্বের পটভূমির প্রেক্ষাপট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়, এই অবস্থার সঙ্গে শূন্য ভিত্তিক বাজেটের পার্থক্য স্বাভাবতই আপনারা অনুধাবন করতে পারছেন বলা যায়। এই নির্দিষ্ট পার্থক্যের বিষয়টি কি আপনারা লিখতে পারবেন?

সম্মিলিতভাবে ঐতিহ্যগত বাজেট পদ্ধতির সঙ্গে কয়েকটি পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

(১) ঐতিহ্যগত ব্যবস্থায় সাধারণভাবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ

ক্ষেত্রে বাজেট স্থানান্তরিত করা যায় না। শূণ্য ভিত্তিক বাজেটের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এই প্রশ্ন ওঠে না।

(২) ঐতিহ্যগত ব্যবস্থায় ব্যয় ও প্রাপ্তির জৈবিক সম্বন্ধ স্থাপন মূলত অপরিহার্য নয়। শূন্যভিত্তিক বাজেটের ক্ষেত্রে মূলত তা অপরিহার্য।

(৩) ঐতিহ্যগত বাজেট ব্যবস্থা মূলত হিসাব রক্ষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং ব্যয়কে সর্বদাই পর্যাবেক্ষণের মধ্যে রাখাই এর উদ্দেশ্য। শূন্যভিত্তিক বাজেট একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ মূলক পথ অনুসরণ করে, দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্যকে কোন একটি বছরের বরাদ্দের ক্ষেত্রে তা দিগ্‌দর্শন হয় না।

(৪) ঐতিহ্যগত ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি, কাঁচা সম্পদ ও মজুরি বৃদ্ধি ইত্যাদিকে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বরাদ্দের কারণ হিসাবে ধরা হয়। শূন্য ভিত্তিক বাজেটে এই প্রশ্ন আসে না।

(৫) মনে রাখতে হবে শূন্য ভিত্তিক বাজেটের ক্ষেত্রে পূর্ববছরের কর্মসূচী বাতিল নয়, তার বরাদ্দকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে দেখাই উদ্দেশ্য। ঐতিহ্যগত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই সম্পূর্ণ নতুনভাবে দেখার ব্যাপারটি থাকে না।

৪.৭ অনুশীলনী-১

প্রশ্নঃ

(১) শূন্য ভিত্তিক বাজেট সংক্রান্ত ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

(২) শূন্য ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৩) শূন্য ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

(৪) প্রথাগত বাজেট ব্যবস্থা ও শূন্য ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪.৮ বাজেট প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়

যে কোন সাংগঠনিক ব্যবস্থায় চারটি সহজ স্তরের মধ্যে দিয়ে শূন্য ভিত্তিক বাজেটের প্রয়োগ ঘটানো যায়। তবে এই ব্যবস্থার প্রয়োগের পূর্বে কয়েকটি আবশ্যকীয় শর্ত পূরণ করা দরকার।

(১) যে সংগঠনে তা ব্যবহৃত হবে, এই ব্যবস্থার সপক্ষে সেই সংগঠনের চাহিদা যেন যথার্থ হয়।

(২) কোন একটি সংগঠনের পরিচালন ব্যবস্থার আবহাওয়া সম্বন্ধে বিষয়গত বিশ্লেষণ জরুরি, তা না হলে সেই সংগঠন এই ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারবে না।

(৩) একজন দক্ষ হিসাব রক্ষক দরকার যিনি পরিচালকবর্গের পদমর্যাদা সম্পন্ন হবেন এবং সংগঠনের বাজেট প্রস্তুত পদ্ধতিতে যাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।

(৪) সংগঠনের সর্বোচ্চ পরিচালকবর্গ একে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করবেন এবং এই ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হবেন।

(৫) কোন একটি সংগঠনের কাজকর্মের যে নিজস্ব নিয়মের জটিল সমাহার থাকে (Technical requirements) শূন্য ভিত্তিক বাজেট যেন সেগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় অথবা বিপরীত ক্রমে

সেগুলি যেন বাজেট ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

(৬) এই ব্যবস্থা প্রয়োগের পর পরবর্তী মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন।

৪.৮.১ চারটি প্রধান পর্যায়

(১) সংগঠনের কাঠামো পর্যালোচনা করা এবং সংগঠনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এককগুলিকে (Decision units) ও তাদের উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করা।

(২) সিদ্ধান্ত গ্রহণ এককগুলিকে বিশ্লেষণ করা এবং আলোচনা ও গ্রহণের জন্য প্রস্তাবগুচ্ছ তৈরি করা (Decision Package)

(৩) নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এই প্রস্তাবগুচ্ছকে মূল্যায়ন করা এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেগুলিকে শ্রেণী বিন্যস্ত করা।

(৪) প্রস্তাবগুচ্ছের অগ্রাধিকার অনুযায়ী এগুলির বাস্তবায়নের জন্য সংগঠন তৈরি করা ও পুনর্বিন্যস্ত করা এবং বাজেটের বিস্তৃত রূপরেখা প্রণয়ন করা।

পর্যায় - ১

সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী একক কাকে বলে?

এটি হচ্ছে কোন একটি সংগঠনের সুনির্দিষ্ট অংশ, সংগঠনের কাজ ও কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে একে চিহ্নিত করা যায়।

সুতরাং সংগঠনের কাঠামো ও কাজাকর্ম অনুধাবন করা প্রথম কর্তব্য। প্রত্যেকটি সংগঠনই পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত স্তরবিন্যাসে বিভক্ত, এই স্তর বিন্যাসের কারণ হচ্ছে এতে প্রত্যেকের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কার্যকারী সম্পর্ক পরিস্কার করে বোঝা যায়। এছাড়াও নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত সিধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ভূমিকা বোঝা যায়। মূলত এই স্তরগুলি হচ্ছে এক একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী একক।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী একক-গুলির কাজ হচ্ছে প্রাথমিকভাবে সংগঠনের বাজেট বরাদ্দ স্থির করা। মনে রাখা দরকার সংগঠনের মধ্যে কোনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী একক তা মূলত শেষপর্যন্ত স্বিকৃত হয় সংগঠনের উচ্চতম পরিচালন কতৃপক্ষের দ্বারা। প্রত্যেকটি এককের সর্বোচ্চ পরিচালক (Manager) এককের পরিধি ও ব্যয় বরাদ্দের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কি গুণগত চরিত্রের কাজ ও কর্মসূচী গৃহীত হবে সে ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এককের। সংগঠনের অন্তর্গত সমস্ত এককের এই সুপারিশের ভিত্তিতেই সংগঠনের মূল বাজেট প্রণীত হয়। শূন্যভিত্তিক বাজেটে যদি সমস্ত কর্মসূচীকে প্রতিবছর শূন্য অবস্থান থেকে শুরু করতে হয় সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এককের বক্তব্য না জানলে চলে না, কারণ এরাই কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক একক।

পর্যায়-২

দ্বিতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এককগুলি বিশ্লেষণ, আলোচনা ও গ্রহণের জন্য যে "প্রস্তাবগুচ্ছ" তৈরি করে সেই প্রসঙ্গটি আসে (Decision Package)।

প্রস্তাবগুচ্ছে কর্মদ্যোগের জন্য বাজেট বরাদ্দের যৌক্তিকতা বিস্তৃতভাবে উল্লেখিত থাকে। একাধিক প্রশ্নের

উত্তর প্রদানের ভিত্তিতে এই যৌক্তিকতা রূপরেখা প্রণীত হয়।

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ কি নির্দিষ্ট প্রয়োজন সাধিত করছে তা জানা। এটি ব্যয়ের উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতাকে তথা প্রস্তাবগুচ্ছকে অনেক বেশি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করে। এরফলে বাজেট মূল্যায়নের কৌশলগুলিকেও অনেক ভালভাবে ব্যবহার করা যায়।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটিকে বা প্রস্তাবগুচ্ছকে বাস্তবায়িত করার জন্য আরো উন্নত বিকল্প আছে কিনা, যার জন্য "বাজেট বরাদ্দ" প্রস্তাবিত হয়েছে?

১৯৮৬ সালে "Introduction of Zero-base budgeting of the Government of India" নামক প্রতিবেদনে ভারত সরকার "প্রস্তাবগুচ্ছ" (Decision Package) কি কি বিষয় সম্বলিত হবে তার উল্লেখ করেছেন।

(১) সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এককের কাজের বর্ণনা।

(২) বিভিন্ন কাজ / কর্মোদ্যোগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

(৩) কর্মোদ্যোগ / প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগের পরিণতি হিসাবে আগত লাভ।

(৪) সংগঠন বা বিভাগের সামগ্রিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে প্রকল্প / উদ্যোগের যৌক্তিকতা।

(৫) প্রকল্প / উদ্যোগ যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য না পেলে তার পরিণতি।

(৬) প্রকল্প বা উদ্যোগের জন্য সম্ভাব্য অনুমিত ব্যয়ের হিসাব।

(৭) একই কর্মোদ্যোগ বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিকল্প পদ্ধতি অন্বেষণ।

আমরা পূর্বে Peter Pyhrr - এর নামোল্লেখ করেছিলাম। তাঁর বক্তব্য এবং প্রস্তাবগুচ্ছের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত উপরিউক্ত বক্তব্য মূলত সমধর্মী।

"প্রস্তাবগুচ্ছের" অন্যতম আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এককের পরিচালক (Manager) একে ব্যবহার করতে পারেন তাঁর দায়িত্ব ও উদ্দেশ্যকে চিহ্নত করার জন্য। তিনি কোন কোন উদ্যোগকে বাতিল করার সুপারিশও করতে পারেন।

পর্যায়-৩

তৃতীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রস্তাবগুচ্ছের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করলে বোঝা যায় যে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন আছে কিনা অথবা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলিকে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করলে কোন অতিরিক্ত লাভ হবে কিনা।

অর্থাৎ সম্পদের স্বল্প যোগানের পরিপ্রেক্ষিতে "অগ্রাধিকার" পরিচালন কর্তৃপক্ষকে নিম্নলিখিত তিনটি প্রশ্নের উত্তর পেতে সাহায্য করে ঃ

(১) কোন ক্ষেত্রে অর্থ প্রথমে ব্যয় করতে হবে?

(২) এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলিকে পরিপূরণ করার জন্য কত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে?

(৩) অনুমোদিত না হওয়ার জন্য যে সব প্রস্তাবগুচ্ছ কার্যকারী হবে না তার ভবিষ্যৎ প্রভাব অর্থনীতিতে কি রকম হতে পারে?

যে ভাবে প্রস্তাব গুচ্ছের অগ্রাধিকার স্থির হয় ঃ-

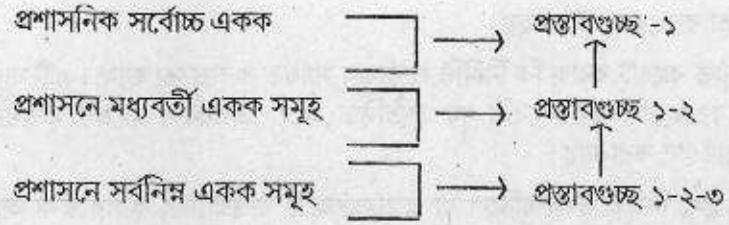

পর্যায় -৪

ক্ষুদ্র সংগঠনগুলির তুলনায় বৃহদায়তন সংগঠনগুলিতে প্রস্তাবগুচ্ছের অগ্রাধিকার ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ করা স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট সমস্যাজনক । কারণ বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য বিবদমান প্রস্তাবগুচ্ছের অগ্রাধিকার নিরূপণ করা সময় ও শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার।

সমস্যাটি কিছুটা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সমাধান করা হয়—

(১) যেগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুচ্ছ পরিচালক কর্তৃপক্ষ সেগুলিকে দ্রুত অন্বেষণ করে যার ভিত্তিতে বরাদ্দের পরিমাণ স্থির করা হয়।

(২) প্রস্তাবগুচ্ছকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে কঠোরতর পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়ের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে।

ব্যয় বরাদ্দের জন্য পেশ করা সমস্ত প্রস্তাবগুচ্ছকে মূল তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—

(১) সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয় যেগুলির বরাদ্দ প্রাপ্তির সম্ভাবনা সর্বাধিক ঃ

(২) যে গুলির গুরুত্ব ক্রমাহ্রাসমান এবং সম্পদের যোগানের উপর যেগুলির বাজেট বরাদ্দ নির্ভর করে, অর্থাৎ বাজেট বরাদ্দ হতেও পারে, নাও হতে পারে।

(৩) যেগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং যেগুলির বাজেট বরাদ্দের সম্ভাবনা খুবই কম।

৪.৯ ভারতবর্ষে শূন্য ভিত্তিক বাজেটের প্রবর্তন

ভারতে শূন্য ভিত্তিক বাজেটের ইতিহাস বেশ পুরোন। ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ইউনিয়ন কার্বাইড ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে এই ব্যবস্থা অনুসরণ করে চলেছে, যদিও "শূন্য ভিত্তিক বাজেট"—এই শব্দ তারা ব্যবহার করে না।

অবশ্য সরকারি ব্যবস্থায় এর প্রয়োগ সম্প্রতিককালে ঘটেছে। ভারত সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও মহাকাশ গবেষণা দপ্তর ১৯৮৩ সালে এর প্রয়োগ ঘটায়।

ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রনালয় ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বছর থেকে সমস্ত মন্ত্রণালয়ের জন্য এই ব্যাবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। বাস্তবে ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বর্ষ থেকে এটি চালু হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় ১৫ ০টি কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প চিহ্নিত করে যার অনুমিত ব্যয় ছিল প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। মূলত এগুলি বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে ভারত সরকারের সমস্ত মন্ত্রণালয়ে এর সাফল্য খুবই নগণ্য।

রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্র ও কর্নাটক সরকার শূন্য ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে।

অধিগৃহীত সংস্থাগুলির মধ্যে BHEL, HMT, BEL, Indian Oil, Indian Telephone Industries, ইস্পাত কারখানাগুলি এবং সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এই ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

৪.১০ শূন্য ভিত্তিক বাজেট - সুবিধা ও সমস্যা

এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় দিকগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) ঘাটতি বাজেটের সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যে কোন সংগঠন এই বাজেট ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। ব্যবস্থাটি মূলত পরিকল্পিত আর্থিক উন্নতির স্বার্থেই সর্বাধিকভাবে প্রযোজ্য; অবশ্য পরিচালকরা প্রত্যক্ষভাবে এটি ব্যবহার করতে চান তাৎক্ষণিক ভাবে খরচ বাঁচানোর জন্য।

(২) পরিচালকরা প্রত্যক্ষভাবে আরো যে দিকটি থেকে এর গুরুত্ব অনুভব করেন তা হল যে কোন সময়ে "প্রস্তাব গুচ্ছের" অগ্রাধিকারের ক্রমকে পরিবর্তন করা যায় এবং এর ফলে সামগ্রিক পরিবেশ খুবই নমনীয় হয়ে ওঠে।

(৩) প্রস্তাবগুচ্ছের অগ্রাধিকার প্রণয়ন করতে গিয়ে পুরোনো ও নতুন প্রকল্পগুলিকে পরীক্ষা করতে হয়। এর ফলে সম্পদের যথার্থ ব্যবহার ঘটে।

(৪) একাধিক সমজাতীয় প্রকল্প এই অগ্রাধিকার প্রণয়ন পর্বে বাতিল হয়, ফলত আর্থিক ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে স্থিতিশীল হয়ে আসে।

(৫) শূন্য ভিত্তিক বাজেট যখন কোন একটি আর্থিক বছরে চালু আছে তখন পরিচালকবৃন্দ অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গভীরতর পাঠের ব্যাপারে উৎসাহিত হতে পারেন। কারণ একই পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন পরের বছরও ঘটতে হবে।

(৬) এই ব্যবস্থায় নতুনতর পদ্ধতিসমূহ সর্বদাই আবিষ্কৃত হতে থাকে, কারণ বরাদ্দ ও প্রাপ্তির আনুপাতিক হারকে সর্বদাই লাভজনক রাখতে হয়।

(৭) আর্থিক বছরের মধ্যবর্তী পর্বে অর্থের যোগানের ঘাটতি হলে সেক্ষেত্রেও প্রকল্পের পুনর্বিন্যাস ঘটানোর মধ্য দিয়ে জরুরি অবস্থা সামলানো যায়।

(৮) প্রকল্পের অগ্রাধিকার ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসের দ্বারা সংগঠনের মধ্যস্থিত শ্রমশক্তির যথার্থ ব্যবহার ও যথার্থ স্তরবিন্যাস ঘটানো সম্ভব হয়।

(৯) শূন্য ভিত্তিক বাজেট খুবই নমনীয় এই অর্থে সমগ্র সংগঠনে একই সঙ্গে এটিকে ব্যবহার করতে হবে তার কোন মানে নেই; আবার সংগঠনের কোন একটি বিভাগের সমস্ত অংশেও একই সঙ্গে এটিকে ব্যবহার করতে হবে তারও কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এতএব অগ্রাধিকার ভিত্তিক এলাকা চিহ্নিত করার অবকাশ এখানে থাকছে।

(১০) ভারত সরকার যখন শূন্য ভিত্তিক বাজেট প্রকল্প গ্রহণ করে তখন সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কাল। এই পর্বে অর্থের যোগানের নিদারুণ ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে শূন্য ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থা প্রণয়ন না করলে সরকারকে বিপুল ঘাটতি বাজেটের সম্মুখীন হতে হত যা কখনই কাঙ্খিত নয়।

৪.১০.১ প্রয়োগজনিত সমস্যা

(১) ব্যয় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য শূন্য ভিত্তিক বাজেট খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি সন্দেহ নেই। কিন্তু সংগঠনের মধ্যে

ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে এইরকম কর্মীবৃন্দ কখনই ব্যয় নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে বাস্তবায়িত হতে দিতে চাইবেন না। অতএব নতুন প্রকৌশলের প্রভাব কর্মীদের মধ্যে কি হবে এবং কর্মীদের চরিত্রের প্রভাব নতুন পরিচালন কৌশলের উপর কি রকম হবে তা যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে যে সমস্ত কর্মী কর্মসংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ও দুর্নীতি-পরায়ণ নন, তাঁদের পক্ষেও পুরোনো কাজের ধারা পরিত্যাগ করা সমস্যাজনক হয়ে পড়ে। সুতরাং শূন্য ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক ব্যবস্থার চরিত্র অনুধাবন করা ও পরিমার্জন করা জরুরি।

(২) এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ঐতিহ্যগত বাজেট ব্যবস্থার তুলনায় শূন্য ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থা অনেক জটিল ওসময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সমস্ত স্তরের পরিচালন কর্তৃপক্ষের পক্ষে ব্যাপারটি অনুধাবন করা সব সময় সম্ভব হয় না, অথবা সম্ভব হলেও এক্ষেত্রে পারস্পরিক যোগাযোগের যে উন্নততর ব্যবস্থা থাকা দরকার তার বাস্তবায়ন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

(৩) প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী একক তাদের প্রস্তাবগুচ্ছ প্রণয়ন করে এবং তার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে। এর ফলে কাগজের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সরকারি বিভাগগুলিতে এত অসংখ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী একক বা প্রস্তাবগুচ্ছ থাকে যে এই বিপুল তথ্য সম্ভারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

(৪) সাধারণভাবে প্রায় কোন দেশেই এই রকম কোন সর্বজনীন পদ্ধতি নেই যার সাহায্যে কোন বিষয়ে ন্যূনতম ব্যয় বরাদ্দ কি হবে তা স্থির করা যায়। এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত সাধারণত সংগঠনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আসে যার প্রায়শই কোন সর্বজনীন যৌক্তিকতা থাকে না।

(৫) আবার প্রস্তাবগুচ্ছকে যখন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত করা হয় তখন এই শ্রেণী বিভিক্ত - করণের ও সর্বজনীন ভাবে গ্রাহ্য কোন পদ্ধতি ও মানদন্ড খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

(৬) প্রস্তাবগুচ্ছের শ্রেণীবদ্ধকরণের একটি রাজনৈতিক দিকও আছে। অগ্রাধিকারের মানদন্ড রাজনৈতিক চাপের দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের সমাজব্যবস্থাগুলিতে এই সমস্যা সবাধিক।

৪.১১ অনুশীলনী -২

প্রশ্ন — ১। শূন্য ভিত্তিক বাজেট প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়গুলি আলোচনা করুন।
২। এই ব্যবস্থার সুবিধা ও সমস্যাগুলি আলোচনা করুন।

৪.১২ সারাংশ

একটি সংগঠনের উদ্দেশ্যকে সম্পদের যথার্থ বন্টনের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে শূন্য ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থা কাজ করে। এই কারণেই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থায় তা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ব্যয় ও ফলাফলের অনুপাতের একটি সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছাতে সংগঠনের পরিচালকদের এই ব্যবস্থা সাহায্য করে। প্রশাসক অগ্রাধিকারকে সুনিশ্চিত করতে পারেন এবং সম্পদের স্বল্পতার সঠিক ব্যবহার এর দ্বারা হতে পারে।

বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে পুরোনো ও নতুন সব প্রকল্পই সমগুরুত্ব নিয়ে অবতীর্ণ হতে পারে। এর ফলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে চলমানতা বৃদ্ধি পায় ও আর্থিক ব্যবস্থা অধিকাধিক উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে গেলে চারটি মূল পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে একে অগ্রসর হতে হয়।

কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থায় অভ্যাসগত দাসত্ব ভারতীয় আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রাস করছে। কিন্তু ভারববর্ষ যে অর্থনৈতিক সমস্যা ও জনবিস্ফোরণজাত অসহায়তার শিকার সেক্ষেত্রে শূন্য ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার চূড়ান্ত ব্যবহার আবশ্যক।

৪.১৩ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

প্রশ্ন- (১) শূন্য ভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার ধারণা বিশ্লষণ করুন। এই ব্যবস্থার ক্রম উদ্ভবের কারণগুলি কি কি?

(২) শূন্য ভিত্তিক বাজেটের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন। এই ব্যবস্থার সঙ্গে প্রথাগত বাজেট ব্যবস্থার পার্থক্য কোথায়?

(৩) শূন্য ভিত্তিক বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায় সমূহ বিশ্লেষণ করুন। এইপ্রসঙ্গে এই ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বর্ণনা করুন।

৪.১৪ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী - ১

প্রশ্ন

(১)— একক ৪.৩

(২)— একক ৪.৪

(৩)— একক ৪.৫

(৪)— একক ৪.৬

অনুশীলনী - ২

প্রশ্ন

(১)— একক ৪.৮, ৪.৮.১

(২)— একক ৪.১০, ৪.১০.১

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

প্রশ্ন

(১)— একক ৪.৩,৪.৪

(২)— একক ৪.৫, ৪.৬

(৩)— একক ৪.৮, ৪.৮.১, ৪.১০, ৪.১০.১

৪.১৫ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

1. Zero- Base Budgeting - Peter A. Pyhrr. John. - Wileyand sons, New Your.

2. Expenditure Control and Zero-Base Budgeting - K.L.Honda.- Indian Institute of Finance, New Delhi.

3. Techniques of Zero-Base Budgeting. Text and Cases - P.L.Joshi. Himalaya Publishing House, Bombay

[illegible]

[illegible]

৪.১৩ অনুশীলনী প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১। [illegible]

(ক) [illegible]

(খ) [illegible]

৪.১৪ উত্তর সংকেত

[illegible]

৪.১৫ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

1. Zero Base Budgeting - Peter A. Phyrr John - Wiley and sons New York
2. Performance Control and Zero-Base Budgeting - R. L. Handa - Indian Institute of Finance, New Delhi.
3. Techniques of Zero-Base Budgeting : Text and Cases - F.L. Joshi, Himalaya Publishing House, Bombay

ভূমিকা

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ,

জন প্রসাশন বিজ্ঞানের ষষ্ঠ পত্রের দ্বিতীয় পর্যায় নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

আপনারা জানেন ষষ্ঠ পত্রের বিষয়সূচী আর্থিক প্রশাসনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

প্রথম পর্যায়ে আর্থিক প্রশাসনের তাত্ত্বিক অর্থ এবং বাজেট কাকে বলে ও বাজেটের প্রকারভেদ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতবর্ষে বাজেট প্রক্রিয়ার বাস্তব ব্যবস্থা আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

এক্ষেত্রে আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত মূল বিষয়বস্তু নিম্নরূপ — "Preparation of Budget and the Ministry of Finance -- Execution of Budget and Review -- The role of Financial Committees".

উপরিউক্ত বিষয়বস্তুকে চারটি মূল এককে বিভক্ত করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বাজেট প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় শাসন বিভাগ কর্তৃক বাজেট প্রস্তাব প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলি তাদের প্রস্তাব প্রণয়ন করে। কিন্তু এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানকারী ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় অর্থ দপ্তরকে এবং অর্থমন্ত্রী ও উচ্চপদাধিকারী আমলাদের সরকারি নীতির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই পর্যায়টিই বস্তুতপক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শাসন বিভাগকে আরো যে কাজটি করতে হয় তা হল আইনবিভাগ কর্তৃক বাজেট গৃহীত হওয়ার পর তার বাস্তবায়ন।

অতএব প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের মধ্যবর্তী পর্যায়ে আছে আইনসভা কর্তৃক বাজেট গ্রহণ। এক্ষেত্রে ব্যয়ের দাবি যেমন অনুমোদন করা প্রয়োজন তেমনি রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাবও অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

সংসদ একটি বৃহৎ সদস্যসংখ্যা বিশিষ্ট সংগঠন এবং তা একটি স্বল্প সময়ের জন্য আহুত হয়। এর ফলে বিস্তৃত বিশ্লেষণের জন্য কমিটি ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিটি হচ্ছে আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি (Estimates Committee) ও সরকারি গণিতক কমিটি (Public Accounts Committee)।

আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি ব্যয়-বরাদ্দ দাবির যৌক্তিকতা তথা মিতব্যয়িতার বিশ্লেষণ করে।

সরকারি গণিতক কমিটি শাসন বিভাগ যেভাবে ব্যয় করে, তার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে।

এর ভিত্তিতেই সূচীপত্রের বিন্যাস হয়েছে।

একক ৫ ☐ অর্থমন্ত্রক বাজেট প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ শাসনবিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের ধারণা ও ভারতবর্ষের বাজেট

৫.৪ অর্থমন্ত্রণালয়

- ৫.৪.১ অর্থমন্ত্রণালয় – সাংগঠনিক কাঠামো
- ৫.৪.২ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভাগ
- ৫.৪.৩ ব্যয় নির্বাহ সংক্রান্ত বিভাগ
- ৫.৪.৪ রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগ

৫.৫ অনুশালনী - ১

৫.৬ বাজেট প্রস্তুতিকরণ

- ৫.৬.১ বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তব প্রক্রিয়াসমূহ
- ৫.৬.২ অর্থদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ
- ৫.৬.৩ অর্থমন্ত্রকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ

৫.৭ বাজেট গ্রহণ - পরবর্তী অর্থমন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা

৫.৮ অনুশীলনী - ২

৫.৯ সারাংশ

৫.১০ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

৫.১১ উত্তর সংকেত

৫.১২ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আয়ত্ব করতে পারবেন ঃ

- মূলত ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে বাজেট প্রণয়নের বিষয়
- বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট গ্রহণ এই দুই পৃথকীকৃত বিষয়
- বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের ভূমিকা

- এ ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রণালয়ের বিশেষীকৃত ভূমিকা
- অর্থমন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো
- অর্থমন্ত্রাণালয়ের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কারণ এবং তার সমালোচনামূলক মূল্যায়ন
- কর্মভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার সমালোচনামূলক মূল্যায়ন

৫.২ প্রস্তাবনা

পর্যায় ২১-এ বাজেট সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনার সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। আপনারা জানেন পর্যায় ২২-এ ভারতীয় বাজেট প্রশাসন আমাদের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু। পর্যায় ২২-এর প্রথম এককে আবশ্যকীয় কতকগুলি বিষয় আমরা দেখে নেব।

আমরা পূর্বেই জেনেছি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অথবা যে কোন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই বাজেট রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসনের অন্যতম মেরুদন্ড। আমরা এও জেনেছি আর্থিক প্রশাসনবিদদের একটি অংশ মনে করেন "বাজেটই আর্থিক প্রশাসন।"

পৃথিবীর যে কোন উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশের মত ভারতবর্ষেও রাজনৈতিক শাসনবিভাগ শেষপর্যন্ত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়, যদিও সাংবিধানিকভাবে রাজনৈতিক শাসনবিভাগ আইনবিভাগের কাছে দায়বদ্ধ।

এই দায়বদ্ধতা শেষ পর্যন্ত দুটি কারণে মূলত বাস্তবায়িত হতে পারে না। প্রথমত, বাজেট প্রণয়ন তথা প্রস্তুতিকরণ শাসন বিভাগের সাংবিধানিক দায়িত্ব এবং এক্ষেত্রে ভারতবর্ষে আবার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে অর্থমন্ত্রক। দ্বিতীয়ত, আইনসভায় বাজেট গৃহীত হওয়ার আনুষ্ঠানিক বিস্তৃত পদ্ধতি যে একেবারে মূল্যহীন তা নয়, কিন্তু এই ব্যাপারটিও শেষপর্যন্ত আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয় এই কারণে যে রাজনৈতিক শাসনবিভাগ যে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করে তার আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে।

অতএব বাজেট গ্রহণের থেকে বাজেট প্রস্তুতিকরণ যেন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। শাসনবিভাগীয় এই গুরুত্বের বিষয়টি আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু।

আমরা জানি শাসনবিভাগ বলতে রাজনৈতিক ও অ-রাজনৈতিক শাসনবিভাগ উভয়কেই বোঝায়। বাজেট প্রণয়নে উভয়েরই গুরুত্ব আছে। তবে রাজনৈতিক শাসনবিভাগের নেতৃত্বদানকারী ভূমিকার কথা আমরা সকলেই জানি।

ভারতীয় আর্থিক প্রশাসনে অ-রাজনৈতিক শাসনবিভাগের অংশ হিসাবে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক (Comptroller and Auditor General) গুরত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন। বাজেট বরাদ্দকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়গুলি কিভাবে ব্যবহার করছে তথা ব্যয় করছে এবং হিসাব কিভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা তাঁর দায়িত্ব। সাংবিধানিকভাবে এই ক্ষমতা নির্দিষ্ট। সংবিধানের ১৫১/২ নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রের ও রাজ্যের ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কে যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের কাছে রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পেশ করা নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের কাজ। তাঁরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভায় তা পেশ করার ব্যবস্থা করেন।

তবে ১৯৭৬ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রণীত আইন অনুযায়ী সরকারি ব্যয়ের হিসাব তৈরি করা এই বিভাগের দায়িত্ব নয়। তার মানে মন্ত্রকগুলি তাদের ব্যয়ের যে হিসাব তৈরী করে তা পরীক্ষা করাই হচ্ছে মূল কাজ।

বাজেট প্রণয়নে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই বটে, কিন্তু রাজনৈতিক শাসনবিভাগের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্থিত এর প্রতিবেদন যথেষ্ট সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে। ফলত এর সমালোচনামূলক মূল্যায়ন পরবর্তী বাজেট প্রস্তুতির ক্ষেত্রে পরোক্ষে গুরত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে সন্দেহ নেই।

পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পর্যায় ২২-এর সপ্তম ও অষ্টম এককে সরকারি আনুমানিক ব্যয় কমিটি ও গণিতক কমিটি আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু। নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক সম্বন্ধে সাধারণ বক্তব্য সেইজন্য আমরা প্রথমেই উল্লেখ করে নিলাম।

৫.৩ শাসনবিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের ধারণা ও ভারতবর্ষের বাজেট

ভারতবর্ষে আর্থিক প্রশাসন পরিচালিত হয় যে ব্যবস্থাগুলির পারস্পরিক সমন্বয়ে, সেগুলি হল --- (১) আইনসভা, (২) শাসন বিভাগ, (৩) শাসন বিভাগের মধ্যে বিশেষীকৃতভাবে অর্থমন্ত্রণালয়, (৪) নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক, (Comptroller and Auditor General) (৫) পার্লামেন্টের বিভিন্ন কমিটি।

যে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণভাবে শাসন বিভাগ যে ব্যয়বরাদ্দ দাবি করে এবং বরাদ্দকৃত যে অর্থ বাস্তবে ব্যয় করে তা সম্পূর্ণভাবে আইনসভার অনুমোদন সাপেক্ষ। প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থায় একেই জনগণের অনুমোদন বলে মনে করা হয়। সাধারণভাবে একেই আমরা বাজেট-অনুমোদন বলে মনে করি। জনপ্রশাসনের ষষ্ঠ পত্রে ১ নং পর্যায়ে বাজেট কাকে বলে সেই বিষয়টি আপনারা বিস্তৃতভাবে বোঝার চেষ্টা করেছেন।

আমরা তাত্ত্বিকভাবে বলতে পারি শাসন বিভাগ বাজেট বরাদ্দ দাবি করে এবং আইনবিভাগ তা অনুমোদন করে। একে আমরা বাজেটের বিধিবদ্ধকরণ বলতে পারি। ৬ নং এককে ভারতের আইন সভায় বাজেট বিধিবদ্ধ করণের পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে আমরা আলোচনা করব।

আমরা জানি, যে কোন রাষ্ট্রের মতই ভারতবর্ষেও মন্ত্রীদপ্তর সমূহের প্রত্যেকটি কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত থাকে এবং সেগুলি যে অসংখ্য স্তরে স্তর-বিন্যস্ত থাকে। প্রশাসনিক নিয়মানুযায়ী সেক্ষেত্রে নিম্নতম স্তর উচ্চতম স্তরের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। আইনসভা কর্তৃক বরাদ্দকৃত ব্যয় ও রাজস্ব আদায়ের অধিকারের ক্ষেত্রে এই দায়বদ্ধতা একই রকমভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি একধরনের পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্ম দেয়।

আর্থিক ব্যবস্থার উপর শাসনবিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের আরো কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি আছে।

(১) শাসনবিভাগ রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি ও ব্যবস্থার যোগান দেয়।

(২) প্রথম পর্যায়ের ৩ ও ৪ নং এককে কর্মভিত্তিক বাজেট ও শূন্যভিত্তিক বাজেট ও শূন্যভিত্তিক বাজেট আলোচনার সময় আমরা দেখেছিলাম যে বরাদ্দ দাবির বিষয়টি ও বাস্তবে তা ব্যয় করার বিষয়টি, দুটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিগত কার্যক্রম থেকে, কত গুরুত্ব সহকারে সুচিন্তিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতবর্ষে দুটি পদ্ধতিগত কার্যক্রমই কিছু না কিছু ব্যবহৃত হয়। প্রথম পর্যায়ের ৩ ও ৪ নং একক দুটি এ প্রসঙ্গে আপনারা আর একবার পাঠ করে নিতে পারেন।

(৩) অতএব আমরা বলতে পারি, আয় ও ব্যয়ের চরিত্র প্রসঙ্গে এক ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে শাসনবিভাগ যুক্ত থাকে। এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে রাজনৈতিক শাসনবিভাগ রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে, আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া তারই অংশ।

(৪) আর্থিক ব্যবস্থার উপর শাসন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ এই কারণে আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে যে স্বাধীনতার পর জনকল্যাণকর রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা গৃহীত হয়েছে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়েছে; ফলত দাবির বৃহত্তর পরিধির তুলনায় সম্পদের প্রবাহ যথেষ্ট স্বল্প। ফলে শাসনবিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

(৫) অতএব বলা যায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর শাসন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। স্বাধীনতাপূর্ব ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা পর্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর শাসন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিয়ম মেনে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা; অর্থ ব্যয়ের উপপাদ অংশ তথা ফলাফল এখানে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্বাধীনতার পরে যথাক্রমে ১৯১৯,১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৮ এবং ১৯৭৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন আদেশ বলে শাসন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের গুণগত চরিত্রটি পরিবর্তিত হয় এবং সমগ্র ব্যবস্থাটি অনেক বেশি বিকেন্দ্রীত হয়। পুনরায় কর্মভিত্তিক বাজেট ও শূণ্যভিত্তিক বাজেটের প্রসঙ্গ স্মরণ করলে ব্যাপারটি আমরা বুঝতে পারব।

(৬) এই নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি শাসনবিভাগ তথা প্রশাসনের নিছক সততার উপরেই নির্ভর করে না; যদিও শাসন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মূল কর্তৃত্বকারী ভূমিকা পালন করে অর্থমন্ত্রণালয়, তবুও এটা ঠিক যে বাজেটে প্রত্যেক বিভাগের জন্য পৃথকীকৃত বরাদ্দ নির্দ্দিষ্ট থাকে। আধুনিক যুগে বাজেট ব্যবস্থার উদ্ভবের প্রাথমিক পর্বে এই জাতীয় সুস্পষ্ট বরাদ্দ বিভাগীকরণের অভাব ছিল। ফলে সাম্প্রতিকতম বাজেটে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অনেক কার্য্যকরি হতে পারে। এর ফলে বিভাগগুলির কাজের পারস্পরিক তুলনা সাধিত হয়, বাজেট নির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধন একধরনের প্রতিযোগিতার সূত্রপাত করে এবং এর ফলে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো কার্য্যকরি হয়।

(৭) এই জাতীয় নিয়ন্ত্রণ আরো যে বিষয়গুলির সূত্রপাত করে তা হল –

(ক) পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট কাজের লক্ষ্যমাত্রা এবং তা কতটা বাস্তবায়িত হতে পেরেছে সেটি নিরূপণ

(খ) বাস্তবে যতটা কাজ হওয়া উচিৎ ছিল তা না হলে বিচ্যুতির কারণ অন্বেষণ

(গ) বিচ্যুতি নিরসনকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

এই আলোচনাকে আমরা আরো বিস্তৃত করতে পারি; কিন্তু তা অপ্রয়োজনীয়। কারণ বক্তব্যের মূল চরিত্র অনুধাবন করাই যথেষ্ট। পরবর্তীক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক পাঠ করা অত্যন্ত জরুরি।

৫.৪ অর্থমন্ত্রণালয়

এখনও পর্যন্ত আমরা দুটি কাজ করেছি।

(১) ভারতীয় বাজেট ব্যবস্থার উপর শাসনবিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ আলোচনা করতে গিয়ে বাজেট ও শাসন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্কজনিত গুরত্ব বোঝার চেষ্টা আমরা করছিলাম। এই আলোচনা, বাজেট প্রস্তুতিকরণের

ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রণালয়ের ভূমিকা সংক্রান্ত আলোচনার মুখবন্ধ হিসাবে কাজ করতে পারে।

(২) প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রণালয়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রসঙ্গ আমরা উল্লেখ করেছিলাম।

এই কারণে অর্থমন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো প্রথমে আলোচনা করব; অতঃপর এর কাজ তথা বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

৫.৪.১ অর্থমন্ত্রণালয় – সাংগঠনিক কাঠামো

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর অর্থবিভাগের (Department of Finance) নাম পরিবর্তন করে অর্থমন্ত্রণালয় (Ministry of Finance) করা হয়।

১৯৪৯ সালে অর্থমন্ত্রককে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা হয় --

(ক) রাজস্ব ও ব্যয় নির্বাহ মূলক বিভাগ (Department of Revenue and Expenditure) এবং

(খ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভাগ (Department of Economic Affairs)।

১৯৯৪ সাল থেকে অর্থমন্ত্রককে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয় --

(ক) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভাগ (Department of Economic Affairs),

(খ) ব্যয় সংক্রান্ত বিভাগ (Department of Expenditure),

(গ) রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগ (Department of Revenue)।

প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য একজন পূর্ণ সময়ের সচিব আছেন। এই তিনজনের মধ্যে একজন বিভাগগুলির পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক এবং এক্ষেত্রে উদ্ভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলির দেখাশোনার দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাঁকে সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম বলা যায়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভাগের সচিব এই ভূমিকা পালন করেন।

একজন ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রীর নেতৃত্বে অর্থমন্ত্রণালয় পরিচালিত হয়। তাঁকে সাহায্য করার জন্য একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং একজন উপমন্ত্রী আছেন।

৫.৪.২ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভাগ

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করার মূল দায়িত্ব এই বিভাগের। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও স্বার্থের পরিচালনা, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অর্থনৈতিক সাহায্য দান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, ব্যাংক ব্যবস্থা ও ব্যাংক নয় -- এই জাতীয় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠাগুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি এর অন্যতম মুখ্য কাজ। রাষ্ট্রের বাজেট প্রণয়নের দায়িত্বও এই বিভাগের। কোন রাজ্য রাষ্টপতি শাসনে থাকলে সেই রাজ্যের জন্য বাজেট প্রস্তুতিকরণের কাজও এই বিভাগকে করতে হয়।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভাগ আবার ছ'টি মূল অংশে (Division) বিভক্ত। এই অংশগুলিকে ভাষার প্রকাশগত সুবিধার জন্য আমরা 'বিভাগ' বলেই অভিহিত করব। এগুলি হল --

(১) অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগত বিভাগ
(২) ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাগত বিভাগ
(৩) বীমা সংক্রান্ত বিভাগ
(৪) বাজেট বিভাগ
(৫) বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিভাগ
(৬) বহির্বিষয়ক অর্থনৈতিক বিভাগ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগত বিভাগ বস্তুত সমগ্র অর্থমন্ত্রকের নেতৃত্বদানকারী ব্যবস্থা। রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে এই বিভাগ যুক্ত। অর্থনৈতিক কর্মপ্রক্রিয়ার সম্পাদনা কি চরিত্র নিয়ে হচ্ছে তা দেখাশোনা করার কার্য্যকরি ভূমিকাও একে পালন করতে হয়। একটি বাৎসরিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংসদে পেশ করা এই বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব যা কেন্দ্রীয় বাজেটের একটি পশ্চাৎ পটভূমি হিসাবে কাজ করে।

কিন্তু অর্থমন্ত্রকের বিভিন্ন বিভাগের উপবিভাগগুলি সম্বন্ধে বিশেষীকৃত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগত বিভাগ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি শুধুমাত্র একটি উদাহরণ হিসাবে।

বাজেট বিভাগ ও তার কাজ সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আলোচনা করতে হবে যা আমরা করব ৫.৬ এককে।

৫.৪.৩ ব্যয় নির্বাহ সংক্রান্ত বিভাগ

এই বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় সংক্রান্ত সমস্ত কর্ম প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর পাঁচটি বিভাগ আছে।

(১) পরিকল্পনা রাজস্ব বিভাগ (Plan Finance Division)
(২) সংস্থা সংক্রান্ত বিভাগ (Establishment Division)
(৩) হিসাব পরীক্ষামূলক বিভাগ (Cost Accounts Branch)
(৪) মহাব্যয় নিয়ন্ত্রকমূলক সাংগঠনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষণমূলক বিভাগ (Organization of the Comptroller - General of Accounts)
(৫) কর্মচারী পরিদর্শনমূলক বিভাগ (Staff Inspection Unit)

৫.৪.৪ রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগ

কেন্দ্রীয় সরকার আরোপিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর সংক্রান্ত রাজস্ব ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব এই বিভাগ পালন করে। দুটি বিধিবদ্ধ সংগঠনের দ্বারা এই কাজটি সাধিত হয়–

(১) প্রত্যক্ষ কর সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বোর্ড
(২) আবগারি এবং অন্তঃশুল্ক বহিঃশুল্ক বোর্ড

১৯৮৫ সালে একটি নতুন অর্থনৈতিক অপরাধ সংক্রান্ত গোয়েন্দা বিভাগ (Economic Intelligence Bureau) প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থনৈতিক অপরাধ তদন্তের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার কাজের সমন্বয় এর দায়িত্ব।

৫.৫ অনুশীলনী - ১

প্রশ্ন - (১) আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর শাসনবিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝেন? এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ বাজেট ব্যবস্থাকে কি ভাবে ব্যবহার করে?

প্রশ্ন - (২) অর্থমন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৫.৬ বাজেট প্রস্তুতিকরণ (Preparation of Budget)

ভারতীয় সংবিধানে "বাজেট" শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। সংবিধানের ১১২ নং ধারায় 'বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন' এর (Annual Financial Statement) কথা বলা হয়েছে যা আগামী বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমিত আয়-ব্যয়ের হিসাব।

এই প্রতিবেদনের সর্বমোট তিনটি অংশ থাকে - (১) রাজস্ব সংক্রান্ত প্রতিবেদন; (২) ব্যয় নির্বাহ সংক্রান্ত প্রতিবেদন; (৩) একটি সার্বিক প্রতিবেদন। (এখানে মূলত থাকে উদ্বৃত্ত অথবা ঘাটতি সংক্রান্ত বক্তব্য)।

১৯৫৯-৬০ সালের বাজেটের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্রী দপ্তরগুলির জন্য সমষ্টিগতভাবে ব্যয় বরাদ্দের দাবি কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে জানানোর পদ্ধতি অনুসৃত হত। কিন্তু উক্ত নির্দিষ্ট আর্থিক বছর থেকে বিভিন্ন মন্ত্রী দপ্তরগুলির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যয়বরাদ্দের দাবি জানানো হয়ে থাকে।

এই দাবির সর্বমোট চারটি অংশ থাকে।

(১) প্রথম অংশে যে উদ্দেশ্যে দাবি জানানো হচ্ছে তা উল্লেখিত থাকে এবং এই দাবির সর্বমোট পরিমাণ কত তাও উল্লেখিত থাকে।

(২) দ্বিতীয় অংশে মন্ত্রীদপ্তরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (Items) ব্যয়ের একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া থাকে। মন্ত্রীদপ্তরের প্রত্যেকটি প্রাথমিক এককের (Primary Units) ব্যয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি কি কি তা এর দ্বারা জানা যায়।

(৩) তৃতীয় অংশে দ্বিতীয় অংশে উল্লেখিত সংক্ষিপ্তসারের বিস্তৃত বিশ্লেষণ থাকে।

(৪) চতুর্থ অংশটিকে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের 'ফুটনোট' বলা যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এখানে কেন্দ্রীয় আইন সভাকে বিভিন্ন মন্ত্রীদপ্তরের মধ্যে আন্তঃসমন্বয় কি হয়েছে অথবা বিভিন্ন সরকারের কাছ থেকে (অন্য সার্বভৌম রাষ্ট্র বা রাজ্য সরকার) পাওনা সংক্রান্ত আদায়ের (recoveries) চরিত্র কি রকম তা জানানো হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য বাজেট মূলত দুটি, (১) রেল বাজেট, (২) সাধারণ বাজেট। এছাড়াও প্রত্যেকটি রাজ্যসরকার নিজেদের জন্য পৃথক পৃথক বাজেট তৈরি করে। ১৯২১ সালে সাধারণ বাজেট থেকে রেল বাজেটকে পৃথক করে দেওয়া হয়। বাজেট সংক্রান্ত আলোচনা মূলত সাধারণ বাজেটকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে।

বাজেট প্রণয়নের মূল দায়িত্ব অর্থমন্ত্রণালয়কে বহন করতে হয়। সংবিধানের ৭৭(৩) ধারায় এর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার অধিকার রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়েছে যা বস্তুত অর্থমন্ত্রণালয়ের অধিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। বাৎসরিক আর্থিক প্রতিবেদন তথা বাজেট প্রণয়ন, আইনসভায় তা পেশ করা এবং আইনসভায় তা গ্রহণের বিভিন্ন পর্য্যায়ে সংশ্লিষ্ট থাকা, বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে এর বাস্তবায়নের বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা, রাজস্ব আদায় বা তার পরিমাণ নির্দ্ধারণ, বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত প্রকল্প ও তার জন্য ব্যয় বরাদ্দের দাবির তুলনামূলক সংশোধন -- এই সবই অর্থমন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রণয়ন কর্মকান্ডের অন্তর্গত।

বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রণালয়ের এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অবশ্য ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্বাধীনতা সময় পর্বে ও তার পরে যত বেশি শক্তিশালী হয়েছে অর্থমন্ত্রকের দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ব তত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণভাবে স্বাধীনতার পূর্বেই এই উদ্যোগের সূত্রপাত হয় ১৯১৯ সালে মন্টফোর্ড সংস্কার-এর (Montford Reforms 1919) দ্বারা। স্বাধীনোত্তর পর্বে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের স্বাধীন উপস্থিতি (Comptroller and Auditor General) বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে তুলেছে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি (Estimates Committee) ও সরকারি গণিতক কমিটি (Public Accounts Committee) কাজও অর্থমন্ত্রকের দায়িত্বকে বিপুল পরিমানে বাড়িয়ে তুলেছে। এই দুটি কমিটির কাজ নিয়ে আমরা যথাক্রমে সপ্তম ও অষ্টম এককে আলোচনা করব।

৫.৬.১ বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তব প্রক্রিয়াসমূহ

আমরা জানি ভারতে আর্থিক বছর ১ এপ্রিল থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বিস্তৃত। নতুন আর্থিক বছর শুরু হওয়ার ছয় থেকে আট মাস পূর্বে বাজেট প্রণয়নের বাস্তব কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। অর্থমন্ত্রক সমগ্র মন্ত্রীদপ্তরগুলিকে তাদের সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুতীকরণের জন্য একটি আদেশ পাঠায়। কারণ এক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম হল এই যে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যয় যে করছে, ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তার হিসাবও তাকেই প্রদান করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে অর্থমন্ত্রক প্রত্যেকটি মন্ত্রকে পূরণ করার জন্য যে আবেদন পত্র পাঠায় তা সংশ্লিষ্ট দপ্তর অধস্তন স্তরগুলিতে প্রেরণ করে। এই আবেদন পত্র দপ্তরের অধীনস্থ স্তরবিন্যাসগুলিতে সেই আধিকারিকদের পাঠানো হয় যাঁদের অর্থ তোলা ও ব্যয়ের জন্য বিতরণ করার অধিকার আছে (Drawing and Disbursing Officer)।

প্রত্যেকটি আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত মূল বিষয়গুলি জানতে চাওয়া হয় :

(১) পূর্ব আর্থিক বছরের প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ

(২) চলতি আর্থিক বছরে অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দ

(৩) চলতি আর্থিক বছরে সংশোধিত বরাদ্দ

(৪) আগামী আর্থিক বছরের জন্য আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দের হিসাব

(৫) আগামী আর্থিক বছরের আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দের হিসাব প্রণয়নের সময় চলতি বছরে প্রকৃতপক্ষে যে বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং একই সময় পূর্ব বছরে প্রকৃতপক্ষে যে বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছিল তা।

এইভাবে যে আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রণীত হয় তা উপরিউক্ত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ বিভাগীয় প্রধানের কাছে প্রেরণ করেন। দুটি ভাগে বিভক্ত করে এটি প্রেরিত হয়। প্রথমভাগে রাজস্ব ও স্থিত ব্যয় বরাদ্দ ধার্য সংক্রান্ত হিসাব থাকে (Revenue and Standing Charges)।

দ্বিতীয় ভাগ আবার দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে সেই সমস্ত বিষয়ের হিসাবগুলি থাকে যেগুলি বিগত বছরগুলি থেকে পরের বছর গুলিতে প্রবাহিত হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যয় বরাদ্দের সম্পূর্ণ নতুন বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট হয়।

স্বাভাবিকভাবে বিগত বা বর্তমান আর্থিক বছরের তুলনায় আগামী আর্থিক বছরের বরাদ্দ সাধারণভাবে বেশী হওয়ার কথা। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আনুমানিক বরাদ্দের দাবি যদি বেশি হয়, সেক্ষেত্রে উপরিউক্ত আবেদন পত্রের 'মন্তব্য' অংশে এর কারণ উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক।

বিভাগীয় প্রধান অধস্তন স্তরগুলি থেকে আগত সমস্ত বরাদ্দের দাবিগুলি একত্রে পর্যালোচনা করেন। বিভাগ আগামী আর্থিক বছরে সম্ভাব্য কত পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ পেতে পারে তার ভিত্তিতে নতুন প্রস্তাবগুলিকে পরীক্ষা করা হয় এবং বহু প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

এইভাবে প্রস্তুত ব্যয় বরাদ্দের দাবি, কোন একটি মন্ত্রী দপ্তরের অধীনস্থ সমস্ত বিভাগ, নির্দিষ্ট সচিবালয়ে প্রেরণ করে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদপ্তর তার গৃহীত নীতির ভিত্তিতে, প্রেরিত বরাদ্দের হিসাব পুনরায় পর্যালোচনা করে এবং শেষ পর্যন্ত তা অর্থমন্ত্রকের বাজেট বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সাধারণত নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে এই কাজ সম্পাদিত হয়।

৫.৬.২ অর্থ দপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ

অতঃপর বাজেট বিভাগ পর্যালোচনার কাজ শুরু করে, যে মূল্যায়নের চরিত্র স্বভাবতই অন্যান্য মন্ত্রীদপ্তরগুলির মত নয়। কোন একটি মন্ত্রীদপ্তর তার নিজস্ব যে নীতির ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ দাবি করে, সাধারণত সেই নীতিটি প্রত্যক্ষভাবে বাজেট বিভাগের তথা অর্থমন্ত্রকের বিবেচ্য নয়। এক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক অবস্থা ও গতিপ্রকৃতির চরিত্র অনুধাবন এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন দপ্তরের বাজেট বরাদ্দের বিষয়টি অনুধাবন। এক্ষেত্রে সরকার তথা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল তথা প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী বস্তুত মূল ভূমিকা পালন করেন। মোট কত পরিমাণ রাজস্ব সংগৃহীত হতে পারে সেই বিষয়টিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচ্য।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বিভিন্ন গৃহীত নীতির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রণালয় বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করতে চায় না; এক্ষেত্রে তার ভূমিকা একজন "Intelligent Layman" - এর মত যে পারস্পরিক তুলনামূলক সমালোচনার একটি ঐতিহ্য তৈরি করেছে। যে জাতীয় প্রশ্ন এক্ষেত্রে বাজেট বিভাগকে পেশ করতে হয় তা নিম্নরূপ –

(১) প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দের দাবি কি যথার্থই প্রয়োজনীয়? যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে —

(২) উক্ত প্রস্তাবিত ব্যবস্থাটি ব্যতিরেকে মস্ত্রক কাজ করল কি ভাবে?

(৩) এখনই বা তা প্রয়োজন হচ্ছে কেন?

(৪) একই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রী দপ্তরগুলি কিভাবে কাজ করছে?

(৫) প্রস্তাবিত বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মূলত কোন সূত্র থেকে আসবে?

(৬) একটি দপ্তরের বরাদ্দ বৃদ্ধি অন্য দপ্তরের বরাদ্দ হ্রাসের কারণ হবে কিনা?

(৭) সেক্ষেত্রে কোন দপ্তর এই অসুবিধার সম্মুখীন হবে?

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, নিয়মানুযায়ী যে কোন মন্ত্রীদপ্তরের যে কোন নতুন প্রস্তাব অথবা ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি বাজেটে উল্লেখ করতে গেলে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতা মূলক। অতএব মূলত এসব ক্ষেত্রেই উপরিউক্ত বিস্তৃত নিরীক্ষণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

এই রকম হতে পারে, যে অর্থমন্ত্রক কোন প্রস্তাব অনুমোদন করেনি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর তা মেনে নিতে রাজি নয়। সেক্ষেত্রে বিষয়টি ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরিত হবে। তবে ক্যাবিনেট মূলত অর্থমন্ত্রকের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করে না। সমস্ত বিচার বিবেচনার পর অর্থমন্ত্রক প্রত্যেকটি মন্ত্রীদপ্তরের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থমঞ্জুরির দাবি করেন।

যে প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল অন্য বিভাগের প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রককে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কেন? এক্ষেত্রে দুটি যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে।

প্রথমত, অর্থমন্ত্রক নিজে বস্তুত অর্থ ব্যয় করছে না এবং সেই অর্থে করদাতাদের স্বার্থরক্ষা করার স্বার্থহীন প্রতিভূ হিসাবে তাকে কাজ করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ কোন সূত্র থেকে মেটান হবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মূল দায়িত্ব অর্থমন্ত্রকের। অতএব বরাদ্দ কতটা গ্রাহ্য হবে সে সম্বন্ধে দায়িত্বও এই মন্ত্রককে নিতে হয়। ব্যাপারটা অনেকটা একইরকম যে জলাধার পূর্ণ করার দায়িত্ব অর্থমন্ত্রীকে নিতে হলে কতটা জল ছাড়া হবে সেই অধিকারও তাঁকে দিতে হয়।

৫.৬.৩ অর্থমন্ত্রকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ

নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকাটির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে। সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার চরিত্র নিরপেক্ষভাবেই এই সমস্ত সমালোচনার সম্মুখীন অর্থদপ্তরকে হতে হয়। তবে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আপনারা দেখবেন যে এই অভিযোগগুলির সারবত্তা খুব একটা যুক্তি সঙ্গত নয়।

প্রথমত, যতদিন পর্যন্ত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কম কর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা তথা Laissez faire নীতি অনুসরণ করেছে ততদিন পর্যন্ত বাজেট ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার কম চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে রাজনৈতিক চরিত্র নিরপেক্ষভাবে প্রায় সমস্ত রাষ্ট্র জনকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে ব্যয়-বরাদ্দের উপর রাষ্ট্রীয় তথা অর্থবিভাগের নিয়ন্ত্রণ জরুরি বলে মনে হতে থাকে। বলা হয়, এতে অবাধ স্বাধীনতা ও মুক্ত আর্থিক প্রতিযোগিতা ব্যাহত হয়েছে। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে প্রগতিশীল ব্যয় বরাদ্দের কোন নতুন দাবি না-ও মানা হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বিভাগের প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ পরীক্ষা করার চূড়ান্ত যোগ্যতার প্রশ্নটি এখন ক্রমশ

সামনে আসছে। কারণ সময় অত্যন্ত কম, বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রশ্নযুক্ত এবং যাঁরা পরীক্ষা করছেন তাঁরা নিছক আমলা ছাড়া আর কিছুই নন। এখানে দায়িত্বপূর্ণ দায়বদ্ধতা অপেক্ষা দ্রুত দায়িত্ব পালন করা জরুরি হয়ে দেখা দেয়। এক্ষেত্রে জন প্রশাসন বিজ্ঞানীদের একটি অংশ এই অভিযোগ করেন যে কম পরিমাণ অর্থযুক্ত আছে এই জাতীয় বরাদ্দের দাবিগুলি বাতিল করার সাধারণ নীতি অর্থদপ্তর অনুসরণ করে;কিন্তু বিপুল আর্থিক বরাদ্দের প্রশ্ন জড়িত আছে এই জাতীয় কোন নতুন প্রস্তাব প্রায়শই গৃহীত হয়।

তৃতীয়ত, বলা হয়ে থাকে একটি বিভাগ অপর বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে, -- ব্যবস্থা হিসাবে এটি গণতন্ত্র সম্মত নয়। যদি তা করতেই হয় সেক্ষেত্রে বিভাগগত অস্তিত্বের উর্দ্ধে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন এমন কোন প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা থাকা দরকার যে এই কাজটি করবে।

চতুর্থতঃ, কোন প্রস্তাব আগামী আর্থিক বাজেটের জন্য বাতিল হওয়ার অর্থ কখনই এটি নয় যে তা স্থায়ীভাবে বাতিল হল। ফলত যদি কখনও তা গৃহীত হয়, তখন হয়ত তার উপযোগিতা তত বেশী থাকে না অথবা দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশি বেড়ে যায়।

পঞ্চমত, আর একটি বিষয় প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য। বিভিন্ন মন্ত্রীদপ্তর যেহেতু জানে যে তাদের দ্বারা প্রদত্ত বরাদ্দের দাবি অর্থমন্ত্রক কর্তৃক প্রায় অপরিহার্যভাবে কমিয়ে দেওয়া হবে, সেইহেতু ইচ্ছাকৃতভাবে বরাদ্দ বাড়িয়ে দেখানো হয়, কার্যক্ষেত্রে যার কোন উপযোগিতা নেই। এক্ষেত্রে অনুৎপাদনমূলক ব্যয় বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫.৭ বাজেট গ্রহণ পরবর্তী অর্থমন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা

আমরা এতক্ষণ বাজেট প্রস্তুতীকরণের বিষয়টি পর্যালোচনা করছিলাম।

৬ নং এককে আইনসভায় বাজেট কিভাবে গৃহীত হয় তা আমরা আলোচনা করব।

এই মুহূর্তে যদি আপনি ধরে নেন যে আইনসভায় বাজেট গৃহীত হয়েছে সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় গ্রহণ পরবর্তী শাসন বিভাগের ভূমিকা কি রকম? এখানে সেই বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করে নিলে ৫ নং এককের বিশ্লেষণ সমাপ্ত হতে পারে।

বাজেট গ্রহণ পরবর্তী অর্থমন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ আইনগত ব্যবস্থাপনা অপেক্ষা অনেক দৃঢ়ভাবে প্রশাসনিক প্রথার উপরে গড়ে উঠেছে। স্বাভাবিক প্রাত্যহিক প্রশাসনিক ব্যয়গুলি এখানে মূলত নিয়ন্ত্রণের বিষয় নয়।

ব্যাপারটি বোঝা যাবে যদি আমরা ১৯৫৩-৫৪ সালের আনুমানিক ব্যয় নির্বাহ কমিটির (Estimates Committee) নবম প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করি। এত পুরাতন উদাহরণ এই কারণে দেওয়া হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় আর্থিক প্রশাসনের ধারাবাহিক চিত্রটি বোঝা যাবে।

এই প্রতিবেদন অনুযায়ী নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব সম্বলিত বাজেট বরাদ্দের দাবি বাজেট বিভাগে এত দেরি করে আসে যে অনেকক্ষেত্রে তার যথোপযুক্ত পরীক্ষা ব্যতিরেকেই আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হওয়ার জন্য পেশ করা হয়। নবম প্রতিবেদনের নিজের ভাষায় "The system is that whatever has been included in the estimates is merely with a view to get the vote of the house thereon and does not entitle the administrative ministry to incur expenditure unless a detailed expenditure

sanction has been issued by the "Ministry of Finance"।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে এই জাতীয় অবস্থা উপযোগী হতে পারে যেহেতু তা মূলত আইন শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনার উপরই গুরত্ব দেয়। স্বাধীনোত্তর পর্বে যেখানে জনকল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্রের কাজের পরিধি বেড়েছে সেখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীভবন প্রয়োজন। বিভিন্ন মন্ত্রীদপ্তরগুলিকে অর্থনৈতিক অধিকার অধিকাধিক দেওয়ার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে " Delegation of Powers, Rules, 1959" প্রবর্তন করেন।

এর মাধ্যমে ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্রে অন্তর্নিহিত কেন্দ্রীকতার প্রবণতায়, বিশেষত অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের প্রবণতার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে বলা যাবে না। তবে এর পর বর্তমানে প্রত্যেক মন্ত্রীদপ্তরে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত শাখা (Financial Branch) থাকে যেখানে একজন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং কয়েকজন সহকারী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা থাকেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ প্রণয়ন, অর্থমন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ, ব্যয় ও বরাদ্দের সমানুপাতিক হার রক্ষা – ইত্যাদি এই শাখার অন্যতম কাজ। দপ্তরের সচিবের অধীনে এই উপদেষ্টাগণ কাজ করেন।

১৯৬১ ও ১৯৭৬ সালের আরো দুটি কেন্দ্রীয় সরকারি আদেশবলে অর্থদপ্তর ও অন্যান্য মন্ত্রীদপ্তরগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, বিভিন্ন পদ্ধতির প্রবর্তনের মাধ্যমে অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রশাসনিক এই সংস্কার কর্মসূচীসমূহ বিস্তৃতভাবে জানার কৌতূহল মেটানোর জন্য আলোচনার শেষে উল্লেখিত পুস্তকগুলি পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। এক্ষেত্রে আপনি কিভাবে অগ্রসর হবেন তার কয়েকটি সূত্র আমরা প্রদান করতে পারি :

(১) অর্থমন্ত্রককে এটি লক্ষ্য রাখতে হয় বরাদ্দ এমন যেন না হয় যা মন্ত্রক খরচ করতে পারবে না;

(২) নতুন আর্থিক বছরে বরাদ্দকৃত অর্থব্যয় করতে না পারলে তা ফেরৎ নেওয়ার ব্যবস্থা করা;

(৩) নতুন আর্থিক বছরে নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই খোঁজ নেওয়া যে বরাদ্দ ঠিকমত ব্যয়িত হচ্ছে কিনা অথবা প্রয়োজনে এক্ষেত্রে সারধান করে দেওয়া;

(৪) রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কর্মপ্রণালীকে তদারকি করা;

(৫) বিভিন্ন মন্ত্রককে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান।

৫.৮ অনুশীলনী - ২

প্রশ্ন - (১) বাজেট প্রস্তুতিকরণ পদ্ধতিটি আলোচনা করুন। এক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রক কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের চরিত্রটি পর্যালোচনা করুন।

প্রশ্ন - (২) বাজেট গ্রহণ পরবর্তী অর্থমন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা আলোচনা করুন।

৫.৯ সারসংক্ষেপ

আমরা এতক্ষণ মূলত ভারতবর্ষে বাজেট প্রণয়ন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। বাজেট প্রণয়ন শাসন বিভাগের কাজ।

সেই জন্য কোন একটি দেশে এবং বিশেষত ভারতবর্ষে আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর শাসনবিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে অর্থমন্ত্রণালয়। এই জন্য ভারতবর্ষে অর্থমন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো আমরা আলোচনা করেছি।

অর্থমন্ত্রকের আনুষ্ঠানিক নির্দেশে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তাদের আগামী বছরের সম্ভাব্য বরাদ্দের হিসাব প্রস্তুত করে এবং অর্থমন্ত্রণালয়ের বাজেট বিভাগের কাছে তা প্রেরিত হয়। যথোপযুক্ত বিশ্লেষণের পরে তা আইনসভার অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়।

বাজেট আইনসভায় অনুমোদিত হলে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রক গুরুত্বপূর্ণ তদারকির ক্ষমতা ভোগ করে। এর যেমন উপযোগিতা আছে, তেমনি বিভিন্ন দিক থেকে তা সমালোচিত-ও হয়ে থাকে। অবশ্য অর্থমন্ত্রকের এই অধিক গুরুত্বকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কিছুটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়। অবশ্য বাস্তবে এর উপযোগিতা কতটা আছে তা সন্দেহের বিষয়।

৫.১০ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

প্রশ্ন - (১) বাজেট প্রণয়ন তথা প্রস্তুতিকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে শাসনবিভাগ যেভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা আলোচনা করুন। এক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রক কি কোন বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে?

প্রশ্ন - (২) বাজেট আইনসভায় পেশ করার পূর্বে যেভাবে প্রস্তুত করা হয় তা পর্যালোচনা করুন। এক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রক যে গুরুত্ব পেয়ে থাকে তা কিভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

(ক) ভারতীয় আর্থিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা হিসাব পরীক্ষকের ভূমিকা কি?

(খ) ভারতের আর্থিক প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগুলি কি কি?

(গ) ১৯৪৯ থেকে অর্থমন্ত্রককে যে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেগুলির নাম কি?

৫.১১ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী -১

প্রশ্ন - ১ উত্তর - ৫.৩

প্রশ্ন - ২ উত্তর - ৫.৪ থেকে ৫.৪.৪

অনুশীলনী - ২

প্রশ্ন - ১ উত্তর - ৫.৬ থেকে ৫.৬.২

প্রশ্ন - ২ উত্তর - ৫.৭

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

প্রশ্ন - ১ উত্তর - ৫.৩, ৫.৪ এর অংশ বিশেষ, ৫.৭

প্রশ্ন - ২ উত্তর - ৫.৬ থেকে ৫.৬.৩

প্রশ্ন - ৩ (ক) ৫.২ এর শেষ দিকে দেখুন।

(খ) ৫.৩ এর প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন।

(গ) ৫.৪.১ এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে উত্তর দেখুন।

৫.১২ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

1. Public Administration —
   A. Avasthi and S. Maheshwari, L. N. Agarwal Educational Publishers. Agra-3
2. Financial Administration in India —
   M.J.K. Thavaraj — Sultan Chand and Sons. Delhi.
3. Development Administration of India —
   V. A. Pamadikar, Macmillan.
4. Report of Study Team of Financial Administration, Administrative Reform Commission, Govt. of India, 1968.

একক ৬ ❑ বাজেট গ্রহণ

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য
৬.২ প্রস্তাবনা
৬.৩ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
৬.৪ বিভিন্ন পর্যায় সমূহ
৬.৪.১ সংসদে বাজেট পেশ
৬.৪.২ আলোচনা
৬.৪.৩ ভোটগ্রহণ
৬.৪.৪ বিনিয়োগ আইন
৬.৪.৫ রাজস্ব বিল (**Finance Bill**)
৬.৫ জরুরিকালীন ব্যবস্থা
৬.৬ সারাংশ
৬.৭ অনুশীলনী
৬.৮ উত্তর সংকেত
৬.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারবেন ঃ

- আর্থিক প্রশাসন বিজ্ঞানে আইনসভায় বাজেট গ্রহণ পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনার গুরুত্ব
- বাজেট গ্রহণ সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে জ্ঞাতব্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- সংসদে বাজেট গ্রহণের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়
- জরুরিকালীন আয় ব্যয় পদ্ধতি

৬.২ প্রস্তাবনা

পর্যায় ২২ -এর একক ৫ -এ আপনারা বাজেট প্রস্তাব প্রস্তুতি পর্ব সম্বন্ধে জেনেছেন। এখানে শাসন বিভাগীয় কর্মকাণ্ড আলোচনা করতে গিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিশেষীকৃত গুরুত্ব আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি।

একক ৫-এর আলোচনার শেষের দিকে বাজেট গ্রহণ পরবর্তী ক্ষেত্রে আইনসিদ্ধ বাজেট প্রস্তাব কিভাবে বাস্তবায়িত হয় তার সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত আমরা দিয়েছি এবং তার পূর্বেই আমরা বলেছিলাম যে পর্যায় - ২২এ বাজেট গ্রহণ পদ্ধতি বর্ণিত হবে।

বাজেট গ্রহণ পদ্ধতির সঙ্গে যদিও মূলত আইনসভা সংশ্লিষ্ট থাকে, তবুও আর্থিক প্রশাসনের এই বিষয়টি আলোচনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। প্রথমত, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের ভিত্তিতে বাজেট প্রস্তাব আইনসভায় পেশ করা যায় এবং আমরা জানি রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন আনুষ্ঠানিকভাবে শাসন বিভাগেরও প্রধান।

দ্বিতীয়ত, সমস্ত বিভাগের বিভাগীয় বাজেট বরাদ্দ রাষ্ট্রপতির ব্যয় করার অধিকার -- এই অর্থে অনুমোদিত হয়।

তৃতীয়ত, বিনিয়োগ বিল (Appropriation Bill) , রাজস্ব বিল (Finance Bill) এবং বাজেট তথা বাৎসরিক আর্থিক প্রতিবেদনের (Annual Financial Statement) ক্ষেত্রেও এই বক্তব্য সত্য। এই বিষয়গুলি যথাসময়ে আলোচনা করা হবে।

চতুর্থত, ব্যয় কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, নতুন কর আরোপ এবং হ্রাস করার প্রস্তাব মেনে নেওয়া -- সমস্ত কিছুই মূলত রাজনৈতিক শাসনবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, যা আইনসভা মেনে চলতে বাধ্য থাকে মাত্র।

পঞ্চমত, রাজনৈতিক শাসন বিভাগীয় প্রধান হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর, বিভাগীয় বাজেট ব্যাপারে প্রযুক্ত যুক্তির গুণগত মান, মূলত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অ-রাজনৈতিক শাসনবিভাগের সামগ্রিক সিদ্ধান্ত ও কর্মতৎপরতার উপর নির্ভর করে।

ষষ্ঠত, যতক্ষণ না পর্যন্ত আইনসঙ্গতভাবে গৃহীত হচ্ছে, বাজেট অধিবেশন চলাকালে সমস্ত বিভাগগুলি আন্তপ্রশাসনিক সম্পর্ককে জরুরিকালীন ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট সংশ্লেষের (Co-ordination) মধ্যে আবদ্ধ রাখা অর্থমন্ত্রণালয়ের অন্যতম কাজ।

সপ্তমত, বিনিয়োগ বিল ও রাজস্ব বিল উভয়কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হওয়া বাধ্যতামূলক, যার পরেই তা আইনে পরিণত হয় মাত্র।

৬.৩ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

বাজেট গ্রহণের পদ্ধতিগত বিষয়টি সংবিধানের ১১২ থেকে ১১৭ নং ধারার মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এক্ষেত্রে মূল বক্তব্য নিম্নরূপ যা আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করব।

১। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতিরেকে ব্যয় বরাদ্দের কোন দাবি জানানো যাবে না।

২। সংসদ প্রস্তাবিত কর বাড়াতে পারে না, যদিও কমানোর বা বাতিলের প্রস্তাব দিতে পারে।

৩। ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় সংসদের অনুমোদনের ওপর নির্ভর করে না, যদিও তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

৪। সংসদ বিনিয়োগ বিল সংশোধন করতে পারে না।

৫। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাজ্য সভার ক্ষমতা সীমিত। ব্যয় অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে লোকসভার এক্তিয়ারভুক্ত। রাজস্ব বিলের ক্ষেত্রে এর ক্ষমতা খুবই সীমিত। শুধুমাত্র ১৯৭৭ সালে রাজ্যসভা রাজস্ব বিলে কিছু সংশোধনী এনেছিল, যা লোকসভা কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য হয়।

বিভিন্ন সূত্র থেকে আগত সমস্ত রাজস্ব, আয় ও সংগৃহীত সমস্ত ধরনের ঋণ একটি নির্দিষ্ট তহবিলে সঞ্চিত

হয় "যা ভারতের সঞ্চিত তহবিল।"

বাজেট বর্ণিত সমস্ত ব্যয় বস্তুত একটি নির্দিষ্ট তহবিল থেকে করা হয়। এটি ভারতের সঞ্চিত তহবিল। এক্ষেত্রে আবার দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ্য।

(ক) ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে ব্যয় (Expenditure made from the Consolidated Fund of India) (১১২ নং (২) ধারা)

(খ) ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় (Expenditure charged upon the Consolidated Fund of India) (১১২ নং (৩) ধারা)

প্রথম শ্রেণীভুক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আইনসভার অনুমোদন অপরিহার্য। মূলত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি বাদ দিলে বিভিন্ন বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ এখান থেকে আসে।

কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে আইন সভার অনুমোদন অপ্রয়োজনীয়। অবশ্য উভয় কক্ষই এই ব্যয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে (১১৩ নং (১) ধারা)। রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা, লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ অথবা রাজ্যসভার সভাপতি ও সহসভাপতির বেতন ও ভাতা, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ও ভারতের ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের বেতন, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন ও জাতীয় ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয়—ইত্যাদি এর উদাহরণ। এই নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের জন্য ব্যয় সংসদের অনুমোদনের বাইরে রাখার অর্থ হচ্ছে তাঁদের স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করা এবং তাঁরা যাতে দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে থাকেন তার ব্যবস্থা করা।

৬.৪ বিভিন্ন পর্যায় সমূহ

সংসদে বাজেট নিম্নলিখিত পাঁচটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।

৬.৪.১/ সংসদে বাজেট পেশ

৬.৪.২/ এর উপর সাধারণ আলোচনা

৬.৪.৩/ বিভিন্ন বিভাগের বরাদ্দ অনুমোদনের জন্য ভোট গ্রহণ

৬.৪.৪/ বিনিয়োগ বিল (Appropriation Bill)

৬.৪.৫/ রাজস্ব বিল অনুমোদন (Finance Bill)

৬.৪.১ সংসদে বাজেট পেশ

লোকসভায় ফেব্রুয়ারি মাসের কোন একদিন অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেন। এরপর একটি বক্তৃতা তাঁকে দিতে হয় যা 'বাজেট ভাষণ' নামে অভিহিত। লোকসভায় বাজেট ভাষণ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি রাজ্যসভায় বাজেটটি পেশ করেন। বাজেট ভাষণে বিগত বছরের আর্থিক কাজকর্মের গতিপ্রকৃতি, আগামী বছরে রাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে সরকার কোন নির্দিষ্ট গতির অভিমুখে নিয়ে যেতে চায়—মূলত এই দুটি বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে। স্বভাবতই কোন একটি নির্দিষ্ট সরকারের রাজনৈতিক নীতির বাস্তবায়নের অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে আগামী আর্থিক বছরের বাজেট নীতি প্রণীত হয়।

৬.৪.২ আলোচনা

বাজেট পেশ করার পরেই আলোচনা শুরু হয় না এবং কয়েকদিন পরে সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। উভয়কক্ষেই এই সাধারণ আলোচনা চলে। ব্যক্ত সরকারী নীতি ও বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের সমালোচনা মূলত এই পর্বে হয়ে থাকে। বিস্তৃত রাজস্ব সংক্রান্ত খুঁটিনাটি আলোচনা, ছাঁটাই প্রস্তাব অথবা ভোট গ্রহণ এই পর্বে হয় না। সাধারণত দু-তিন-দিন এই আলোচনা চলে যার পরে অর্থমন্ত্রীকে জবাবী ভাষণ দিতে হয়। স্বাধীনতাপূর্ব আইনসভায় সাধারণ আলোচনা প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল, যখন বাজেট প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার ক্ষমতা সদস্যদের ছিল না।

৬.৪.৩ ভোট গ্রহণ

তৃতীয় স্তরে প্রত্যেকটি বিভাগের বরাদ্দকৃত ব্যয়ের স্বপক্ষে ভোট গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় মন্ত্রী এই দাবি উত্থাপন করে থাকেন। এক্ষেত্রে ভোট প্রদানের অধিকার শুধুমাত্র লোকসভার সদস্যদেরই আছে। লোকসভার স্পীকার আলোচনার দিন ও সময় ঠিক করেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, "সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়" ভোট প্রদানের আওতার বাইরে থাকে।

এই পর্যায়টিই হচ্ছে বিস্তৃত আলোচনার পর্যায় যেখানে ছাঁটাই প্রস্তাব আনার সুযোগ থাকে। এটি তিন ধরনের হতে পারে—

(ক) ব্যয় সংক্ষেপ সম্পর্কিত ছাঁটাই প্রস্তাব— সরকারের কোন ব্যয়ের দাবি মাত্রাতিরিক্ত মনে করলে লোকসভা তা কমানোর জন্য ব্যয় সংক্ষেপ সংক্রান্ত প্রস্তাব আনতে পারে।

(খ) নীতি অনুমোদন সম্পর্কিত ছাঁটাই প্রস্তাব— কোন বিশেষ দাবিকে নীতিগতভাবে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে বিরোধী পক্ষ ব্যয়ের দাবিকে নামমাত্র অঙ্কে নামিয়ে আনার কথা বলতে পারে (যেমন ১ টাকা)। ব্যয় মঞ্জুরির প্রস্তাবকে অস্বীকার করার জন্য এইরকম করা হয়।

(গ) প্রতীক ছাঁটাই প্রস্তাব— সরকারের কোন নির্দিষ্ট খাতে দাবির অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট খাতে যে অর্থ দাবি করা হয়, তার সামান্য কিছু অংশ হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়।

উত্থাপিত ছাঁটাই প্রস্তাবের পর প্রস্তাবটির সপক্ষে ভোটগ্রহণ করতে হয়। আইনত, ছাঁটাই প্রস্তাব গৃহীত হলে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকে। সরকারের পশ্চাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন থাকায় ছাঁটাই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার প্রশ্ন আসে না। তবুও বিভাগগুলির কাজকর্মের ত্রুটির দিকগুলি পাদপ্রদীপে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

সাধারণত ছাব্বিশ দিন সময় বরাদ্দ থাকে সমস্ত দাবিগুলি ভোটের মাধ্যমে গ্রহণ করার জন্য। অধ্যক্ষ প্রত্যেকটি ব্যয় বরাদ্দের জন্য পৃথক সময় নির্দেশ করেন। মন্ত্রী জবাবী ভাষণ দেন; এরপর তা ভোটে দেওয়া হয় ও গৃহীত হয়। কিন্তু শৃঙ্খলার সঙ্গে এই সময় রক্ষা করা কখনো সম্ভব হয় না। তার ফলে নির্দিষ্ট সময়ের শেষ দিনে বহু সংখ্যক ব্যয় বরাদ্দের দাবি কোন রকম আলোচনা না করেই ভোট গ্রহণের জন্য পেশ করা হয়। একে

"গিলোটিন" বলে। কোন একটি ব্যয় বরাদ্দের দাবি ভোটে গৃহীত হলে তা আইনসঙ্গত ব্যয় বরাদ্দ (Grant) বলে গৃহীত হয়।

ফলত আইনসভার নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের ধারণাটি নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। হিলটন ইয়ং তাঁর "System of National Finance" গ্রন্থে বলেছেন, "এক তৃতীয়াংশ থেকে প্রায় অর্ধেক ব্যয় বরাদ্দের দাবি একঘন্টা অথবা এই সময়ের মধ্যে গৃহীত হয়ে যায়; এক্ষেত্রে কোন বিতর্ক বা সমালোচনার সুযোগ থাকে না। ফলত সংসদীয় নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি নিছক প্রহসনে পরিণত হয়েছে।"

তবে গণ-অনুদান (Vote on account) পদ্ধতির উদ্ভবের জন্য ব্যয় বরাদ্দের দাবি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ হয়েছে। ১লা এপ্রিল থেকে যে নতুন আর্থিক বছরের শুরু হয় তখনও বিভিন্ন ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা চলতে পারে। এর ফলে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবি গ্রহণ তথা বাজেট পাস ও 'বিনিয়োগ আইন' গ্রহণের কাজ শেষ হয় না। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যয় কিভাবে নির্বাহ হবে তার ব্যবস্থা সংবিধানের ১১৬ (১) নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। গণ-অনুদান হচ্ছে দাবির একটি অংশ ব্যয় করার জন্য বিধিবদ্ধকরণ যার পরিণতি হিসাবে আগামী আর্থিক বছরে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকার অসুবিধার সম্মুখীন হয় না। আর্থিক বছরের শুরুতে বিধানসভা বা লোকসভার নির্বাচন পূর্ব নির্দ্ধারিত থাকলে পূর্ব সরকারের পক্ষে গণ-অনুদান ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি থাকে না। ২০০১ সালের বাজেটের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে। এই গণ-অনুদানকে বৈধ করার জন্য "বিনিয়োগ (গণ-অনুদান) আইন "{Appropriation (Votes on Account) Act}" গ্রহণ করতে হয়।

৬.৪.৪ বিনিয়োগ আইন (Appropriation Act)

বিভাগীয় ব্যয় বরাদ্দের দাবিগুলি ভোটে গৃহীত হওয়ার পর বরাদ্দকৃত অর্থ "ভারতের সঞ্চিত তহবিল" থেকে গ্রহণ করার প্রশ্ন আসে। বিনিয়োগ আইনের মাধ্যমে সরকার এই অধিকার পায়।

আমরা ৬.৩ এককে দেখেছি "ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে ব্যয়" (Expenditure made from the consolidated Fund of India) ভোটযোগ্য; কিন্তু "ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়" (Expenditure charged upon the Consolidated Fund of India) ভোটযোগ্য নয়।

কিন্তু উভয় ব্যয়ই "সঞ্চিত তহবিল" থেকে করা হয় এবং ১১৪(৩) ও ২৬৬(৩) ধারানুযায়ী পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া এই তহবিল থেকে অর্থ তোলা যায় না। অতএব এই উদ্দেশ্যে সংসদ যে আইন প্রণয়ন করে তাকে "বিনিয়োগ আইন" বলে। এটি একটি অর্থ বিল যা শুধুমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপিত হতে পারে। অন্য যে কোন বিল যে পদ্ধতির মধ্য দিয়ে গৃহীত হয় "বিনিয়োগ বিল" সেই পদ্ধতির মধ্য দিয়েই আইনে পরিণত হয়।

আমরা ইতিপূর্বে একক-১ এ উল্লেখ করেছিলাম যে রেল বাজেট সাধারণ বাজেটের পূর্বে লোকসভায় পেশ করা হয়। এটি বস্তুত একটি বিভাগীয় ব্যয়-বরাদ্দের দাবি, যা অন্যান্য বিভাগীয় ব্যয়-বরাদ্দের মতই ভোটে গৃহীত। কিন্তু সমস্ত ব্যয় সঞ্চিত তহবিল থেকে করা আবশ্যক বলে বিনিয়োগ বিলের মধ্যে রেল বাজেটও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এই বিল নিয়ে আলোচনা কালে যে সমস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যায় না সেগুলি হল— (১) কোন

সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় না;(২) ইতিমধ্যে মঞ্জুরিকৃত ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তনের প্রস্তাব আনা যায় না।

এই নিয়মাবলীর কারণ হল ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ যেহেতু পূর্বেই লোকসভাতে আলোচনা ও ভোটের ভিত্তিতে আইনসঙ্গতভাবে গৃহীত হয়েছে, সেইহেতু তা পরিবর্তন করার প্রচেষ্টার অর্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করা। এছাড়াও আমরা পূর্বেই জেনেছি যে সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় কখনই ভোটযোগ্য নয়, যদিও বিনিয়োগ বিলের মাধ্যমে তার ব্যয়ও অনুমোদন যোগ্য।

এছাড়াও ৬.৪.৩ এককের সবশেষে 'বিনিয়োগ বিল' যথাসময়ে গৃহীত না হলে "Vote on Account" তথা 'গণ অনুদানের' প্রসঙ্গ আমরা উল্লেখ করেছিলাম এই ব্যাপারটির প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চয়ই আপনাদের এখন বোধগম্য হচ্ছে।

বিনিয়োগ বিল সংশোধন বা পরিবর্তনযোগ্য না হলেও এর প্রাসঙ্গিকতা এখানেই যে এটি আলোচনা ও সমালোচনার আর একটি নতুন অবকাশ তৈরি করে, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে একটি অতিরিক্ত নিরাপত্তা বলয়।

লোকসভায় গৃহীত হবার পর বিলটি রাজ্যসভায় পাঠানো হয়। কিন্তু অর্থ বিল বলে রাজ্যসভা তা পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে না। মতামত সহ চোদ্দ দিনের মধ্যে তা লোকসভায় প্রেরিত হয়। এই মতামত লোকসভা গ্রহণ করতে পারে অথবা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে পারে। এরপর রাষ্ট্রপতির আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষরের জন্য তা প্রেরিত হয়।

৬.৪.৫ রাজস্ব বিল (Finance Bill)

ব্যয়ের দাবি অনুমোদনের ভিত্তিতে বাজেট পদ্ধতি শেষ হয়ে যায় না। অনুমোদিত অর্থের যোগানের আইন সঙ্গত ব্যবস্থা করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংবিধানের ২৬৫ নং ধারানুযায়ী আইনের অনুমোদন ছাড়া কোন কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যায় না। অতএব এর সপক্ষেও আইন প্রণয়ন করা সংসদের কাজ।

সরকারের সমস্ত কর সংক্রান্ত প্রস্তাব যে বিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় তাই "রাজস্ব বিল"। কোন কর বৃদ্ধি অথবা নতুন কোন কর আরোপের প্রস্তাব মূলক সংশোধন রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া করা যায় না। আবার রাজস্ব বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়া পেশও করা যায় না।

বিনিয়োগ বিলের বিপরীতক্রমে রাজস্ব বিলে সংশোধনী আনা যায়, এই সংশোধনী কর প্রস্তাব কমানো বা বাতিল করা রূপে আসতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও সরকার অনেক সময় সদিচ্ছা ও রাজনৈতিক কারণে এই প্রস্তাব মেনে নেয়। এই অর্থে রাজস্ব বিলের ব্যাপারে সংসদ অধিকাধিক স্বাধীনতা ভোগ করে বলা যায়।

লোকসভায় গৃহীত হওয়ার পর তা রাজ্যসভায় প্রেরিত হয় এবং রাজ্যসভা সুপারিশ সহ চোদ্দ দিনের মধ্যে তা ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকে। লোকসভা এই সুপারিশ মানতে পারে অথবা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে পারে। এরপর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের ভিত্তিতে তা আইনে পরিণত হয়।

তবে রাজস্ব আইন গৃহীত হওয়ার পর তা বাস্তবায়িত হতে বহু সময় লাগতে পারে। সেই জন্য বাজেট পেশ হওয়ার পর "সাময়িক কর সংগ্রহ আইন" (Provisional Collecting of Taxes Act) সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। এর ফলে ব্যয়ের জন্য তাৎক্ষণিক আয়ের সংস্থান করা অথবা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ক্ষতি বন্ধ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে কিছু কিছু কর আছে যা কেন্দ্রীয় সরকার আরোপ করে ও সংগ্রহ করে, কিন্তু যা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বন্টিত হতে পারে;কিছু কর আছে যা কেন্দ্রীয় সরকার আরোপ করে, কিন্তু রাজ্য সরকার সংগ্রহ ও ব্যবহার করে; কিছু কর আছে যা আরোপিত ও সংগৃহীত হয় কেন্দ্রের দ্বারা, কিন্তু যা রাজ্যকে প্রদান করা হয়।

৬.৫ জরুরিকালীন ব্যবস্থা

প্রথাসিদ্ধভাবে বাজেটের মধ্যেই আয় ও ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার কথা। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জরুরি কালীন পরিস্থিতিতে তা সম্ভব নাও হতে পারে। এর ফলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ—

১। গণ অনুদান (Vote on Account)— এই ব্যাপারটি ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

২। প্রত্যয়ানুদান (Vote on Credit)

৩। ব্যতিক্রম অনুদান (Exceptional Grant)

৪। অধিক অনুদান (Excess Grant)

৫। প্রতীকী অনুদান (Token Grant)

৬। অতিরিক্ত অনুদান (Supplementary Grant)

এই বিষয়গুলির বিস্তৃত আলোচনা এখানে এই কারণে অপ্রয়োজনীয় যে স্বাভাবিক বাৎসরিক বাজেট প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে এগুলি আসে না। তবুও আলোচনার শেষে উল্লেখিত গন্থগুলি পাঠ করা এক্ষেত্রে খুবই জরুরি।

৬.৬ সারসংক্ষেপ

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসাবে ভারতীয় সংবিধানে অর্থনৈতিক প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়মাবলী সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে। অবশ্য যে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই আর্থিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রয়োগ অসংখ্য প্রথাসিদ্ধ আচরণের জন্ম দেয়।

ভারতেও আইনসভায় বাজেট গ্রহণ পর্বটি আইন ও প্রথার একটি সমষ্টিগত রূপ। বাজেট আইনসভা কর্তৃক অধিগৃহীত করার ব্যবস্থা করা আর্থিক প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গদের অন্যতম কাজ।

সংবিধান কর্তৃক বাজেট গ্রহণ করার পশ্চাতে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়-ব্যয়ের জন্য জনগণের অনুমোদনকে নিশ্চিত করা। অতএব বাজেট পেশ ও যথোপযুক্ত আলোচনার পর প্রত্যেকটি বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের সপক্ষে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। সময়ের অভাব হলে "গিলোটিন" ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হয়।

ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে সাংবিধানিক নিয়ম হচ্ছে বিনিয়োগ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ গ্রহণের বিষয়টি আইনসঙ্গত করা।

বিনিয়োগ আইন যথাসময়ে প্রণীত না হলে গণ অনুদান তথা Vote on Account-এর ব্যবস্থা করা হয়।

বরাদ্দকৃত অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থাও সরকারকে করতে হয়। এর জন্য সংসদ "রাজস্ব আইন" প্রণয়ন করে, যার ফলে সরকার কর সংগ্রহের অধিকারী হয়।

৬.৭ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। সংসদে বাজেট গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ কিভাবে সম্পর্কিত থাকে আলোচনা করুন।

২। ভারতের সঞ্চিত তহবিল সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করুন।

৩। সংসদে বাজেট পেশের পর বিভিন্ন দপ্তরের বরাদ্দের জন্য ভোট গ্রহণ পর্ব পর্যন্ত পর্যায়গুলি আলোচনা করুন।

৪। বিনিয়োগ বিল সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করুন।

৫। রাজস্ব বিল সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) সংসদে বাজেট গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি পর্যায়ের নাম করুন।

(খ) বিনিয়োগ বিল বলতে কি বোঝায় ?

(গ) রাজস্ব বিল বলতে কি বোঝায় ?

৬.৮ উত্তর সংকেত

প্রশ্ন- ১ — একক ৬.২

২ — একক ৬.৩

৩ — একক ৬.৪.১ থেকে ৬.৪.৩

৪ — একক ৬.৪.৪

৫ — একক ৬.৪.৫

৬ — (ক) একক ৬.৪ এর প্রথম দিকে

(খ) একক ৬.৪.৪ এর প্রথম দিকে

(গ) একক ৬.৪.৫ এর প্রথম দিকে

৬.৯ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

1. Public Administration– A. Avasthi and S. Maheshwari– L.N. Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.
2. Public Admisnistration– In theory and practice, M.P. Sharma and B.F. Sadana Kitab Mahal, New Delhi.
3. Parliamentary Financial Control in India– P.K. Wattal, Minerva Book, Simla.
4. Financial Administration in India– M.J.K. Thavaraj Sultan Chand and Sons,Delhi.

একক ৭ ❑ আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য
৭.২ প্রস্তাবনা
৭.৩ আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি
৭.৩.১ কমিটির গঠন
৭.৩.২ কার্যাবলী
৭.৩.৩ কাজের পদ্ধতি
৭.৪ মূল্যায়ন
৭.৪.১ সমস্যাবলী
৭.৪.২ প্রত্যুত্তর
৭.৫ সারাংশ
৭.৬ প্রশ্নাবলী
৭.৭ উত্তর সংকেত
৭.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারবেন—

- কমিটি ব্যবস্থার উপযোগিতা
- আর্থিক কমিটি হিসাবে আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি গঠনের ইতিহাস
- এই কমিটির কার্যাবলী ও কাজের পদ্ধতি
- এই কমিটির কাজের মূল্যায়ন

৭.২ প্রস্তাবনা

পঞ্চম এককে আপনারা বাজেট প্রস্তুতি পর্ব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেছেন।

ষষ্ঠ এককে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীন ভারতবর্ষের আইনসভায় বাজেট গ্রহণ পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনারা জ্ঞাত হয়েছেন। আমরা এও জেনেছি যে অর্থ সংক্রান্ত শাসন বিভাগীয় কর্মকাণ্ড আইনসভার সম্মতির ভিত্তির উপর নির্ভরশীল থাকে। স্বভাবতই জনগণের সম্মতিই হচ্ছে এই ব্যবস্থার পশ্চাদ্‌গত তাত্ত্বিক ভিত্তি।

অতএব আইনসভা যখন বাজেট বরাদ্দের দাবি নিয়ে আলোচনা করছে অথবা ছাঁটাই প্রস্তাব আনছে অথবা তা বিভাগভিত্তিক ভাবে অনুমোদন করছে অথবা এই অনুমোদনের ভিত্তিতে যখন "বিনিয়োগ বিল" তৈরি হচ্ছে অথবা রাজস্ব বিল গ্রহণ পর্বে যখন বিরোধীগণের প্রস্তাবিত কর হ্রাসের প্রস্তাব সরকার কর্তৃক গৃহীত হচ্ছে — তখন এই সমস্তের অর্থই হচ্ছে আর্থিক ব্যবস্থায় জনগণের ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণকে বাস্তবায়িত করা। এইজন্য ভারতবর্ষে বাজেট গ্রহণ পদ্ধতি নিজেই সাংবিধানিক ব্যবস্থার অধীনস্থ একটি ব্যবস্থাপনা। এই সম্বন্ধে সাংবিধানিক ধারাগুলির ব্যাপারেও আপনারা পূর্বের এককে জ্ঞাত হয়েছেন।

কিন্তু এই আইনগত ব্যবস্থাপনার পশ্চাদ্‌গত বাস্তব মূল্য খুব বেশি নয়। এর কারণগুলিও মূলত আমাদের জানা আছে।

১। সমস্ত বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের দাবি ও তার অনুমোদন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করা বাধ্যতামূলক। এর ফলে সমর্থন বা বিরোধিতার প্রশ্নটি আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতায় পরিণত হয়, এবং সদস্যরা বিষয়টি সম্বন্ধে প্রধানত জ্ঞাত থাকেন না।

২। এইজন্য ৬ নং এককে "গিলোটিন" ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা জেনেছি, যেখানে অনেকগুলি বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের দাবি সামগ্রিকভাবে ভোট গ্রহণের জন্য উপস্থাপিত হয়।

৩। অতএব বরাদ্দকৃত অর্থের পশ্চাদ্‌গত উদ্দেশ্য বা বাস্তবে তা উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যয়িত হচ্ছে কিনা তা জানার কোন অবকাশ ও ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত আইনসভার থাকে না।

৪। এই পরিস্থিতিতে কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি মিতব্যয়ী কিনা তা তদারকি করার স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করা সংসদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

৫। সময়ের অভাবই এক্ষেত্রে মূল সমস্যা নয়, অসামর্থ্যের অন্যতম কারণ হল হিসাব পত্রের জটিলতা ও সদস্য সংখ্যার বিশালতা।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষীকৃত সাংগঠনিক ব্যবস্থার দ্বারা অর্থবরাদ্দ ও বরাদ্দ পরবর্তী অবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য বৃটেনের আইনসভায় "কমিটি ব্যবস্থার" উদ্ভব ঘটে। স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী ভারতীয় আইন-সভায় এই ব্যবস্থারই অনুসরণ করা হয়।

ভারতীয় সংসদে এক্ষেত্রে তিনটি কমিটি প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালন করে;* এগুলি হল—

(১) আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি

(২) সরকারি গণিতক কমিটি

(৩) সরকার-অধিগৃহীত সংস্থাসংক্রান্ত কমিটি।

কিন্তু বাস্তবে মূল দায়িত্ব প্রথম দুটি কমিটি সম্পাদন করে এবং আর্থিক প্রশাসনবিদরা এদের আলোচনাতেই প্রধানত নিযুক্ত থাকেন।

৭.৩ আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি (The Estimates Committee)

এটি একটি স্থায়ী কমিটি। বাজেট প্রস্তাবের প্রাথমিক পর্বেই এই কমিটির গুরুত্ব। অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রস্তাব পেশ করার পর বিভাগ ভিত্তিক ভাবে তা আলোচনাকালে কিভাবে ব্যয় সংক্ষেপের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ফল লাভ করা যায় তা

সুপারিশ করা এর কাজ। এই সুপারিশ সেই নির্দিষ্ট বছরের জন্য বা পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ হিসাবে কাজ করে। কমিটির নিজের কাজের ক্ষেত্রেও পূর্ব বছরের সুপারিশ অভিজ্ঞতা হিসাবে কাজ করে।

১৯৩৭ সালে প্রথম এই কমিটি স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়, যা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে ১৯২১ সালে "Standing Finance Committee" গঠিত হয়েছিল যা অর্থ বিভাগের অধীনস্থ ছিল, কিন্তু এর কাজের পরিধি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ।

স্বাধীন ভারতে ১৯৫০ সালে এপ্রিল মাসে আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি তৈরী করা হয় এবং ১৯৬৩ সালে এর কর্মের পরিধি একটি নির্দিষ্ট কাঠামোগত বিন্যাস পায়।

৭.৩.১ কমিটির গঠন

১৯৫০ সালে এর সদস্য ছিল ২৫ জন যা ১৯৫৬ সালে বর্দ্ধিত হয়ে ৩০ জন হয়। রাজ্যসভার কোন প্রতিনিধিত্ব এখানে থাকে না। লোকসভার সদস্যদের মধ্য থেকে লোকসভার সদস্যদের দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সদস্যরা নির্বাচিত হন। লোকসভার বিভিন্ন দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করাই এর লক্ষ্য। সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ একবছর। তবে প্রথা হচ্ছে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য পরের বছরের জন্যও নির্বাচিত হন।

লোকসভার অধ্যক্ষের দ্বারা এই কমিটির সভাপতি মনোনীত হন। যদি উপাধ্যক্ষ এই কমিটির সদস্য হন, সেক্ষেত্রে তিনিই সভাপতি হবেন। মন্ত্রীগণ কমিটির সদস্য হতে পারেন না।

যেহেতু কমিটির আনুষ্ঠানিক কাজের পরিমাণ অত্যন্ত বিপুল, সেইহেতু সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি সাব-কমিটি গঠিত হয়।

সাধারণত জুন মাসে কমিটি গঠিত হয় এবং জুলাই মাসে এর কাজ শুরু হয়।

৭.৩.২ কার্যাবলী

আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটির কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রশাসনিক সংস্থার দক্ষতা তথা প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত সাংগঠনিক ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি সংক্রান্ত সুপারিশ অন্যতম কাজ। এই দায়িত্ব এই কারণে পালন করতে হয় যে এর সঙ্গে আর্থিক মিতব্যয়িতার প্রশ্ন জড়িত। আর্থিক মিতব্যয়িতার কথা এই কারণে ভাবতে হয় যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবির যৌক্তিকতা মিতব্যয়িতার নিরিখেই নিরূপিত হতে পারে।

(২) বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার অন্বেষণে বিকল্প প্রশাসনিক পদ্ধতি অন্বেষণ।

(৩) যে উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাজেট-বরাদ্দের দাবি, তা প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?

(৪) ব্যয়-বরাদ্দের দাবি যে বিশেষ বিন্যাস বা রূপে (Form) উপস্থাপিত হবে তা স্থির করা।

(৫) বিভিন্ন বিভাগের বরাদ্দের দাবির মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য আছে কিনা।

এই কর্ম প্রক্রিয়ার সমষ্টিগত রূপকে ১৯৫৯ সালে তৎকালীন লোকসভার অধ্যক্ষ যেভাবে ব্যাখ্যা করেন

তা হল : "The fundamental objectives of the (Estimates) committee are economy, efficiency in administration and ensuring that money is well laid out; but, if on close examination it is revealed that large sums are growing to waste because a certain policy is followed, the committee may point out the defects and give reasons for the change in the policy for the consideration of the House"

তবে এই কমিটি ব্যয়-বরাদ্দ গুলির পশ্চাদ্‌গত সরকারি নীতি পরিবর্তন করতে পারে না। এখানে 'নীতি' বলতে সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইন, অধ্যাদেশ (status) ইত্যাদির পশ্চাতে স্থিত প্রণোদনাকে বোঝান হচ্ছে।

কমিটি সংসদ কর্তৃক প্রণীত নীতি, যা শাসন বিভাগের কার্যপালনের দিগদর্শন হিসাবে কাজ করবে, তা পরীক্ষা করতে পারে। এর অর্থ বস্তুত নীতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা। এর ফলে লোকসভার দৃষ্টি এই মর্মে আকর্ষণ করা যায় যে সংশ্লিষ্ট নীতির পরিবর্তন জরুরি।

৭.৩.৩ কাজের পদ্ধতি

বাস্তবে আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটির পক্ষে সমস্ত বিভাগের সমস্ত ব্যয় পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত বিভাগগুলির কোনো কোনো নির্দিষ্ট ব্যয় পরীক্ষা করার জন্য ঠিক করা বা পছন্দ করা হয়। এছাড়াও, প্রত্যেক বছরে কোনো কোনো বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ আদৌ পরীক্ষা করা নাও হতে পারে এবং বাস্তবে তাই হয়।

যে বিভাগের যে নির্দিষ্ট ব্যয়গুলি পরীক্ষা করার জন্য নির্দিষ্ট করা হল সেই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ সরবরাহ করে থাকে। তবে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার স্বার্থে তা বাধ্যতামূলক নয়। কমিটির নিজস্ব অফিস আছে, যার কাজ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সদস্যদের কাছে তা পেশ করা। সদস্যগণ তথ্যের প্রাথমিক পরীক্ষা পর্বে আরো তথ্য চাইতে পারেন।

কমিটি যে প্রয়োজনানুযায়ী সাব কমিটি তৈরী করতে পারে, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। এতে বিশেষীকৃতভাবে কোন একটি বিষয় পরীক্ষা করা যায় অথবা বিশেষজ্ঞগণের সমাহার ঘটানো যায়।

কমিটি বিভাগীয় আধিকারিকদের ডেকে পাঠাতে পারে এবং সাধারণত বিভাগের সচিব পূর্ব নির্দিষ্ট দিনে বিভাগীয় বরাদ্দের দাবির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করার জন্য হাজির হন। কোন একটি বিভাগের কোন একটি প্রকল্পকে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য কমিটি কোন স্টাডি গ্রুপ তৈরি করতে পারে যা সরাসরি প্রকল্প এলাকা পর্যবেক্ষণে যেতে পারে।

সমস্ত কিছু পরীক্ষার পর কমিটি তার সুপারিশগুলি প্রণয়ন করে। এই সুপারিশে সেই সমস্ত বিষয় স্থান পায় না যেগুলি ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে আলোচিত হয় নি। এছাড়াও লোকসভায় পেশ করার পূর্বে সুপারিশে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সঠিক কিনা দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে প্রেরণ করা হয়।

এর পরেই সুপারিশের আকারে কমিটির রিপোর্ট লোকসভায় পেশ করা হয়। এক্ষেত্রে কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হয়। শুধুমাত্র এই রিপোর্টটির উপর ভিত্তি করে কোন বিতর্ক সভায় হয় না। তবে বাজেট বিতর্কে ও ব্যয়-বরাদ্দ দাবির ক্ষেত্রে রিপোর্টের প্রসঙ্গ প্রায়শই উত্থাপিত হয়।

রিপোর্টে যে সুপারিশগুলি করা হয় তা প্রধানত তিন ধরনের ঃ—

(১) সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাঠামো তথা সাংগঠনিক ব্যবস্থার উন্নতি সংক্রান্ত;

(২) ব্যয়-বরাদ্দের দাবি ও অনুমোদিত ব্যয়-বরাদ্দের ক্ষেত্রে মিত-ব্যয়িতা সংক্রান্ত;

(৩) ব্যয়-বরাদ্দের দাবি প্রণয়ন ও উপস্থাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান সংক্রান্ত।

কি জাতীয় সুপারিশ করা হয়ে থাকে, তার কয়েকটি উদাহরণ প্রদান আপানাদের পক্ষে কৌতূহল নিবারক হতে পারে।

(১) দ্বিতীয় রিপোর্টে বিভিন্ন বিভাগগুলির সচিব দপ্তর কিভাবে সংগঠিত হবে সেই সুপারিশ ছিল।

(২) চতুর্থ রিপোর্টে নদী-বাঁধ প্রকল্পগুলি নিয়ে সুপারিশ করা হয়েছিল।

(৩) নবম রিপোর্টে প্রশাসনিক ও আর্থিক সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশ করা হয়েছিল।

(৪) ষোড়শ রিপোর্টে সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলির বিষয়ে সুপারিশ ছিল।

(৫) বিশতম রিপোর্টে ১লা অক্টোবর থেকে আর্থিক বছর শুরু করার পরামর্শ ছিল।

(৬) ৮৮তম রিপোর্টে জীবিকার অধিকতর সংস্থান-এর জন্য সুপারিশ ছিল।

(৭) ১২২তম রিপোর্টে জাতীয় শিল্পোন্নয়ন নিগমের কাজের পরিধি বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুপারিশ ছিল।

মনে রাখা দরকার, প্রত্যেকটি রিপোর্টেই এই জাতীয় বেশ কয়েকটি করে সুপারিশ থাকতে পারে।

৭.৪ মূল্যায়ন

আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটির সুপারিশগুলি কতটা বাস্তবে গৃহীত হয় সে সম্বন্ধে সংসদ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জনপ্রশাসনবিদরা বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছেন। সেই ব্যাপারটি উল্লেখ করতে গিয়ে মাহেশ্বরী বলেছেন যে অধিকাংশ সুপারিশই গৃহীত হয়।

কিন্তু সেটি এর কৃতিত্বের প্রধান দিক নয়। সুপারিশগুলি সরকারের পরিকল্পনা ও নীতি সংক্রান্ত চিন্তাভাবনায় যে সুদূরপ্রসারী ধ্রুবাত্মক প্রভাব বিস্তার করে তাই এই ব্যবস্থার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দিক। এর অবশ্য একটি বিপরীত দিকও আছে। কোন একটি বিভাগের ব্যাপারে সুপারিশের অর্থ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আর পরীক্ষার সম্মুখীন না হওয়া। এই সুপারিশ প্রশংসামূলক হলে বিভাগটির আত্মশ্লাঘা ও আত্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়—যা শেষ পর্যন্ত ঋণাত্মক ফলদায়ক হয়ে যেতে পারে। এর ফলে বিশেষজ্ঞরা এই মতে উপনীত হয়েছেন যে খুব কম সময়-পরিধির মধ্যে সমস্ত বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দকে যেন পর্যবেক্ষণ পরীক্ষা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৭.৪.১ সমস্যাবলী

কমিটি ব্যবস্থায় নিজস্ব কিছু সীমাবদ্ধতা থাকবেই। কারণ কমিটি কারোর দ্বারা সৃষ্ট বলে স্রষ্টার তুলনায় তার কাজের পরিধি ও ক্ষমতা কম থাকাই স্বাভাবিক। অতএব সংসদের সঙ্গে কমিটির তুলনা করা চলে না। প্রচলিত পুস্তকগুলিতে 'ত্রুটি' বলতে এই দিকটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় যা ঠিক নয়।

তবে অশোক চন্দ তাঁর 'Indian Administration' গ্রন্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তাঁর মতে এই কমিটি তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হয়েছে। এই নির্দিষ্ট কাজ হচ্ছে ব্যয়-বরাদ্দের দাবির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ; কিন্তু বর্তমানে বিভাগগুলির সাংগঠনিক কাঠামো ও সরকার অনুসৃত নীতির বিশ্লেষণেই মূল সময় ব্যয়িত হয়। এই ভূমিকার পরিবর্তত আবহাওয়াকেই তাঁর ভাষায় বলা যায়, "..... and is becoming a fault finding, rather than a fact-finding mechanism."

প্রশাসনবিদদের কাছে আরো যে সমস্যাটি গুরুত্ব পায় তা হল কমিটির সদস্যরা কেউ স্থায়ী নন, এবং সেই অর্থে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিচালন পদ্ধতি ও নিয়মাবলী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান তাঁদের নেই। এই পরিস্থিতিতে ব্যয়-সংক্ষেপের সুপারিশ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

এছাড়াও পূর্বেই আমরা দেখেছি যে স্বাভাবিক প্রথানুযায়ী সমস্ত বিভাগের সমস্ত ব্যয়-বরাদ্দ পরীক্ষা করার জন্য গৃহীত হয় না। সময়ের অভাবই এর মূল কারণ।

যদিও আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটির সুপারিশগুলি সরকারের কাছে ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে এবং সেই অর্থে এর সুপারিশগুলি মেনে নেওয়ার প্রবণতা আছে, তবুও ব্যয়-সংকোচ সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি যেভাবে গুরুত্ব পায়, প্রশাসনিক সংস্কার বা বিভাগীয় কাঠামো পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি সেই গুরুত্ব পায় না। এর ফলে কমিটির মর্যাদা ও কর্তৃত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এই অর্থে কমিটির কাজের রাজনৈতিক প্রচারগত মূল্য আছে, কিন্তু বাস্তব মূল্য কতটা আছে তা সন্দেহের বিষয়।

৭.৪.২ প্রত্যুত্তর

উপরিউক্ত আলোচনাকে যদি ত্রুটি বলে গণ্য করা হয়, তবে তার খুব একটা গুণগত মূল্য কে. সি. হোয়ারের কাছে নেই। তিনি তাঁর "Government by Committee" (Oxford) গ্রন্থে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কমিটির কাজকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে চান, কারণ সম্পদ সংরক্ষণ ও অপব্যয় নিবারণের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বভাবতই ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য অধিকাধিকভাবে প্রযোজ্য।

অশোক চন্দ কৃত সমালোচনা মূলক মূল্যায়নের কথা যদিও আমরা পূর্বেই বলেছি, তবুও তিনি হোয়ারের বক্তব্যের প্রেক্ষাপটেই কমিটির সপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি যদিও নীতির যৌক্তিকতা নির্ধারণের প্রশ্নে অত্যাধিক সময় ব্যয়কে সমালোচনা করেছেন, তবুও ব্যয়-বরাদ্দের দাবির যৌক্তিকতা নির্ধারণের কাজটিও যে শেষ পর্যন্ত নীতি নির্ধারণের কাজের সঙ্গে যুক্ত তা স্বীকার করেছেন।

এই দুটি বিষয়ের সংশ্লেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি যে কাজটুকু করে সংসদের পক্ষে তাও করা সম্ভব হয় না। সদস্যদের কার্যকালের স্বল্পমেয়াদের প্রশ্নটিও খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে নয় যে রাজ্যসভার মতই কমিটির কাজের একটি প্রবহমানতা থাকে; যেহেতু প্রথানুযায়ী প্রত্যেক বছর এক তৃতীয়াংশ সদস্যই শুধুমাত্র চলে যেতে বাধ্য হন। এর অর্থ হল একজন সদস্য একাদিক্রমে তিনবছর পর্যন্ত কাজ চালাতে পারেন যা তাঁকে অভিজ্ঞ কর্মীতে পরিণত করে। বরং কমিটি লোকসভার সদস্যদের, প্রশাসন ও দৈনন্দিন যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন সরকার হয়, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করে তোলে। কারণ লোকসভার সমস্ত সদস্যেরই ক্রমান্বয়ে কমিটির সদস্য হওয়ার সুযোগ আছে। জনপ্রশাসনবিদদের মতে

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের এই অভিজ্ঞতা অ-রাজনৈতিক প্রশাসকদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সমানুপাতিক নয়। কিন্তু এটি অসুবিধাজনক বা ক্ষতিকারক নয় এই কারণে যে দক্ষতার সঙ্গে দক্ষতার বিরোধ তৈরি হওয়ার অবকাশ এক্ষেত্রে নেই। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গদের দ্বারা প্রণীত রিপোর্ট বা প্রতিবেদন যথেষ্ট প্রচার পায়। এর ফলে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল আরো সমৃদ্ধ হতে পারে।

৭.৫ সারসংক্ষেপ

এতক্ষণ আমরা আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি নিয়ে আলোচনা করেছি।

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকরিভাবে সক্রিয় রাখার জন্য কমিটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যার কাজ হচ্ছে কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষীকৃত মতামত জানানো। এর ফলে শাসন বিভাগের উপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ অনেক সুদৃঢ় হতে পারে।

আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি সংসদীয় আর্থিক কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত একটি ব্যবস্থা।

লোকসভার সদস্যদের মধ্য থেকে এটি গঠিত হয় এবং প্রত্যেক বছর এই কমিটি নতুন করে গঠিত হয়। তবে প্রথা হচ্ছে মোট সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ নতুন কমিটিতে থেকে যান এবং মাত্র এক তৃতীয়াংশ নতুন সদস্য নির্বাচিত হন। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতির ভিত্তিতে সদস্যরা নির্বাচিত হন।

কোন একটি বিভাগ বাজেটের মাধ্যমে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি যেভাবে সংসদে পেশ করে তা পরীক্ষা করা এই কমিটির কাজ। এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য থাকে বরাদ্দের দাবি ও মিতব্যয়িতার মেলবন্ধন ঘটেছে কিনা এবং বরাদ্দের দাবির পশ্চাদ্‌গত নীতি কতটা যুক্তিযুক্ত তা স্থির করা। সরকারি নীতি পরিবর্তন করার ক্ষমতা এর নেই।

সমস্ত বিভাগের সমস্ত ব্যয় পর্যবেক্ষণের মধ্যে আসে না এবং কমিটির সুপারিশ লোকসভায় পেশ করার পর তা নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু এই সুপারিশ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়।

অবশ্য বিশেষজ্ঞদের মতে পরবর্তী বছরের জন্য সুপারিশগুলি অভিজ্ঞতা হিসাবে কাজ করে এবং সেই অর্থে সরকার কর্তৃক অধিকাংশ সুপারিশ গৃহীত হওয়ার একটি প্রবণতা থাকে।

অবশ্য এই জাতীয় একটি সমালোচনা করা হয়ে থাকে যে সাংগঠনিক কাঠামো ও নীতির যথার্থতা অন্বেষণে কমিটি যতটা সক্রিয়, ব্যয় বরাদ্দের যৌক্তিকতা অন্বেষণে ততটা সক্রিয় নয়।

অবশ্য অধিকাংশ আর্থিক প্রশাসনবিদ এই সমালোচনার সঙ্গে একমত নন। ব্যয়-বরাদ্দের দাবির যৌক্তিকতা অন্বেষণের যতটুকু কাজ এই কমিটি করে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়ে থাকে। দাবির যৌক্তিকতা অন্বেষণ নিজেই একটি নীতি নির্ধারণকারী প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

৭.৬ প্রশ্নাবলী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

(১) আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটির গঠনের ইতিহাস ও এর সাম্প্রতিক গঠন আলোচনা করুন।

(২) আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটির কার্যাবলী ও কাজের পদ্ধতি আলোচনা করুন।

(৩) আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটির অবস্থিতির একটি সমালোচনা মূলক মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

(ক) আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি কিভাবে গঠিত হয়?

৭.৭ উত্তর সংকেত

প্রশ্ন ১ — একক ৭.৩ ও ৭.৩.১

২ — একক ৭.৩.২ ও ৭.৩.৩

৩ — একক ৭.৪, ৭.৪.১, ৭.৪.২

৪ — একক ৭.৩.১ থেকে খুঁজুন।

৭.৮ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

1. Financial Committee of Indian Parliament– R.N. Agarwala, S. Chand & Co. Delhi.
2. Parliamentary Control over Finance in India– C. P. Vhambri, Jaiprakash Nath Co. Meerut.
3. Parliamentary Control over Governmet Expenditure– D. N. Gadhok, Sterling, Delhi.
4. Parliamentary Financial Control in India– P. K. Wattal, Minerva, Bombay.

একক ৮ ☐ সরকারি গণিতক কমিটি

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য
৮.২ প্রস্তাবনা
৮.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
৮.৪ কার্যকাল ও গঠন
৮.৫ কার্যাবলী
৮.৬ কাজের পদ্ধতি
৮.৭ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা
৮.৮ প্রত্যুত্তর
৮.৯ সারাংশ
৮.১০ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী
৮.১১ উত্তর সংকেত
৮.১২ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ উদ্দেশ্য

আলোচ্য এককটি পাঠ করলে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারবেন ঃ

- সরকারি গণিতক কমিটির উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
- এই কমিটির কার্যকাল গঠন ও কার্যাবলী
- কার্যাবলী সম্পাদনের পদ্ধতি
- কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে ত্রুটি
- মূল্যায়ন

৮.২ প্রস্তাবনা

পূর্বের এককটিতে প্রথমেই আমরা সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কমিটি ব্যবস্থার গুরুত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলাম। শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে এবং তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ, সংসদীয় কর্মধারাকে বিশেষ ক্ষেত্রে বিস্তৃত আলোচনার স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই কমিটি ব্যবস্থা অপরিহার্য।

বর্তমানে আমরা যে সরকারি গণিতক কমিটি নিয়ে আলোচনা করব এবং পূর্বের এককে যে আনুমানিক ব্যয়

হিসাব কমিটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে— এই দুটি কমিটিকে "যমজভাই" বলে অভিহিত করতে জনপ্রশাসনবিদদের দ্বিধা নেই। এর কারণ ক্রমশ পরিস্ফুট হবে।

আমরা একক ৫ এ বিল পাসের পদ্ধতি আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছিলাম যে প্রত্যেকটি বিভাগের বাজেট বরাদ্দের দাবি পৃথক করে ভোটে গৃহীত হয় এবং সেগুলি সম্মিলিতভাবে আবার 'বিনিয়োগ বিল' হিসাবে গৃহীত হয়। এইভাবে বিভিন্ন ব্যয়ের জন্য সংসদ যে অর্থ আইনসঙ্গতভাবে বরাদ্দ করছে তা যথার্থভাবে ব্যয়িত হচ্ছে কিনা সেটি দেখার দায়িত্ব ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের (The Comptroller and Auditor General of India)।

অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী শাসন বিভাগ অর্থ ব্যয় করছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব এই স্বয়ংশাসিত সংস্থাটির।

নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক সংসদে যে প্রতিবেদন পেশ করে তা পরীক্ষা করার দায়িত্ব সরকারি গণিতক কমিটির। পরীক্ষার দায়িত্ব একটি কমিটির হাতে ন্যস্ত করার মূল কারণ তিনটি—

(১) সংসদের পক্ষে তার বিপুল সদস্যদের নিয়ে প্রতিবেদনের বিস্তৃত বিশ্লেষণ কখনই সম্ভব নয়;

(২) এই পরীক্ষাকার্য যেহেতু বিশেষজ্ঞ-জ্ঞান অভিমুখী সেই হেতু একটি কমিটির পক্ষেই তা করা সম্ভব

(৩) অ-রাজনৈতিক তথা দলীয় স্বার্থবিহীনভাবে যদি বিষয়টি পরীক্ষা করতে হয়, সেক্ষেত্রে একটি কমিটিতেই তা করা সম্ভব।

৮.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

কমিটি ব্যবস্থা, ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থা ব্রিটিশ আইনসভার নিকট থেকে গ্রহণ করেছে। এই অর্থে সরকারি গণিতক কমিটি বা আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটির মডেল গ্রেট বৃটেনের ব্যবস্থা থেকে ধার করা।

কিন্তু গণিতক কমিটির মডেল বৃটেনের ক্ষেত্রেও অনেক পরে এসেছে। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের পর ব্রিটিশ আইনসভা "বিনিয়োগ বিল" অনুমোদনের অধিকার পায়; কিন্তু এই বরাদ্দকৃত অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হল তা পরীক্ষা তথা নির্ধারণ করার দায়িত্ব কমন্স সভা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে পায় নি। এই বছরই কমন্স সভা "Committee of Public Accounts" তৈরি করে যা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে "Public Accounts Committee" নামে অভিহিত।

ভারতবর্ষে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মন্টফোর্ড সংশোধনী (Mont Ford Reforms) গৃহীত হয় এবং কেন্দ্রে এই বছরই প্রথম গণিতক কমিটি গঠিত হয়। জন্মের পর থেকেই এই কমিটি সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। যদিও স্বাধীনোত্তর পর্বে এই কমিটি, গঠন ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে যে ক্ষমতা ভোগ করে, স্বাধীনতার পূর্বে সেই গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ছিল না, তবুও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মিতব্যয়িতার প্রাথমিক ঐতিহ্য গণিতক কমিটি তৈরি করেছিল।

তবে উল্লেখযোগ্য যে স্বাধীনতা পূর্বে এটি মূলত আইনসভা থেকে আগত কমিটি ছিলন না। যদিও অর্থমন্ত্রী এর সভাপতি ছিলেন তবুও এর সদস্যরা অর্থদপ্তর কর্তৃক মনোনীত হতেন। এর ফলে শাসন বিভাগের সমালোচনার

ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকত না।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে একে যথার্থ একটি সংসদীয় চরিত্র দেওয়া হয়। প্রথমে এর সদস্য সংখ্যা ছিল পনের, যাঁরা প্রত্যেকেই লোকসভা থেকে নির্বাচিত হতেন। ১৯৫৩ সালে সদস্যসংখ্যা হয় বাইশ, যেহেতু বর্দ্ধিত সদস্য সংখ্যার দ্বারা রাজ্যসভার প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু বৃটেনে লর্ড সভা থেকে কোন সদস্য গ্রহণ করা হয় না।

৮.৪ কার্যকাল ও গঠন

সরকারি গণিতক কমিটির কার্যকাল একবছর। অর্থাৎ প্রতিবছর নতুন করে কমিটি গঠিত হয়। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সদস্যরা নির্বাচিত হন। নির্বাচনের এই পদ্ধতি অনুসরণ করার কারণ হচ্ছে সংসদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি যাতে তাদের সদস্য সংখ্যার অনুপাতে কমিটিতে স্থান পায় তা নিশ্চিত করা। কোন মন্ত্রী কমিটির সদস্য হতে পারেন না।

যদিও সদস্যরা এক বছরের জন্য নির্বাচিত হন, তবুও প্রথা হচ্ছে একজন সদস্য পরপর দু-বছর নির্বাচিত হবেন। এর ফলে অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়।

লোকসভার স্পীকার সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি হিসাবে নিয়োগ করেন। বৃটেনের ক্ষেত্রে তিনি অপরিহার্যভাবে বিরোধিদলের সদস্য হন। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ১৯৬৬-৬৭ আর্থিক বছর পর্যন্ত ক্ষমতাসীন দলের কোন সদস্যই সভাপতি মনোনীত হতেন। এর পর থেকে বিরোধী দলের কোন সদস্য সভাপতি নির্বাচিত হন। গণতান্ত্রিকভাবে বিরোধিতাকে নিশ্চিত করার জন্য এই ব্যবস্থা, যার ফলে সমালোচনা গঠনমূলক হতে পারে। হয়ত বিরোধীদলের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতির অভাবজনিত কারণে স্বাধীনতার পর প্রথম দিকে সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিরোধী দলকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

৮.৫ কার্যাবলী

সরকারি গণিতক কমিটির কার্যাবলী নিম্নরূপ—

(১) প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য যে খাতে যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে তা যথার্থই আইনসঙ্গতভাবে বণ্টিত হয়েছে কিনা অর্থাৎ তারা পেয়েছে কিনা।

(২) যে উদ্দেশ্যে অর্থের প্রাপ্তি ঘটেছে সেই উদ্দেশ্যের জন্য তা যথার্থই ব্যয়িত হয়েছে কিনা।

(৩) আইনসঙ্গত যোগ্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে কিনা?

(৪) এই নির্দিষ্ট আইন সঙ্গত কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রণীত বিভাগীয় নিয়মাবলীর ভিত্তিতে উক্ত অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে কিনা?

(৫) নিয়ন্ত্রক ও সহ্গণনা পরীক্ষকের প্রেরিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশনগুলির আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব পরীক্ষা অথবা সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলির আয়-ব্যয় ও লাভক্ষতির খতিয়ান পরীক্ষা করা।

(৬) স্বয়ংশাসিত অথবা আধা-স্বয়ংশাসিত সংস্থা সমূহের লাভ ও ক্ষতির হিসাব সংক্রান্ত প্রতিবেদন পরীক্ষা করা।

(৭) রাষ্ট্রপতির আদেশানুসারে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক সরকারের কোন বিশেষ আয় বা সঞ্চয়ের 'অডিট' রিপোর্ট সংসদে পেশ করার পর তা পরীক্ষা করা গণিতক কমিটির অন্যতম কাজ।

মনে রাখা দরকার কার্যাবলী প্রসঙ্গে আমরা যা উল্লেখ করেছি তা কার্যাবলীর উদাহরণ মাত্র। কার্যাবলী কি হবে তা অনেকটাই নির্ভর করে আইন, প্রথা, পরিস্থিতি, অভিজ্ঞতা এবং নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের পরামর্শের উপর। কার্যাবলীর কোনো সুনির্দিষ্ট চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করা বস্তুত বাস্তবসম্মত নয়। ৮.৬ এককটি পাঠ করলে ব্যাপারটি আমরা আরো সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারব।

৮.৬ কাজের পদ্ধতি

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি গণিতক কমিটি তার কাজের ভিত্তি হিসাবে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের প্রতিবেদনকে আশ্রয় করে। প্রতিবেদনটি মন্ত্রীদপ্তর ভিত্তিকভাবে পরীক্ষিত হয়। অডিটে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য কমিটির নিকট মন্ত্রী দপ্তরের সচিব হাজির হতে বাধ্য থাকেন। এর পরেই কোন একটি সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় এবং চূড়ান্ত সুপারিশ তৈরি হয়।

নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক ব্যক্তিগতভাবে নিজে সবসময়েই কমিটির কাজে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালনের জন্য সচেষ্ট থাকেন। কিভাবে কোন বিষয়ে কি পথ অনুসরণ করে কমিটি তার পরীক্ষা কার্যাদি সমাধান করবে সে বিষয়ে তিনি পরামর্শ দেন। সচিবদের নিকট থেকে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর চাওয়া প্রয়োজন সেই পরামর্শ তাঁকে দিতে হয়। অতএব পারস্পরিক পরিপূরক সম্পর্কে তাঁরা আবদ্ধ এবং তিনি "কমিটির কার্যকরি হাত, বন্ধু ও দার্শনিক" হিসাবে কাজ করেন। ভারতের প্রাক্তন নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক অশোক চন্দ-র ভাষায় "কমিটির প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগ যোগ্যতা নির্ভর করে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক কতটা বিস্তৃতভাবে অডিট সংক্রান্ত কাজ করতে সক্ষম হয়েছে তার উপর। বিপরীত দিক থেকে, কমিটি কর্তৃক অডিট রিপোর্টের প্রশংসাসূচক মূল্যায়ন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রিপোর্টে বিভিন্ন বিভাগের যে সমালোচনামূলক মূল্যায়ন থাকে তা এর দ্বারা সমর্থিত হয়। পারস্পরিক এই সম্পর্কটি আরো সুদৃঢ় হয় এই কারণে অডিট রিপোর্টে যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয় কমিটি মূলত তাই নিয়েই তাদের কর্মপ্রক্রিয়াকে ব্যাপৃত রাখে।" এর পরিপ্রেক্ষিতেই, কমিটির কার্যাবলী প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে যা উল্লেখ করেছি তাকে অনুধাবন করতে হবে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকদের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয় "দাবির যথার্থ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ" (Within the scope of demand) আছে কিনা তা পরীক্ষা করার দায়িত্ব কমিটিকে গ্রহণ করতে হয়। "দাবির যথার্থ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ"— এই ব্যাপারটির তিনটি পরস্পর সংশ্লিষ্ট অর্থ আছে ঃ

(১) সংসদের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে বিনিয়োগ বিল অনুমোদিত ব্যয়ের অতিরিক্ত ব্যয় সরকার করছে কিনা

(২) সংসদ যে উদ্দেশ্যে ব্যয় অনুমোদন করেছে, সরকার সেই উদ্দেশ্যের বাইরে গিয়ে অর্থ ব্যয় করেছে কিনা

(৩) কোন একটি ব্যয়-বরাদ্দের দাবির কারণ হিসাবে যে বিষয়গুলি (items) সন্নিবিষ্ট হয়, ব্যয় সেই বিষয়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে কিনা।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি কমিটির সিদ্ধান্ত একটি প্রতিবেদন হিসাবে সংসদে পেশ করা হয়। প্রতিবেদন প্রণয়নের বিষয়টি আরো বিস্তৃত পরিমন্ডলের ভিত্তিতে প্রস্তুত করার জন্য বর্তমানে গণিতক কমিটি বিশেষ সমীক্ষক দল (study group) তৈরি করে যারা বিশেষ বিশেষ মন্ত্রী দপ্তরের ব্যয়ের প্রকৃতি পরীক্ষা করার জন্য নিযুক্ত হয়। কমিটির নিকট এরা তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। এছাড়াও বর্তমানে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক কমিটির কাজের সুবিধার জন্য অন্তর্বর্ত্তী প্রতিবেদন পেশ করে।

সাধারণত কমিটির সুপারিশসমূহ সরকার কর্তৃক গৃহীত হওয়ার একটি প্রথা গড়ে উঠেছে। কোন একটি সুপারিশ গ্রহণের ক্ষেত্রে অসুবিধা থাকলে তা পুনর্বিবেচনার জন্য সরকার অনুরোধ করতে পারেন। প্রায় সমস্ত সুপারিশগুলিই এইভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত হতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে বিরোধ উপস্থিত হলে সংসদই শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৮.৭ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা

সরকারি গণিতক কমিটির প্রতিবেদন যে আর্থিক বছরটিকে ভিত্তি করে প্রণীত হচ্ছে, সেই আর্থিক বছরের জন্য বাস্তবে কাজে লাগছে না। কারণ ব্যয়-বরাদ্দ, আইনসঙ্গতভাবে গৃহীত হওয়ার পরেই বরাদ্দ কৃত অর্থব্যয়ের প্রকৃতি বোঝা যায় না। অতএব প্রতিবেদনটি পরের বছরের ব্যয়ের ক্ষেত্রে শাসনবিভাগের কাছে একধরনের অভিজ্ঞতা হিসাবে যেভাবে কাজ করে, চলতি আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে সেভাবে নয়। এর ফলে প্রত্যেকটি আর্থিক বছরেই শাসনবিভাগ সেই মুহূর্তে সমালোচনার দায় থেকে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্ত থাকে।

সংসদে পেশ হওয়া প্রতিবেদন যথোচিতভাবে আলোচিত হতে পারে না বলা যায়। সময়ের অভাব যেমন এর একটি কারণ, অপর কারণ হল অর্থশাস্ত্র ও হিসাবশাস্ত্র সম্বন্ধে গড়পড়তা সাংসদের অভিজ্ঞতার অভাব।

কমিটি ব্যয়ের পদ্ধতি নিয়ে অথবা তার আইনগত প্রকৃতি নিয়ে যেভাবে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে, ব্যয়-বরাদ্দের পশ্চাদগত নীতির সমীক্ষা সেই অর্থে এর উদ্দেশ্যের অন্তর্গত নয়। অতএব পদ্ধতি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ (Procedural matter), গুণগত বিষয়বস্তু নয় (Substantive matter)।

৮.৮ প্রত্যুত্তর

সমালোচনা সমূহের সাধারণ সারবত্তা নেই। কারণ যে কোন সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থাকে সমালোচনার উর্দ্ধে উঠতে গেলে কমিটিকেই সংসদের উর্দ্ধে উঠতে হয়, যা নিশ্চয়ই কাম্য নয়। সমালোচনাসমূহ নিজেরাই "Substantive" নয়। বরং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে কমিটির প্রতিবেদন শক্তিশালী বিরোধী রাজনীতির জন্ম দেয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আগামী আর্থিক বছরের জন্য কমিটির প্রতিবেদন যথার্থ কর্তৃত্বকারী ভূমিকা পালন করতে পারে।

কমিটির প্রতিবেদনের প্রচার এবং প্রচারজনিত নৈতিক চাপ উপেক্ষা করার মত বিষয় নয়। মরিস্ জোনস্-এর মতে, এর ফলে সরকারের সেই ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে জনগণ সচেতন হতে পারে যেগুলি সম্বন্ধে সরকারও সচেতন, কিন্তু যেগুলির কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয় নি। আমলাতন্ত্রও এ ক্ষেত্রে সংযত থাকতে বাধ্য হয়।

ব্যয়ের ক্ষেত্রে ত্রুটি ও শাসনবিভাগীয় জটিলতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনকল্যাণকর অর্থনীতি ও "গ্যাট" (General Agreement on Trade and Tafiff) চুক্তি পরবর্তী মুক্ত বাজার অর্থনীতির দ্বন্দ্বই এর কারণ। বিশেষজ্ঞরা এখানে পরস্পর বিরোধী চরিত্রের দুটি মন্তব্য করেছেন—

(১) ত্রুটি ও জটিলতা বৃদ্ধির কারণে সরকারি গণিতক কমিটির গুরুত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে।

(২) ত্রুটি ও জটিলতা বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে এই কমিট সর্বদাই তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেনি। স্বভাবতই উভয় বক্তব্যই সত্য।

৮.৯ সারসংক্ষেপ

আইনসভা কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে তা যথার্থ নিয়মানুগ পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে কিনা, সেটি দেখার দায়িত্ব সরকারি গণিতক কমিটির।

প্রত্যেক বছর কমিটি নতুন করে গঠিত হয় যদিও প্রথাসিদ্ধভাবে সদস্যরা দু-বছর কার্যকাল অতিবাহিত করেন। লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় কক্ষ থেকেই সদস্য নির্বাচিত হন। এতে কমিটির গণতান্ত্রিক চরিত্র সুদৃঢ় হয়।

কমিটি যে কাজ করে তার ভিত্তি হচ্ছে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট। রিপোর্টে উল্লিখিত সমস্যাগুলি কাজ শুরু করার মূল প্রণোদনা হিসাবে কাজ করে।

কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সুপারিশ হিসাবে সংসদে পেশ করা হয়। এই সুপারিশসমূহ অধিকাংশ সময়ে গ্রহণ করার প্রবণতা থাকে।

কমিটি নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণত প্রশ্ন উত্থাপন করে না, ব্যয় পরিচালনার পদ্ধতিই তার মূল আলোচ্য বিষয়।

চলতি আর্থিক বছরের ব্যয়ের প্রকৃতি পর্যালোচনা করে বলে কমিটির সুপারিশ পরের আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে যেভাবে অভিজ্ঞতা হিসাবে কাজ করে, চলতি আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে সেভাবে নয়।

৮. ১০ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

প্রশ্ন—(১) সরকারি গণিতক কমিটির উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।

প্রশ্ন—(২) সরকারি গণিতক কমিটির কার্যকাল, গঠন ও কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

প্রশ্ন—(৩) সরকারি গণিতক কমিটির কাজের পদ্ধতি আলোচনা করুন।

প্রশ্ন—(৪) কমিটির কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে উত্থাপিত সমস্যাগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। এই সমালোচনা প্রসঙ্গে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বিবৃত করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

প্রশ্ন—(৫) সরকারি গণিতক কমিটি কিভাবে গঠিত হয়?

৮.১১ উত্তর সংকেত

প্রশ্ন—(১) ৮.৩

প্রশ্ন—(২) ৮.৪ ও ৮.৫

প্রশ্ন—(৩) ৮.৬

প্রশ্ন—(৪) ৮.৭ ও ৮.৮

প্রশ্ন—(৫) ৮.৪ এ উত্তর আছে।

৮.১২ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

1. Indian Administration– Ashok Chanda, George Allen and Unwin, London.
2. Parliamentary Financial Control in India– P. K. Wattal, Minerva Book Shop, Bombay.
3. Public Administration– A. Avasthi and S. Maheshwari, Educational Publishers, Agra.
4. Public Administration in Theory and Practice– M. P. Sharma, B. L. Sadana, Kitab Mahal, Delhi.

একক ৯ ☐ জন-প্রশাসন : আর্থিক প্রশাসন ব্যবস্থা

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ প্রস্তাবনা

৯.৩ রাষ্ট্রীয় আয়ের বিভিন্ন উৎস

৯.৩.১ কর

৯.৩.২ অনুদান ও দান

৯.৩.৩ শাসনতান্ত্রিক রাজস্ব

৯.৩.৪ বাণিজ্যিক রাজস্ব

৯.৪ অনুশীলনী

৯.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন :

- জন-প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে যেসব দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার গ্রহণ করা হয়, সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান বা Resource Mobilisation কীভাবে করা সম্ভব।
- অর্থসংস্থানের বিভিন্ন পন্থাগুলির প্রয়োগ কিভাবে করা যায়, তাদের মধ্যে পার্থক্য কি এবং এগুলির সুবিধা অসুবিধা কি তাও সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।
- রাষ্ট্রীয় ব্যয় ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা, এর শ্রেণীবিভাগ এবং এই ব্যয়ের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
- ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

৯.২ প্রস্তাবনা

আগের এককগুলি পড়ে আপনারা জেনেছেন জন-প্রশাসন বা Public Administration-এর সংজ্ঞা ও মূল আলোচ্য বিষয়গুলি কি। বলা বাহুল্য, এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল রাজনৈতিক প্রশাসন বা Political Administration যার মূল কাঠামোটি তৈরি হয় দেশের প্রচলিত সংবিধান অনুসরণ করে। রাজনৈতিক প্রশাসনের

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি নির্ধারণ করা এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে ঐ নীতিগুলি রূপায়িত করা। বলা বাহুল্য, এই কর্মসূচির অন্তর্গত প্রধান কয়েকটি লক্ষ্য হল, দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য চলতি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে জাতীয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা। বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রেই প্রতিরক্ষা বাবদ ব্যয় সরকারি স্তরে মোট ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৪০ থেকে ৫০ ভাগ এবং ভারতবর্ষ এ ব্যবস্থার কোন ব্যতিক্রম নয়। অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য মোট যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়, তাও সম্ভবত অধিকাংশ দেশেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। গঠনমূলক বিভিন্ন কাজ ও জনসাধারণের জীবনধারণের মানের উন্নয়নের জন্য সাধারণত প্রয়োজন হয় রাস্তাঘাট তৈরি ও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা অনুরূপভাবে রেলপথ, সেচব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা, শিল্পায়নের জন্য উপযুক্ত ভিত্তি তৈরি করা— এগুলি গড়ে তোলার জন্য সব দেশকেই প্রচুর অর্থসংস্থানের চেষ্টা করতে হয়, নিত্যনতুন রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস খুঁজে বের করবার জন্যও নিরন্তর চেষ্টা করতেই হয়। নতুবা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ঐ দেশের স্থান ক্রমশই নীচে নেমে পড়ে।

৯.৩ রাষ্ট্রীয় আয়ের বিভিন্ন উৎস (Resource Mobilisation)

আগেই বলা হয়েছে, আধুনিক যুগের জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কার্যাবলী অত্যন্ত ব্যাপক এবং সেগুলি সুষ্ঠুভাবে করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কীভাবে সংগ্রহ করা যায়, এখন আমরা সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করব।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রীয় আয় ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক (Total receipts) প্রাপ্তি এক নয়। রাষ্ট্রীয় ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ সামগ্রিক প্রাপ্তির অন্তর্ভুক্ত। এই অংশটুকু বাদ দিলে যা বাকি থাকে তাকেই বলে রাষ্ট্রীয় আয় বা রাজস্ব। সুতরাং সামগ্রিক প্রাপ্তির দুটি ভাগ— রাজস্ব প্রাপ্তি (Revenue receipts) এবং রাজস্ব-নিরপেক্ষ প্রাপ্তি (Non-revenue receipts)।

রাষ্ট্রীয় আয় বা রাজস্ব প্রাপ্তিকে আবার অনেক সময়ে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা — কর-রাজস্ব (Tax revenues) , কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব (Non- tax revenues), কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব সংগৃহীত হয় প্রধানত তিনটি উৎস থেকে : (ক) অনুদান ও দান (Grants and Gifts), (খ) শাসনতান্ত্রিক রাজস্ব (Administrative Revenues) এবং (গ) বাণিজ্যিক রাজস্ব (Commercial Revenues)। অতএব দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রীয় আয় বা রাজস্বের প্রধান উৎস হল : (১) কর এবং তিনটি কর-নিরপেক্ষ রাজস্বের উৎস, (২) অনুদান ও দান; (৩) শাসনতান্ত্রিক রাজস্ব এবং (৪) বাণিজ্যিক রাজস্ব। এই চারটি উৎস সম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

৯.৩.১ রাষ্ট্রীয় আয়ের বিভিন্ন উৎস : কর (Taxes)

রাষ্ট্রীয় আয়ের সর্বপ্রধান উৎস হল কর এবং বিভিন্ন ধরনের কর থেকেই অধিকাংশ রাষ্ট্র তাদের প্রয়োজনীয় মোট রাজস্বের সিংহভাগ সংগ্রহ করে থাকে। অধ্যাপক ডিউ এই জন্যই বলেছেন, "রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য

অর্থসংস্থান করবার সবচেয়ে প্রচলিত ব্যবস্থা হল কর স্থাপন" ("Taxation is the most common method of financing Government activities.") কোন রকম প্রত্যক্ষ সুবিধার আশা না করে জনসাধারণ বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রকে যে অর্থ দিয়ে থাকেন,তাকেই কর বলে। অধ্যাপক টাউগিসের মতে, "করের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এর বিনিময়ে করদাতা রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোন বিশেষ উপকার পান না।" ("The essence of a tax, as distinguished from other charges by Government, is the absence of a direct quid pro quo between the tax-payer and the public authority." *quid pro quo* কথাটির অর্থ 'একের বিনিময়ে অন্য'।) করের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল, জনসাধারণের পক্ষে এটি বাধ্যতামূলকভাবে দেয়। আইন অনুসারে যাঁদের পক্ষে একটি বিশেষ কর দেয়, তাঁরা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ পরিমাণ করের টাকা রাষ্ট্রকে না দেন, তাহলে রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে তঁদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত ধনসম্পত্তি বা তার কিছুটা অংশ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কেড়ে নিতে বা বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারেন অথবা তাঁদের কোন ধনসম্পত্তি না থাকলে বকেয়া করের দায়ে কারাদন্ড পর্যন্ত দিতে পারেন।

করের যে সংজ্ঞাটি উপরে দেওয়া হয়েছে, সেই সংজ্ঞা অনুসারে করের সঙ্গে করদাতার কোন প্রত্যক্ষ সুবিধার সম্পর্ক না থাকলেও অনেক সময়েই দেখা যায়, বিশেষ কোন কর থেকে সংগৃহীত অর্থ ঐ কর প্রদানকারীদের সুবিধার জন্যই পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। যেমন, মোটরগাড়ির উপর ধার্য কর থেকে সংগৃহীত রাজস্ব সাধারণত মোটর চলাচলের রাস্তা তৈরি ও মেরামত করার জন্য ব্যয় করা হয়। গ্রামবাসীদের ওপর শিক্ষা-সেস ধার্য করে ঐ অর্থের দ্বারা গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা হয়। আবার অনেক সময়ে কোন বিশেষ বিশেষ শিল্পের উপর উন্নয়ন শুল্ক বা ঐ জাতীয় কোন পৃথক কর ধার্য করে সংগৃহীত অর্থ ঐ বিশেষ শিল্পটির উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়। এই ধরনের দৃষ্টান্ত সহজেই আরও অনেকগুলো দেখানো যেতে পারে, তবে এগুলি ব্যতিক্রম হিসাবেই ধরে নেওয়া উচিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর হতে সংগৃহীত রাজস্ব রাষ্ট্রের সাধারণ কোষাগারে জমা হয় এবং জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক যেসব প্রকল্প ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়, সেই সমস্ত বিভিন্ন ধরনের কাজগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ঐ কর থেকে সংগৃহীত অর্থভান্ডার থেকেই নেওয়া হয়। সুতরাং করদাতারা করের পরিবর্তে কোন বিশেষ সুবিধা পান না— করের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি এখনও বজায় আছে এ কথা বললে সম্ভবত কিছু ভুল বলা হয় না। ব্যক্তিগতভাবে কোন করদাতা দেয় করের পরিবর্তে রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা না পেলেও, সামগ্রিকভাবে সকল করদাতা অর্থাৎ দেশের জনসাধারণ যে পরিমাণ অর্থ রাষ্ট্রকে কর হিসাবে দেন এবং পরিবর্তে তাঁরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে সমষ্টিগতভাবে যেসব সুবিধা ও উপকার পেয়ে থাকেন— এই দুয়ের আর্থিক পরিমাণে মোটামুটি একটা সমতা আছে বা থাকে, কারণ জনসাধারণের উপকারের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয়নির্বাহের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র সাধারণত কর ধার্য করে থাকেন।

রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্য কয়েকটি উৎস থাকলেও, কর-ব্যবস্থা থেকেই এর অধিকাংশ সংগৃহীত হয়। কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মোট আয়ের অন্তত ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ কর-ব্যবস্থা থেকে পাওয়া যেত। ভারতবর্ষেও কর-রাজস্ব মোট রাজস্বের ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশের কম হবে না। এই কারণেই রাষ্ট্রীয় আয় বিভাগে কর, কর-ব্যবস্থা ও কর সম্পর্কিত অন্যান্য সকল বিষয়ের আলোচনা এই এককের পরবর্তী অংশে বিস্তারিতভাবে করা হবে।

৯.৩.২ রাষ্ট্রীয় আয়ের বিভিন্ন উৎস : অনুদান ও দান (Grants and Gifts)

রাষ্ট্রীয় আয়ের এক বড়ো অংশ আসতে পারে অনুদানরূপে। অধ্যাপক টেলর বলেন, "এক সরকার অপর সরকারকে বিভিন্ন সময়ে যে অর্থ সাহায্য করেন তাকে অনুদান বলে। সাধরণত বিশেষ কোন পদ্ধতিতে বিশেষ কোন কাজ সম্পাদনেব জন্য এটি দেওয়া হয়ে থাকে।" ("Grants are occasional payments through which one Government provides financial assistance to another usally in the performance of a specified function in a specified manner"). কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন বিশেষ কাজ করার জন্য অনুদান দেওয়া হলেও, বহু ক্ষেত্রেই সাধারণ সাহায্য হিসাবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যের ধরাবাঁধা না রেখেই এক সরকার অন্য সরকারকে অনুদান দিয়ে থাকেন। এই ধরনের অনুদানকে অনির্দিষ্ট অনুদান এবং প্রথমে যে অনুদানের কথা বলা হয়েছে, তাকে নির্দিষ্ট অনুদান বলা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় অনুদানের একটি বিশেষ স্থান আছে। কারণ এই ব্যবস্থায় আয়ের উৎসস্থল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিভক্ত হলেও, প্রধান প্রধান উৎসগুলি সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানই রাজ্য সরকারগুলির মোট আয়ের একটি বড় অংশ হয়ে ওঠে যার ফলে রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল হতে হয়। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট দু-রকমের অনুদানই দিয়ে থাকে এবং বলা বাহুল্য, এর ফলে রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রের দাক্ষিণ্যের উপর অনেকটা নির্ভর করতেই হয়। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, তফসিলি সম্প্রদায়ের জন্য কেন্দ্র কর্তৃক অনুমোদিত কল্যাণমূলক বহু ধরনের কাজ, এই জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মসূচির রূপায়ণ ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট অনুদান দেওয়া হয় অথবা রাজ্য সরকারগুলির বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য সাধারণ সাহায্যস্বরূপ অনুদানও দেওয়া যেতে পারে।

এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুই-ধরনের শাসনব্যবস্থাতেই আবার স্বায়ত্তশাসনমূলক স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলির কাছ থেকে কিছু কিছু অনুদান পেয়ে থাকে যা দিয়ে ঐ ,স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিও কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারে। এক সরকার কর্তৃক অন্য একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেওয়ার এই জাতীয় পদ্ধ তি পৃথিবীর বহু দেশেই চালু আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এক দেশের সরকার অপর কোন দেশের সরকারকে অনুদান দিতে পারে এবং দিয়েও থাকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হবার ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে স্বীকৃতি লাভের পর যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ অনুদান হিসোবে পেয়েছে। অন্যান্য এশীয় ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিও একই রকম পরিস্থিতিতে উন্নত দেশগুলি থেকে অর্থসাহায্য অনুদান হিসেবে প্রায়ই পেয়ে থাকে।

দান ও অনুদান এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেও দান কিন্তু অনুদান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অনুদান করে এক সরকার অপর সরকারকে, কিন্তু দান করে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি। উভয় ক্ষেত্রেই গ্রহীতা সরকার, কিন্তু এক ক্ষেত্রে দাতা একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এবং অপর ক্ষেত্রে অন্য একটি সরকার। দান ও অনুদানের মধ্যে মাত্র একটিই উল্লেখযোগ্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে— উভয় ক্ষেত্রেই দাতার পক্ষে বাধ্যবাধকাতার অভাব। অর্থাৎ দান ও অনুদান সম্পূর্ণভাবেই দাতার ইচ্ছাধীন, এর মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নেই এবং এর পরিবর্তে দাতা সরাসরি কোন সুবিধা বা উপকার পাবার আশা করেন না। ("Grants and gifts as a category of receipts are characterised

by their voluntary nature and by the absence of any expectation of direct benefit to the donor"— Taylor) স্বাভাবিক অবস্থায় রাষ্ট্র দান থেকে তার মোট আয়ের অতি সামান্য অংশই পেয়ে থাকেন, সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে (Resource mobilisation) এর গুরুত্ব যৎসামান্য। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় যুদ্ধ বা কোন জাতীয় দুর্যোগের ক্ষেত্রে, যেমন —দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ভূমিকম্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে। এই ধরনের জাতীয় বিপর্যয়ের সময়ে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সব শ্রেণীর জনগণের স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি জেগে ওঠে এবং তাঁরা অনেকেই রাষ্ট্রের পাশে এসে দাঁড়ান এবং বহু ক্ষেত্রেই অকৃপণ, মুক্তহস্তে সাহায্য দান করে থাকে। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় বা পরবর্তীকালে অন্যান্য প্রকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি। অনুদানের মত দানও কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে করা যেতে পারে (যেমন দাতার নিজের বা তার মাতাপিতার স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁদের নামে কোন সরকারি হাসপাতাল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরণ, নতুন কোন গবেষণামূলক সংস্থার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি) অথবা সাধারণভাবে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়াই অনেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দান করে থাকে। তবে আবারও উল্লেখ করা প্রয়োজন, রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে দান বা অনুদান কোনোটিরই উপর তেমন নির্ভর কার যায় না, অর্থাৎ **Resource mobilisation**- এর ক্ষেত্রে এদের তেমন কোন মূল্য নেই।

৯.৩.৩ রাষ্ট্রীয় আয়ের বিভিন্ন উৎস : শাসনতান্ত্রিক রাজস্ব (Administrative Revenues)

"রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিশেষ কোন সুবিধালাভের বিনিময়ে দেশের মানুষ নিজের ইচ্ছায় রাষ্ট্রকে যে অর্থ প্রদান করে থাকে, তাকেই শাসনতান্ত্রিক রাজস্ব বলা হয়।" ("Administrative revenues are voluntary payments occasioned by the conferring of a privilege" - Taylor) অধ্যাপক টেলরের মতে ফি, লাইসেন্স, জরিমানা, জামানত বাজেয়াপ্ত (forfeitures) এবং 'বিশেষ আদায়' (special assessment) শাসনতান্ত্রিক রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের রাজস্বের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, এই রাজস্ব দেওয়া কোন নাগরিকের পক্ষেই বাধ্যতামূলক নয়। যিনি রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিশেষ ধরনের কোন সুবিধা লাভ করতে চান, একমাত্র তাঁকেই এই রাজস্ব দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে রাজস্ব দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণভাবে নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, এই রাজস্ব যাঁরা দেবেন তাঁরা প্রত্যেকেই বিনিময়ে রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিশেষ কোন সুবিধা বা উপকার প্রত্যাশা করেন। অবশ্য নাগরিকরা যে পরিমাণ রাজস্ব দিয়ে থাকেন, পরিবর্তে তাঁরা যে সুবিধা বা উপকার পাচ্ছেন তার মূল্যের বা ঐ সুবিধার ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের যে ব্যয় হয় (value of the benefit or the cost of producing that benefit) দুয়ের মধ্যে কোন সম্পর্কথাকে না। শাসনকার্য পরিচালনার উপজাত মূল উদ্দেশ্য অবশ্য রাজস্ব সংগ্রহ নয় — মূল উদ্দেশ্যটি হল নিয়ন্ত্রণ এবং সেই নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করতে গিয়ে উপজাত হিসাবে এই বাবদ অল্প কিছু রাজস্ব সংগৃহীত হচ্ছে। যেমন, দেশের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের একটি উদ্দেশ্য ও একটি শাসনতান্ত্রিক কাজ। এই নিয়ন্ত্রণ কাজটি সম্পাদন করতে গিয়ে রাষ্ট্র অল্প কয়েকজন মাত্র নাগরিককে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা ও অনুমতি দিয়ে থাকে এবং এর বিনিময় তাঁদের কাছ থেকে কিছু পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে। সুতরাং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি পাবার জন্য দেয় লাইসেন্স বা ফি শাসনতান্ত্রিক রাজস্বের আর একটি দৃষ্টান্ত।

অধ্যাপক টেলর 'বিশেষ আদায়' (Special assessment)-কেও শাসনতান্ত্রিক রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'বিশেষ আদায়' ব্যপারটি সামান্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। জনস্বার্থে শহরাঞ্চলে যেসব উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা

হয় (যেমন, বস্তি ভেঙে প্রশস্ত সুন্দর রাস্তা তৈরি করা, অপরিচ্ছন্ন এলাকা পরিষ্কার করে সেখানে নতুন পার্ক বা উদ্যান তৈরি প্রভৃতি), তার ফলে ঐ অঞ্চলের সব সম্পত্তিরই বেশ কিছুটা মূল্যবৃদ্ধি হয়। এইভাবে সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধির ফলে সম্পত্তির মালিকদের যে লাভ হয়, তার কিছুটা অংশ রাষ্ট্র ঐ মালিকদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করে ঐ সব উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়নির্বাহ করে থাকে। এ ধরনের রাজস্ব সর্বপ্রথম আমেরিকাতে প্রথম চালু করা হয়; পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ সমেত অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই এই ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হল, 'বিশেষ আদায়' শাসনতান্ত্রিক রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কিনা। আমরা শাসনতান্ত্রিক রাজস্বের যে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই উল্লেখ করেছি — যথা, এই রাজস্ব দেওয়া না দেওয়া নাগরিদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, এটি বাধ্যতামূলকভাবে দেয় নয় এবং রাজস্বের বিনিময়ে রাজস্বদাতা বিশেষ সুবিধা লাভ করলেও সেই সুবিধার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের যে ব্যয় হয় তার পরিমাণের সঙ্গে প্রদত্ত রাজস্বের কোন সম্পর্ক নেই— এই দুটির প্রথমটি 'বিশেষ আদায়ের' ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য নয়, দ্বিতীয়টিও মাত্র আংশিক ভাবে সত্য। সুতরাং অধ্যাপক টেলর, অধ্যাপক সেলিগম্যান প্রমুখ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের একাংশ 'বিশেষ আদায়'-কে শাসনতান্ত্রিক রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত করলেও অন্যান্য বহু অর্থনীতিবিদ (যাঁদের মধ্যে অধ্যাপক ডালটনও আছেন) এই মত গ্রহণ করতে তেমন ইচ্ছুক নন। অধ্যাপক ডালটনের সঙ্গে একমত হয়ে 'বিশেষ আদায়'- কে একটি অদ্ভুত ধরনের রাজস্বপ্রাপ্তির উৎসরূপে গ্রহণ করাই বোধ হয় সবচেয়ে সমীচীন কাজ।

৯.৩.৪ রাষ্ট্রীয় আয়ের বিভিন্ন উৎস : বাণিজ্যিক রাজস্ব (Commercial Revenues)

পৃথিবীর সর্বত্র রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বর্তমানে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালু করা হয়েছে। জনসাধারণের সুবিধার জন্য রাষ্ট্র নানা ধরনের সেবাকার্যও করছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উৎপন্ন এইসব জিনিস ও সেবা বিক্রয় করে যে অর্থ পাওয়া যাচ্ছে বা যায়, তাকেই বাণিজ্যিক রাজস্ব বলা হয়ে থাকে। ডাকমাশুল; রেলভাড়া; রাষ্ট্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-বেতন; রাসায়নিক সার, ইস্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতি রাষ্ট্র পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের শিল্পজাত জিনিসপত্রের বিক্রয়মূল্য প্রভৃতি বাণিজ্যিক রাজস্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই জাতীয় রাজস্বের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, মূল্য বা অর্থ প্রদানের বিনিময়ে সরাসরি কোন দ্রব্য বা সেবার অধিকার লাভ করা যায়। দ্বিতীয়ত, যে পরিমাণ অর্থ মূল্য হিসাবে দেওয়া হয়, মোটামুটিভাবে তা ঐসব দ্রব্য বা সেবার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। অধ্যাপক টেলরের ভাষায়, "The chief features of commercial revenues are : direct receipt of commodity or service in return for payment and adjustment of the amount of payment at least roughly to cost (or benefit)". কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। দেশের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য অথবা বিশেষ কোন সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অনেক সময়েই রাষ্ট্র উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা বিক্রয় করে থাকে। ডাকমাশুল থেকে প্রাপ্ত অর্থ ডাক বিভাগ পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করবার পক্ষে অধিকাংশ দেশেই যথেষ্ট না হলেও দেশের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য বিরাট ক্ষতিস্বীকার করেও সরকার সাধারণত ডাকমাশুল বাড়াতে চান না। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও ছাত্র-বেতনের হার এত কম যে ঐ সূত্র থেকে পাওয়া অর্থ থেকে ঐ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মোট ব্যয়ের অতি সামান্য অংশই সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বৃহত্তর সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বাণিজ্যিক নীতি বর্জন করে উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অনেক কম হারেই ছাত্র-বেতন ধার্য করা হয়—বেতন বৃদ্ধি করে উৎপাদন-ব্যয়ের

সমান বেতন আদায় করবার কোন চেষ্টা সাধারণত জলকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে করা হয় না। এইভাবে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা স্বল্পমূল্যে সরবরাহ ও বিক্রি করে রাষ্ট্র আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা ক্ষতিস্বীকার করলেও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এই ব্যবস্থায় শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের লাভ হচ্ছে বলেই মনে করা হয়, কারণ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে চূড়ান্ত বিচারে জনকল্যাণের পরিমাণই রাষ্ট্রের প্রকৃত লাভ-ক্ষতির পরিমাপ করে, মুনাফার পরিমাণ নয়। এগুলি অবশ্য নিয়মের ব্যতিক্রম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাণিজ্যিক রাজস্বের প্রকৃতি মোটামুটিভাবে বেসরকারি উদ্যোগে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার দামেরই মতো অর্থাৎ দামের পরিমাণ উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তত সমান রাখা হয়;আর যে ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত আয় হতে থাকে, সেই উদ্বৃত্ত আয় থেকে সরকারের অন্যান্য প্রকল্প ও উদ্যোগের অর্থসংস্থান হয়।

এই এককে আমরা রাষ্ট্রীয় আয়ের বিভিন্ন উৎসের আলোচনা করেছি এবং আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, করই রাষ্ট্রীয় আয়ের সর্বপ্রধান উৎস এবং এই উৎস থেকেই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে মোট রাষ্ট্রীয় আয়ের শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগের মতো সংগৃহীত হয়ে থাকে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় আয় সম্পর্কে আমাদের এই আলোচনার পরবর্তী এককে আমরা কর-ব্যবস্থা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

৯.৪ অনুশীলনী

(১) রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রয়োজনীয়তা কি ?

(২) রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎসগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৩) 'কর-রাজস্ব' ও 'কর-নিরপেক্ষ রাজস্বের' মধ্যে পার্থক্য কি ?

(৪) শাসনতান্ত্রিক রাজস্ব ও বাণিজ্যিক রাজস্বের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি ? অল্প কথায় এ বিষয়ে আলোচনা করুন।

৯.৫ গ্রন্থপুঞ্জি

1. Due — Government Finance
2. Taylor — Public Finance
3. Bhattacharya, Mohit — New Horizons of Public Administration
4. রায়চৌধুরী, সুনীল—রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি

একক ১০ ☐ জন-প্রশাসন : রাষ্ট্রের আয়ের উৎস : করব্যবস্থা

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ প্রস্তাবনা

১০.৩ কর-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যগুলি

১০.৪ করসংগ্রহের নীতিসমূহ

১০.৫ বিভিন্ন করতত্ত্ব

১০.৬ সমানুপাতিক, ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান করব্যবস্থা

১০.৭ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ও তাদের গুণাগুণ

১০.৮ কর-বহন ক্ষমতা

১০.৯ অনুশীলনী

১০.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রীয় আয়ের সর্বপ্রধান উৎস করব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা। এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- কর-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য কি (Objectives of Taxation)
- কর সংগ্রহের নীতিসমূহ (Canons or Principles of Taxation)
- বিভিন্ন করতত্ত্ব (Theories of Taxation)
- সমানুপাতিক, ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান কর-ব্যবস্থা (Proportional, Progressive and Regressive Taxation)
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ও তাদের গুণাগুণ (Direct & Indirect Taxes : Their Merits and Demerits)
- করবহন ক্ষমতা (Taxable Capacity)

১০.২ প্রস্তাবনা

আমরা আগেই বলেছি, একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের (আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশ এই শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে) কাজের পরিধি বিশাল এবং উত্তরোত্তর সেই পরিধি বেড়েই চলেছে। এই পরিধির যত বৃদ্ধি ঘটছে, রাষ্ট্রীয় আয় সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাও তার সঙ্গে তাল রেখে বেড়েই চলেছে। আবার রাষ্ট্রীয় আয়ের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে আগের এককটিতে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকে আমরা দেখেছি প্রধান উৎসটি হল কর-ব্যবস্থা, যার থেকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনের সিংহভাগ সংগৃহীত হয়ে থাকে। সুতরাং জন-প্রশাসন বা তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে আর্থিক প্রশাসন সম্পর্কে পরিষ্কার একটি ধারণা পেতে হলে কর-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমাদের ভাল করে আলোচনা করতেই হবে। সেই আলোচনাটিই করা হবে এই এককে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করলে স্বভাবতই এই এককটি দৈর্ঘ্যে অন্যান্য একক থেকে কিছুটা বড় হবে। সুতরাং এগুলির প্রয়োজনীয় আলোচনা করতে গেলে শিক্ষার্থীদের বেশ কিছুটা অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে।

১০.৩ কর ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য (Objectives of Taxation)

কর-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আমরা সবচেয়ে আগে কর-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যগুলি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

একথা অনস্বীকার্য যে কর-ব্যবস্থার সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরন্তন উদ্দেশ্য হল রাজস্ব সংগ্রহ। অধ্যাপক টেলরের ভাষায়, "The time-honoured objective of taxation is to raise revenue. "

বর্তমান কালে অবশ্য রাষ্ট্র অন্য অনেক ধরনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্যও কর ধার্য করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজস্ব সংগ্রহকেই কর-ব্যবস্থার সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য বলে এখনও অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ স্বীকার করে থাকেন। এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নতুন করস্থাপন বা পুরোনো কর-হারের পরিবর্তনের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব বহনের জন্য অর্থসংস্থান ছাড়া আর কিছুই নয়। অধ্যাপক টেলরের মতে, "যদিও অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের চহিদা মেটাবার জন্য নতুন কর-স্থাপন অপেক্ষা ঋণ সংগ্রহই রাষ্ট্রের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ও সুবিধাজনক ব্যাপার এবং সেজন্য রাজস্ববৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নতুন করস্থাপনে রাষ্ট্র তেমন উৎসাহী নন, তা হলেও অদূরভবিষ্যতে রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে করস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে এ কথা মনে করবার কোন কারণই নেই। ("It is true that in many cases, the Government finds it much easier to raise revenues through public borrowings and this softens their desire to tax in order to pay current expenses, but there is little reason to expect that the revenue objective will seriously deminish in importance in the future",—Taylor)। সুতরাং অতীতে রাজস্ব সংগ্রহই যেমন করস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বর্তমানেও তা আছে এবং ভবিষ্যতেও এই অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হবে না।

এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, অন্য কোন উদ্দেশ্যসাধনে কর-ব্যবস্থার ব্যবহার সম্পর্কে আধুনিক অর্থনীতিবিদরা যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন নন। রাজস্ব-সংগ্রহ ভিন্ন অন্য যেসব উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর-ব্যবস্থার ব্যবহার করে থাকে, সেগুলিকে

সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্য বলা হয় (Sumptuary objectives of taxation) এবং প্রধানত নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্যে কর-ব্যবস্থার ব্যবহার হলে সেই কর-ব্যবস্থাকে সামাজিক উদ্দেশ্যসাধক আর্থিক ব্যবস্থার (Functional finance) অঙ্গ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। অর্থনীতির কোন কোন ক্ষেত্রে মূলত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কর-ব্যবস্থার ব্যবহার হতে পারে, নীচে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে, নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্যে কর-ব্যবস্থার গুরুত্ব ক্রমশই কীভাবে বেড়ে চলেছে।

প্রথমত, দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য কর-স্থাপন করা যেতে পারে। যেমন, বিদেশ থেকে আমদানি জিনিসপত্রের ওপর রাষ্ট্র যদি সংরক্ষণ শুল্ক (Protective tariff) চাপায়, তা হলে দেশের নব-গঠিত শিশু-শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। একই উদ্দেশ্য নিয়ে রাষ্ট্র যদি সদ্যপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির মুনাফার উপর কর প্রথম কয় বৎসরের জন্য অব্যাহতি দেয় (যা বহু ক্ষেত্রেই বর্তমানে করা হয়ে থাকে), তাহলে ওইসব শিল্পের উৎপাদন বিশেষভাবে উৎসাহিত হবে। আধুনিক অনেক রাষ্ট্রেই কর-অব্যাহতি (Tax relief), ক্ষয়ক্ষতি বাবদ রেয়াতদান (allowance for depreciation) প্রভৃতির মাধ্যমে উৎপাদনের বহু ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়, এই জাতীয় শুল্ক বা কর হতে কিছু পরিমাণ রাজস্ব সংগৃহীত হলেও, রাজস্ব সংগ্রহ কিন্তু তাদের প্রধান উদ্দেশ্য নয়, প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ।

করস্থাপনের দ্বিতীয় আর একটি উদ্দেশ্য ভোগ নিয়ন্ত্রণ করা। এমন অনেক ভোগ্যদ্রব্য আছে যার নিয়মিত ব্যবহার দেশের জনস্বাস্থ্য ও নৈতিক আদর্শের দিক থেকে বাঞ্ছিত নয়, যেমন গাঁজা, আফিম, মদ ইত্যাদি। এইসব জিনিসের উপর রাষ্ট্র করস্থাপন করলে তাদের কাটতি বা মোট ভোগের পরিমাণ অনেকটাই কমে যায়। এ ক্ষেত্রেও এই জাতীয় করস্থাপনের উদ্দেশ্য কিন্তু রাজস্ব সংগ্রহ বা রাজস্ব বৃদ্ধি করা নয়— নিয়ন্ত্রণ।

তৃতীয়ত, উপযুক্ত কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্র দেশের আয়-বণ্টনব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। উচ্চ আয়-সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর যদি উচ্চ হারে কর ধার্য করা হয় এবং স্বল্প-আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়, তাহলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে আয়গত পার্থক্য বর্তমানে আছে, তা অনেকটাই কমে যাবে। নতুন নতুন প্রত্যক্ষ করস্থাপন পুরোনো প্রত্যক্ষ করগুলির হার বৃদ্ধি প্রভৃতি বহু ক্ষেত্রেই প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকে। ফলে অবশ্য রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে সাধিত হয়ে যায়, কিন্তু রাজস্ব-সংগ্রহ এইসব ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য নাও হতে পারে। যেমন, উচ্চহারে সম্পদ কর, উত্তরাধিকার কর ইত্যাদি। এগুলির উচ্চহারের ফলে অর্থ-বণ্টনে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান অনেকটা কমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু পরিমাণ রাজস্ব-সংগ্রহ হয়, তা রাষ্ট্রের অতিরিক্ত লাভ।

কর ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক টেলর তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এদর মধ্যে প্রথম দুটি — রাজস্ব-সংগ্রহ (revenue objective) ও সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্য আমরা ওপরে আলোচনা করেছি। তাঁর মতে কর-ব্যবস্থার তৃতীয় একটি উদ্দেশ্যও আছে এবং সেটি হল পূর্ণ কর্মসংস্থান অব্যাহত রাখা অথবা জাতীয় আয়ের স্তর নিয়ন্ত্রণ করা (maintenance of full employment or the regulation of the level of national income)। তিনি অবশ্য এ কথাও স্বীকার করেছেন যে তৃতীয় উদ্দেশ্যটি দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণের একটি বিশেষ প্রয়োগমাত্র। সুতরাং এটিকে একটি পৃথক উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য করার তেমন প্রয়োজন নেই। ("The third and the last objective of taxation is in fact an

extension of the second."— Taylor)। এই মত অনুসারে কর সংগ্রহের ব্যাপারে রাষ্ট্র সর্বদাই বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধকারী নীতি (contra cyclical tax policy) অনুসরণ করে চলবে, অর্থাৎ বাণিজ্যচক্রের গতি প্রতিরোধ করার জন্য কর-ব্যবস্থার প্রযোজনমত পরিবর্তন সাধন করবে। বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধে কর-ব্যবস্থার ব্যবহার করতে হলে প্রথমে বাণিজ্যচক্রের মূল কারণগুলি ভালভাবে বুঝতে হবে। সমাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কোন কারণে কমে গেলে জাতীয় অর্থনীতিতে মন্দাভাব দেখা দেয় (A depression is due to the deficiency in total spending of the community)। এই সময়ে শীঘ্র কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে পারে। এই ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মধ্যে আয়করের হার কমানো, ব্যবসায়ীদের মুনাফার উপর করভার কিছুটা কমানো ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। কর-ব্যবস্থায় এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে অর্থবান ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে কিছুটা বেশি পরিমাণ আয় থেকে যায় এবং এই আয়ের একটি বড় অংশ তাঁরা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন। বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়লেই উৎপাদনের হার বাড়বে, অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হবে, মন্দাভাব কেটে গিয়ে সুদিন ফিরে আসবার (recovery) সম্ভাবনা দেখা দেবে। সামগ্রিকভাবে সমাজে ভোগের প্রবৃত্তি (propensity to consume) বাড়াতে পারলেও মন্দাভাব কেটে যায়। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করলে, রাষ্ট্র বিক্রয় কর তুলে নেবেন বা হার কিছুটা কমিয়ে দেবেন অথবা বিত্তবান সম্প্রদায়ের উপর আয়কর বাড়িয়ে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রশ্রেণীর (যাদের ভোগের প্রবৃত্তি বিত্তবান সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক বেশি) দেয় করের বোঝা কিছুটা হালকা করে দেবেন। এইসব ব্যবস্থার ফলে মন্দাভাব অবশ্যই অনেকটা কেটে যাবে। বিপরীতপক্ষে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসবে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কর-ব্যবস্থার ব্যবহার হলে, তা রাজস্ব-সংগ্রহ উদ্দেশ্যকে কিছুটা ব্যাহত করবেই। এই দুয়ের মধ্যে সংঘাত এড়াবার কোন উপায়ই নেই। মন্দার সময়ে রাষ্ট্রের আয়ের পরিমাণ কমতে থাকে, রাষ্ট্র তখন রাজস্ব সংগ্রহের তাগিদে করভার কিছুটা বাড়াতে সচেষ্ট হয় বা নতুন করস্থাপনের কথা চিন্তা করে। কিন্তু ওই সময়েই বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্রকে করভার কিছুটা হালকা করতেই হয়। ফলে, দুই উদ্দেশ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। যেসব অর্থনীতিবিদ বিশ্বাস করেন, রাজস্ব সংগ্রহের চেয়ে নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্যই বেশি প্রয়োজনীয়, তাঁরা এই পরিস্থিতিতে রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যকে কিছুটা অবহেলা করে বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধের উপযুক্ত করস্থাপন নীতি গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন, তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রাজস্ব সংগৃহীত হোক অথবা না হোক। এই অর্থনীতিবিদদের মধ্যেই আছেন বিশিষ্ট অধ্যাপক এ পি লার্নার।

এই চরম অভিমত অবশ্য অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ মেনে নিতে পারেন না। তাঁরা বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কর-ব্যবস্থার ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েও রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে চান না। মাঝামাঝি পথ যাঁরা মেনে নিয়েছেন, সেইসব অর্থনীতিবিদদের মূল বক্তব্য অধ্যাপক টেলর অতি সুন্দর ভাবে এবং অল্প কথায় তুলে ধরেছেন, "মোটামুটিভাবে বলা যায়, স্বল্পকালীন অবস্থায় প্রতিরোধমূলক বা নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যপূর্ণ, কিন্তু দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে রাজস্ব-সংগ্রহের উদ্দেশ্যকেই সামনে রেখে এবং তাকে মেনে নিয়ে সেইভাবে কর-ব্যবস্থা পরিচালনা করতে হবে। যে যে ক্ষেত্রে বাণিজ্যচক্রের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্যকেই মুখ্য করে তুলতে বাধ্য করবে, মাত্র সেই কয়টি ক্ষেত্রেই রাজস্ব-সংগ্রহের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করা চলবে, অন্যান্য ক্ষেত্রে নয়।

("In the short run, the compensatory objectives of taxation will be supreme, while revenue objectives justify a norm of taxation for revenue purpose, to be departed from when the exigencies of cyclical fluctuations in income require it."— Taylor)। করব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহে এটি একটি অত্যন্ত সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ মতবাদ এবং বর্তমান যুগে অধিকাংশ রাষ্ট্রই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই মতবাদটি অনুসরণ করে চলেছে বলে মনে হয়।

১০.৪ কর সংগ্রহের নীতিসমূহ (Canons or Principles of Taxation)

রাজস্ব সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ—এই দুই উদ্দেশ্যেই সাধারণত রাষ্ট্র কর ধার্য করে থাকে। কর ধার্য ও সংগ্রহের ব্যাপারে রাষ্ট্র সাধারণত নিয়ম বা নীতি মেনে চলে, নতুবা যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ হয় না অথবা রাজস্ব সংগ্রহ হলেও, উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে মোট উৎপাদনের পরিমাণ কমে যেতে পারে ও ফলে শেষ পর্যন্ত জাতীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অথবা ধনী-দরিদ্রের আয়-বৈষম্য বেড়ে যাওয়ায় অবাঞ্ছিত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্ট হয় ইত্যাদি। কর ধার্য ও সংগ্রহের সময়ে রাষ্ট্রকে যেসব নীতি মেনে চলতে হয় প্রাচীন অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই রকম চারটি নীতির কথা উল্লেখ করেছেন।

অ্যাডম স্মিথের প্রথম নীতি হল ঃ

(১) সামর্থ্য বা সমতার নীতি (Canon of Ability or Equality)

অ্যাডাম স্মিথের মতে, "রাষ্ট্রের কাজ নির্বাহের জন্য দেশের সমস্ত নাগরিককেই যথাসম্ভব নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করতে হবে; অর্থাৎ রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের থেকে যে যেমন উপার্জন করে, তারই অনুপাতে সে রাষ্ট্রের কাজ নির্বাহের ব্যয়ভার বহন করবে।" ("The subjects of every state ought to contribute towards the support of the government as nearly as possible in proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the State'— Adam Smith : Wealth of nations)। এই নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিককে তার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে করভার বহন করতে হয় এবং প্রত্যেকে সামর্থ্য অনুযায়ী করভার বহন করলে করপ্রদানের দরুন তাকে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তার পরিমাণে মোটামুটি সমতা আসে। এই কারণেই তাঁর এই নীতি সামর্থ্যের নীতি বা সমতার নীতি নামে পরিচিত। ন্যায়বিচারের দিক থেকে দেখলে এই নীতি যে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আসল সমস্যা হল, কিভাবে কর ধার্য করে ত্যাগ স্বীকারে সমতা প্রতিষ্ঠা করা যায়? উপার্জনের অনুপাতে কর ধার্য করলে কি ত্যাগ স্বীকারে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়? না, কর বহনের সামর্থ্য অনুযায়ী কর ধার্য করলে ত্যাগ স্বীকারে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে? উপার্জনের অনুপাতে কর ধার্য করলে সেই কর-ব্যবস্থাকে সমানুপাতিক কর-ব্যবস্থা (Proportional Taxation) বলে এবং কর বহনের সামর্থ্য অনুযায়ী কর ধার্য হলে তাকে বলে ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থা (Progressive Taxation)। (এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।) অ্যাডাম

স্মিথের প্রথম নীতিটি আপাতদৃষ্টিতে যতই যুক্তিযুক্ত হোক না কেন, এর প্রধান ত্রুটি অস্পষ্টতা। সমানুপাতিক বা ক্রমবর্ধমান—কোন কর-ব্যবস্থা অর্থনীতির ভিত্তিতে তিনি সমর্থন করেছেন সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে একটা বিরাট মতবিরোধ রয়েছে। এই নীতির সংজ্ঞায় তিনি 'অনুপাত' শব্দটি ব্যবহার করায় অনেকেই মনে করেন তিনি সমানুপাতিক কর-ব্যবস্থার পক্ষপাতী। অপর পক্ষে, সংজ্ঞায় করবহনের সামর্থ্যের কথা উল্লেখ থাকায় অন্য একদল মনে করেন, তিনি ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থাই সমর্থন করেছেন। দ্বিতীয় দল, তাঁদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে অ্যাডাম স্মিথের আর-একটি উক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেখানে তিনি বলেছেন, "ধনীরা রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজেদের উপার্জনের অনুপাতে কর তো দেবেনই, অনুপাতের ভিত্তিতে যা দেয় হয়, তার চেয়ে আরও কিছু বেশি দেবেন, এটাই যুক্তিযুক্ত।" ("It is not very unreasonable that the rich should contribute to the public expenses not only in proportion to their revenue, but something more than that proportion.")।

অ্যাডাম স্মিথের প্রথম নীতিটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এরই সঙ্গে জড়িত রয়েছে করভার বণ্টনের প্রশ্ন এবং করভার বণ্টনের প্রশ্নটিই রাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক সমস্যা। অন্যান্য নীতিগুলি কর-পরিচালনা সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশমাত্র। তবে এই নির্দেশগুলিও উপেক্ষণীয় নয় — এগুলি সঠিকভাবে মেনে না চললে অযথা করের বোঝা পরিমাণে অনেক বেড়ে যেতে পারে এবং জাতীয় অর্থনীতিও অহেতুক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

(২) নিশ্চয়তার নীতি (Canon of certainty)

দ্বিতীয়ত, অ্যাডাম স্মিথ মনে করেন, কর-ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। করের পরিমাণ এবং তা সংগ্রহের সময় ও পদ্ধতি সম্পর্কে করদাতা এবং রাষ্ট্র দুপক্ষেরই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। ("The tax which each individual is bound to pay ought to be certain and not arbitrary. The time of payment, the quantity to be paid ought all to be clear and plain to the contributor and to every other person"— Adam Smith)। এইসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে সকলেরই অনেক অসুবিধা হতে পারে। লোককে যখন করপ্রদান করতে বলা হবে, তখন হয়ত তার হাতে টাকা থাকবে না, ফলে হয় তাকে অত্যন্ত চড়াসুদে ঋণগ্রহণ করতে হবে বা সম্পত্তি বিক্রয় করতে সে বাধ্য হবে। সরকারি কর্মচারীরাও যথেচ্ছভাবে কর আদায়ের অধিকার পেলে দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠবে এবং আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাবে রাষ্ট্রের পক্ষেও বাজেট প্রস্তুত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হয়ে পড়বে।

(৩) সুবিধার নীতি (Canon of Convenience)

তৃতীয়ত, কর ধার্য করার সময়ে সুবিধার নীতি অনুসরণ করতে হবে। সুবিধার নীতি বলতে অ্যাডাম স্মিথ বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, "প্রত্যেকটি কর জনসাধারণের কাছ থেকে এমন সময়ে ও এমনভাবে আদায় করা উচিত যেন তাদের পক্ষে ওই অর্থ দিতে কোন অসুবিধা না হয়। ("Every tax ought to be levied at the time or in the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it." - Adam Smith)। এই নীতিটি ঠিকমতো মেনে না চললে সকলেরই অনেক অসুবিধা হবে। কর বাবদ প্রাপ্য সমস্ত টাকা একসঙ্গে দিতে বললে অথবা অসময়ে কর আদায়ের জন্য চাপ দিলে লোকের অনেক অসুবিধা হয়। এই জন্যই যাঁরা মাসিক মাহিনা পান, তাঁদের দেয় আয়কর মাহিনা থেকে মাস মাস কেটে নেওয়া উচিত, চাষীদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব

ও অন্যান্য কর সহজ কিস্তিতে বা ফসল বিক্রয়ের পর আদায় করা উচিত। নতুবা একই পরিমাণ করের ভার অহেতুক অনেক বেশি বলে মনে হবে।

(৪) ব্যয় সংক্ষেপের নীতি (Canon of Economy)

চতুর্থত, অ্যাডাম স্মিথের মতে, "প্রত্যেকটি কর এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত যেন রাষ্ট্রের তহবিলে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণের চেয়ে অতি সামান্য অতিরিক্ত অর্থ করদাতাদের পকেট হতে আসে। ("Every tax ought to be so contrived as both to take out and keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into the public treasury of the State."—Adam Smith) করদাতাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ কর আদায় হল, তার সামান্য অংশই যদি রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা পড়ে অর্থাৎ সংগৃহীত করের একটি বড় অংশই যদি কর সংগ্রহের খরচ হিসাবে লেগে যায়, তা হলে ঐ কর ধার্য না করাই যুক্তিযুক্ত। রাজস্ব সংগ্রহের দিক থেকে এই জাতীয় কর ধার্য করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

কর-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে নির্ধারণ ও পরিচালনার জন্য অ্যাডাম স্মিথের যে চারটি নীতি উপরে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলি যথেষ্ট মূল্যবান হলেও, আধুনিক অর্তনীতিবিদগণের বিচারে বা দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট নয়। তাঁরা এর ওপরে আরও নতুন নীতির উল্লেখ করেছেন, যেগুলি হল— স্থিতিস্থাপকতার নীতি, উৎপাদনশীলতার নীতি, সরলতার নীতি এবং সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের নীতি। এবার সংক্ষেপে এগুলি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হচ্ছে।

(৫) স্থিতিস্থপকতার নীতি (Principle of Elasticity)

এই নীতি অনুযায়ী দেশের কর-ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যেন রাষ্ট্রীয় চাহিদা অনুযায়ী কর-রাজস্বের পরিমাণ সহজেই বাড়ানো বা কমানো চলে। কেবলমাত্র রাজস্ব সংগ্রহের দিক থেকে নয়, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের জন্যও কর-ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে নমনীয় হওয়া উচিত। কর-ব্যবস্থার এই নমনীয়তা বর্তমান কালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, কারণ এই রকম নমনীয়তা না থাকলে বাণিজ্যচক্রের প্রতিরোধে অথবা উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণে, এই কর-ব্যবস্থা তেমন কার্যকরি হতে পারে না। আয়কর, ভূমিরাজস্ব প্রভৃতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মন্দার সময়ে আয়করের হার কমিয়ে দিলে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণও অনেকটাই কমে যায় এবং একই সঙ্গে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ইত্যাদির পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। আবার অর্থনীতির তেজি অবস্থায় আয়করের হার কিছুটা বাড়ালে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ তো বাড়েই, সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির জন্য দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধ প্রভৃতি অনেক নিয়ন্ত্রণমূলক কাজও বেশ ভালভাবেই হয়ে যায়। এ জন্যই অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, কর-ব্যবস্থার নমনীয়তা নিয়ন্ত্রণ-মূলক উদ্দেশ্যে কর-ব্যবস্থার প্রয়োগের দিক থেকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(৬) উৎপাদনশীলতার নীতি (Principle of Productivity)

কর-ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে রাষ্ট্রীয় তহবিলে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থাগম হয় অথচ ওই পরিমাণ অর্থসংগ্রহের ব্যয় তেমন বেশি না হয়। সুতরাং কোন্ কোন্ কর ধার্য কর হবে তা স্থির করবার আগে রাষ্ট্র বিভিন্ন করের উৎপাদনশীলতা অর্থাৎ ওই কর থেকে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ বিবেচনা করে দেখবে। যে সমস্ত কর হতে যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহের সম্ভাবনা কম, সেগুলিকে প্রথমেই বাদ দিতে হবে। সামান্য আয় হয় এরকম

অনেকগুলি কর ধার্য না করে ভালরকম অর্থাগম হয় এরূপ অল্প কয়েকটি কর ধার্য করা এই নীতি অনুসারে অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। বেশি সংখ্যায় কর ধার্য করলে কর-ব্যবস্থা শুধু যে ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে তাই নয়, কর-ব্যবস্থার উৎপাদনশীলতা অনেকটাই কমে যায়।

(৭) সরলতার নীতি (Principle of Simplicity)

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে কর-ব্যবস্থা যথাসম্ভব সহজ সরল হওয়া উচিত। কর-ব্যবস্থা বেশি জটিল হলে তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষেও তেমন সুবিধাজনক হতে পারে না। ধার্য কর সম্পর্কে করদাতাদের মনে যদি সুস্পষ্ট একটি ধারণা গড়ে না ওঠে, তাহলে ওই করের পক্ষে জনসাধারণের নৈতিক সমর্থনও গড়ে ওঠে না। ফলে ওই বিশেষ করটি থেকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থাগমও হয় না। কর-ব্যবস্থা সরল হলে কর দেওয়া সহজ হয়, সংগ্রহ করা সহজ হয়, করের ভারও যেন বেশ কিছুটা কমে যায়।

(৮) নিয়ন্ত্রণ বা সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের নীতি (Principle of Social Objective)

নিয়ন্ত্রণ বা সামাজিক উদ্দেশ্যসাধন কর-ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য, একথা আগেই বলা হয়েছে। কর সংগ্রহকার্য যাতে এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আগে অর্থনীতিবিদদের ধারণা ছিল, কর সামাজিক ফলাফল-নিরপেক্ষ হলেই ভাল। এখন কিন্তু সে ধারণা অনেকটাই পালটে গেছে— এখন মনে করা হয়, ধার্য কর সকল সময়েই সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে সহায়ক হলেই ভাল হয়।

উপরে কর-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে নীতিগুলি আলোচনা করা হল, কার্যত কোনও রাষ্ট্রই একসঙ্গে এগুলির সব কটি মেনে চলতে পারে না। তবে কোনও দেশের কর-ব্যবস্থাকে আদর্শস্থানীয় করতে গেলে অধিকাংশ নীতিগুলিই মেনে চলতে হবে। এই কারণেই এই নীতিগুলিকে একটি আদর্শ কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (characteristics of an ideal tax system) হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

এখন আমরা বিভিন্ন করতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব।

১০.৫ বিভিন্ন করতত্ত্ব (Theories of Taxation)

করভার বণ্টনের প্রশ্নে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতবিরোধের ফলেই বিভিন্ন করতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং এই করতত্ত্বগুলি আলোচনার আগে যে চারটি বিভিন্ন অর্থে করভার (burden of taxation) কথাটি ব্যবহৃত হয়, তাদের সম্পর্কে কিছুটা সুস্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন। এগুলি হল করের প্রত্যক্ষ অর্থভার, প্রত্যক্ষ প্রকৃত করভার, পরোক্ষ অর্থভার এবং পরোক্ষ প্রকৃত করভার।

করের প্রত্যক্ষ অর্থভার (direct money burden) বলতে বোঝায় জনসাধারণকে কর হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ দিতে হয়। প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভার (direct real burden) কিন্তু সম্পূর্ণ একটি পৃথক জিনিস— এটি করদাতাদের ত্যাগের পরিমাপ করে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কর হিসাবে দিতে হলে করদাতাকে যে পরিমাণ

ভোগ কমাতে হয় বা অন্যান্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, সেটাই ওই করের প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভার। সুতরাং কর-রাজস্ব সমাজের কোন অংশ বা শ্রেণীর কাছ থেকে এসেছে, তারই উপর নির্ভর করে এর প্রকৃত ভার। দরিদ্রশ্রেণী নিজেদের সীমিত আয় থেকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভোগ্য দ্রব্যগুলিও সংগ্রহ করতে পারে না। সুতরাং তাদের উপর কোনও করের বোঝা চাপালে, তার পরিমাণ যত সামান্যই হোক না কেন, তার ফলে তাদের প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। অতএব, প্রত্যক্ষ প্রকৃত করভার অপেক্ষাকৃত বেশি হবে যদি দরিদ্রশ্রেণীর কাছ থেকে ওই কর সংগৃহীত হয়। অপরপক্ষে, ধনী সম্প্রদায়ের উপর উচ্চ হারে করের বোঝা চাপালেও তাদের ভোগ তেমন কমাতে হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রকৃত করভার এক্ষেত্রে অনেকটা কম হতে বাধ্য।

করের পরোক্ষ অর্থভার (indirect money burden) বলতে কর প্রদানের দরুন করদাতাকে যে আনুষঙ্গিক আর্থিক ক্ষতিস্বীকার করতে হয়, তাকে বোঝায়। যেমন, উৎপন্ন দ্রব্যের মোট পরিমাণের ওপর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে মোট যে উৎপাদন-শুল্ক দিতে হয়, তা সাধারণত ওইসব জিনিস বিক্রি হবার আগেই আদায় করে নেওয়া হয়। বিক্রির পরে শুল্ক দেবার ব্যবস্থা থাকলে, ব্যবসায়ীরা ওইসব জিনিসের বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে উৎপাদন-শুল্ক ক্রেতার কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারেন। কিন্তু বিক্রির আগেই শুল্ক দিতে হয় বলে তাঁদের অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক থেকে ওই টাকা নিতে হয়। প্রদত্ত শুল্ক ক্রেতার কাছ থেকে আদায় হলেও সাধারণত ব্যাঙ্ক থেকে সংগৃহীত ঋণের সুদ আদায় করা আর সম্ভবপর হয় না। ব্যবসায়ীদের এই অতিরিক্ত আর্থিক ক্ষতিই কর পরোক্ষ অর্থভার।

পরোক্ষ প্রকৃত করভার (indirect real burden) বলতে কর-সমন্বিত বিশেষ বিশেষ জিনিস ও সেবার ভোগ কমে যাওয়ার ফলে যে পরিমাণ অর্থনৈতিক কল্যাণ হ্রাস পায়, তাকেই বোঝায়। আমাদের দেশে চিনির ওপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য করা হয়। চিনির ওপর উৎপাদন-শুল্ক না থাকলে চিনির যতটা ব্যবহার হতে পারত, উৎপাদন-শুল্ক চাপানোর ফলে মূল্যবৃদ্ধির দরুন ততটা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে এই দুইয়ের পার্থক্যই পরোক্ষ প্রকৃত করভার বলে ধরে নেওয়া যায়।

করভার সম্পর্কে অনেকটা সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে এখন আমরা বিভিন্ন করতত্ত্বের আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি।

(১) করের সুবিধাতত্ত্ব (Benefit Theory of Taxation)

করের সুবিধাতত্ত্ব অনুসারে নাগরিকবৃন্দ রাষ্ট্রের কার্যাবলী থেকে যে পরিমাণ সুবিধা ভোগ করছেন, তারই অনুপাতে তাদের কর দিতে হয়। রাষ্ট্রের কার্যাবলী থেকে যে ব্যক্তি বেশি সুবিধা ভোগ করে থাকেন, তাঁর ওপর ধার্য করের পরিমাণ অপর এক ব্যক্তি, যিনি রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন না, তাঁর দেয় করের পরিমাণের চেয়ে এই তত্ত্ব অনুযায়ী খানিকটা বেশি হবেই। এই তত্ত্বের সমর্থকদের মতে, করভার এইভাবে বণ্টন করলে অ্যাডাম স্মিথের সমতার নীতি মেনে চলা হবে এবং কর-ব্যবস্থা ন্যায়বিচারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু এই মতবাদ অস্পষ্ট, অনিশ্চিত, অবাস্তব ও ন্যায়বিচারের বিরোধী এবং এইসব ত্রুটির জন্য অধিকাংশের

মতেই গ্রহণের অযোগ্য। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের অধিকাংশ সর্বসাধারণের মঙ্গল ও সুবিধার জন্য করা হয়ে থাকে। ব্যক্তিবিশেষ রাষ্ট্রের কার্যাবলী থেকে ঠিক কি পরিমাণ সুবিধা ভোগ করছেন, তার পরিমাপ করা অসম্ভব। কারণ রাষ্ট্রের অধিকাংশ কাজ থেকেই নাগরিকরা সামগ্রিকভাবে সুবিধা ভোগ করেন, ব্যক্তিগতভাবে নয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিরক্ষা ব্যয়, পুলিশ-বাহিনীর সাহায্যে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যয়, বিচারব্যবস্থা চালু রাখার ব্যয় ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই এইসব খাতে মোট আয়ের অন্তত অর্ধেক অংশই ব্যয় হয়ে থাকে, অথচ এগুলি হতে যে সুবিধা পাওয়া যায় জনসাধারণ তা সামগ্রিকভাবেই ভোগ করেন, ব্যক্তিগতভাবে নয়। রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি কাজ থেকে প্রত্যেকটি নাগরিক কি পরিমাণ সুবিধা পাচ্ছেন তা পৃথক-পৃথকভাবে মাপতে না পারলে এই তত্ত্ব কার্যকরি করা যায় না, অথচ তা মাপাটাও একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং এই মতবাদ অস্পষ্ট, অনিশ্চিত ও অবাস্তব এবং স্বভাবতই এটি গ্রহণযোগ্য নয়। এই মতবাদ ন্যায়বিচারেরও বিরোধী। ওই তত্ত্ব গ্রহণ করলে সকল রাষ্ট্রেই দরিদ্র সম্প্রদায়কে মোট করভারের অধিকাংশই বহন করতে হবে, কারণ বর্তমানের জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের অধিকাংশ কাজই মূলত দরিদ্র জনসাধারণের সুবিধার বা কল্যাণের জন্যই পরিচালিত হয়ে থাকে। বস্তুত করের সুবিধাতত্ত্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদমূলক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন মাত্র— আধুনিক যুগে একেবারে গ্রহণের অযোগ্য। কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসনমূলক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর-ব্যবস্থা এই নীতির ভিত্তিতে মোটামুটিভাবে পরিচালিত হতে পারে। তবে অনেকের মতে, স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জনসাধারণ যে অর্থ দিয়ে থাকে, তা ঠিক করের পর্যায়ে পড়ে না, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই ওই অর্থ দেওয়া না-দেওয়া জনসাধারণের পক্ষে ইচ্ছামূলক, বাধ্যতামূলক নয়। একথা সত্য বলে মেনে নিলে বলা যায় যে, সুবিধাতত্ত্ব কর নীতির ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য নয়।

(২) সেবার উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব (The Cost of Service Theory of Principle)

সেবার উৎপাদন ব্যয়তত্ত্ব করের সুবিধা তত্ত্বের মতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদমূলক দৃষ্টিভঙ্গিরই আর-একটি প্রতিফলন। এই তত্ত্ব অনুসারে রাষ্ট্র ও তার নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক নিছক বাণিজ্যিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্র জনসাধারণের সেবার জন্য নানা রকম কাজকর্ম করবে এবং প্রত্যেকটি সেবামূলক কাজের উৎপাদন-ব্যয় অর্থাৎ ওই সেবা-কাজের ব্যবস্থা করতে রাষ্ট্রের কি পরিমাণ ব্যয় করতে হচ্ছে, তা সঠিকভাবে হিসাব করে যে যে নাগরিক ওই সেবা উপভোগ করছেন, তাঁদের কাছ থেকেই ওই পরিমাণ অর্থ কর হিসাবে সংগ্রহ করতে হবে। করের সুবিধাতত্ত্ব ও সেবার উৎপাদন ব্যয়তত্ত্বের মধ্যে বেশ কিছুটা পার্থক্য আছে, তা এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সুবিধাতত্ত্বে নাগরিকরা প্রত্যেকে সুবিধা ভোগ বা উপকার লাভের ভিত্তিতে কর দিতে বাধ্য। কিন্তু সেবার উৎপাদন ব্যয়তত্ত্ব অনুসারে ওই পরিমাণ সুবিধা বা সেবার ব্যবস্থা করার জন্য রাষ্ট্রের যে ব্যয় করতে হচ্ছে সেটাই কর হিসাবে প্রত্যেক নাগরিকের দেয়। অর্থাৎ এখানে রাষ্ট্র আরও চরম ব্যবসায়ীসুলভ মনোভাব অবলম্বন করেছে।

ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যবাদমূলক অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর এই মতবাদ বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও ন্যায়বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত জনকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থায় একেবারেই গ্রহণের অযোগ্য। কিন্তু এই তত্ত্বের আরও কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটি আছে। ন্যায়বিচার ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার দৃষ্টিকোণ থেকে এই তত্ত্ব যদিও বা গ্রহণযোগ্য হত তাহলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ রাষ্ট্রের অধিকাংশ কাজের ক্ষেত্রেই সম্ভব হত না। ডাক-মাশুল, রেলের ভাড়া, বিদ্যুৎ

সরবরাহের মূল্য, সরকারি কারখানায় উৎপন্ন অন্যান্য কয়েকটি জিনিসের দাম নির্ধারণ ইত্যাদি অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রেই শুধু এই নীতির প্রয়োগ সম্ভব;কিন্তু সাধারণভাবে কর ধার্যের অন্য ক্ষেত্রগুলিতে এই নীতি কোনভাবেই প্রযোজ্য হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় কাজের ফলে কে কতটা সুবিধা পেল তা যেমন মাপা যায় না, তেমনি প্রত্যেক নাগরিকের জন্য পৃথকভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয়েরও হিসাব করা যায় না। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে যদি কর সংগ্রহ করতে হয়, তবে রাষ্ট্রের জনকল্যাণকর কার্যাবলী ধীরে ধীরে সংকুচিত ও শেষে সম্পূর্ণভাবেই বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ এই তত্ত্ব অনুযায়ী বৃদ্ধ বয়সে রাষ্ট্র-প্রদত্ত পেনসনভোগীরা প্রতি মাসের পেনসন তো কর হিসাবে রাষ্ট্রকে ফেরত দেবেনই, উপরন্তু পেনসন দপ্তরের পরিচালনার আংশিক ব্যয়ভারও তাঁদের বহন করতে হবে। উদ্বাস্তুদের প্রত্যেককে শুধু যে সরকারি টাকা ফেরত দিতে হবে তাই নয়, উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন বিভাগ পরিচালনার ব্যয়ভারের একাংশও বহন করতে হবে। সুতরাং এই তত্ত্বটিকে শেষ পর্যন্ত একেবারেই অবাস্তব ও অসম্ভব বলে উপেক্ষা ও বর্জন করা হবে।

(৩) কর প্রদানের সামর্থ্যতত্ত্ব (The Ability to Pay Theory of Taxation)

ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে করভার বণ্টনের সর্ববাদীসম্মত মতবাদ হল কর প্রদানের সামর্থ্যতত্ত্ব। ("The principle of distribution of tax burden which is in conformity with the generally accepted standards of equity is that of ability to pay." -Due, Government Finance)। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক নাগরিককে তাঁর কর-প্রদান সামর্থ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রকে কর প্রদান করতে হবে। যার সামর্থ্য কম তাঁকে কম পরিমাণে কর দিতে হবে। অধ্যাপক টেলরও মনে করেন, "প্রত্যেক নাগরিক তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করলে মোট করভার নাগরিকদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে। অধ্যাপক ডিউয়ের মতে, "সামর্থ্য অনুযায়ী কর-প্রদান ব্যবস্থা শুধু যে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণ করে, তাই নয়; এর অপর একটি প্রধান সুবিধা বাস্তবক্ষেত্রে এই তত্ত্বটির প্রয়োগের উপযোগিতা।

বাস্তবক্ষেত্রে সামর্থ্যতত্ত্বের প্রয়োগ করতে হলে প্রত্যেক নাগরিকের কর-প্রদান সামর্থ্য পরিমাপের একটি সন্তোষজনক মানদণ্ড প্রথমেই খুঁজে বের করতে হবে। কর-প্রদান সামর্থ্যের সঠিক, সন্তোষজনক ও উপযুক্ত মানদণ্ড কি, সে বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ দেখা যায়। তাঁরা যে তিনটি বিকল্প মানদণ্ড গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন, নীচে আমরা সংক্ষেপে সেগুলির আলোচনা করছি।

(ক) সম্পত্তি ঃ অতীতে ব্যক্তির সম্পত্তিকে কর প্রদান ক্ষমতার মানদণ্ড হিসাবে ধরা হত;মনে করা হত, যে ব্যক্তি যত বেশি সম্পত্তির অধিকারী তাঁর কর প্রদানের সামর্থ্যও তত বেশি। সুতরাং সম্পত্তির পরিমাণের ভিত্তিতে তাঁদের অনেক বেশি মূল্যের সম্পত্তি আছে, তাঁদের ওপরেই উচ্চহারে কর ধার্য করা হত। আবার যাঁদের কোনও সম্পত্তি নেই, তাঁরা কর থেকে অব্যাহতি পেতেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই অর্থনীতিবিদরা বুঝতে পারলেন, সম্পত্তিকে ব্যক্তির কর প্রদান সামর্থ্যের আদর্শ মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা চলে না, কারণ এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁদের প্রচুর আয় থাকা সত্ত্বেও কোনও সম্পত্তি না থাকায় তাঁদের করের আওতায় আনা যায় না বা তাঁদের ওপর কোনও কর চাপানো যায় না। বলা বাহুল্য, ন্যায়বিচারের দিক থেকে এটি একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনও ব্যক্তির কিছু সম্পত্তি আছে বটে, কিন্তু ওই সম্পত্তি এমন ধরনের যে তা থেকে কোন আয় হয় না। সুতরাং ওই

সম্পত্তির ভিত্তিতে ওই ব্যক্তির ওপর উচ্চহারে কর ধার্য করলে তাও ন্যায্য হবে না। অধ্যাপক ডিউ অবশ্য এই যুক্তি খণ্ডন করে বলেছেন, আয় থাকুক বা না থাকুক, সম্পত্তির মালিকানাই যে কোনও ব্যক্তির কর-প্রদান-সামর্থ্য বাড়িয়ে তোলে, কারণ আয়-বিশিষ্ট দুই ব্যক্তির একজনের সম্পত্তি থাকলে ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য তাঁকে বর্তমান আয় থেকে কোনও সঞ্চয় করতে হবে না। কিন্তু যাঁদের সম্পত্তি নেই, তাঁদের ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য কিছুটা সঞ্চয় করতেই হবে। সঞ্চয়ের তাগিদ না থাকায় প্রথম ব্যক্তি তাঁর সমস্ত আয়ই বর্তমান ভোগের উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে পারবে; দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব হবে না। সুতরাং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে প্রথম ব্যক্তির কর-প্রদান সামর্থ্য বেশি এ কথা স্বীকার করতেই হবে। যাই হোক, শুধু সম্পত্তির ভিত্তিতে কর-প্রদান-সামর্থ্যের পরিমাপ করা পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত না হলেও, এই সামর্থ্য পরিমাপ করার সময়ে করদাতাদের সম্পত্তির পরিমাণ অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে, নতুবা ন্যায়বিচার করা কোনমতেই সম্ভব হবে না।

(খ) **ব্যক্তিগত ভোগব্যয়** : কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ ব্যক্তির ভোগব্যয়কে তার কর-প্রদান-সামর্থ্যের মাপকাঠি বলে গ্রহণ করেন। এই মতবাদ অনুসারে যে বক্তির ভোগব্যয় যত বেশি, তাঁকে তত বেশি পরিমাণ করভার বহন করতে হবে এবং যাঁর ভোগব্যয় কম তাঁকে অল্প পরিমাণে কর দিতে হবে। ভোগব্যয়কে কর-প্রদান-সামর্থ্যের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করার সমর্থনে অধ্যাপক ডিউ বলেন, "ভোগব্যয়ের ওপরই অর্থনৈতিক মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে সম্পদ সঞ্চিত করে রাখলেও তা ভোগের উদ্দেশ্যে ব্যয় না করা পর্যন্ত তার থেকে কোনও সন্তোষলাভ করা যায় না।" ("Economic well-being depends upon consumption purchases alone, that wealth accumulated yields no satisfaction until it is used for consumption purposes",— Due, Government Finance)। এই প্রস্তাবের সপক্ষে আরও একটি উল্লেখযোগ্য যুক্তি, এটি অতি সহজ ও সরল এবং এটি গ্রহণ করলে সঞ্চিত আয়ের উপর দ্বিতীয়বার কর স্থাপনের সমস্যা এড়ানো যায়।

কিন্তু একমাত্র ভোগব্যয়ের ভিত্তিতেই কোনও ব্যক্তির কর-প্রদান-সামর্থ্যের হিসাব করা উচিত নয়। দুজন ব্যক্তির একই আয় থাকলেও পোষ্যসংখ্যা বেশি থাকার ফলে প্রথম জনকে বাধ্য হয়েই দ্বিতীয় জনের চেয়ে অনেক অতিরিক্ত ব্যয় করতে হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচার অনুযায়ী সম্ভবত দ্বিতীয় ব্যক্তিরই কর-প্রদান-সামর্থ্য বেশি। সুতরাং ভোগব্যয়ের ভিত্তিতে করভার চাপানো প্রকৃতপক্ষে ন্যায়বিচারসম্মত নয়। দ্বিতীয়ত, ভোগব্যয়ের পরিমাণকে কর-প্রদান-সামর্থ্যের মাপকাঠি করলে কৃপণ ব্যক্তির কোনও সামর্থ্যই নেই বলে ধরে নিতে হবে। এটাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। অনেকে মনে করেন, ভোগব্যয়ের ভিত্তিতে কর স্থাপন করলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে মূলধনের যোগান বাড়বে ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে ওই মূলধন ব্যবহার করে অল্প সময়ের মধ্যেই জাতীয় সমৃদ্ধি গড়ে তোলা যাবে। কিন্তু এ ধারণাও ভ্রান্ত। ভোগব্যয় কমলে বিনিয়োগের ইচ্ছা ও সুযোগ কমতে বাধ্য; সুতরাং মূলধনের যোগান থাকলেও তা ব্যবহারের সুযোগ থাকবে না, জাতীয় সমৃদ্ধিও গড়ে উঠবে না।

(গ) **ব্যক্তিগত আয়**: এইসব কারণে সম্পদ বা ভোগব্যয়ের পরিবর্তে ব্যক্তির বর্তমান আয়কেই অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ তার কর-প্রদান-সামর্থের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। অধ্যাপক টেলরও বলেন, "চূড়ান্ত বিচারে, আয়ের ভিত্তিতে কর দেওয়ার ব্যবস্থার সমর্থন ও স্বীকৃতি অ্যাডাম স্মিথের সমতায় নীতিতে বেশ পরিষ্কারভাবেই পাওয়া

যায়।" আপাতদৃষ্টিতে এই নীতি অতি সহজ ও সরল। উচ্চ-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর উচ্চহারে এবং স্বল্প-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর কম হারে কর ধার্য করলেই এই নীতির অনুসরণ করা হয়। ন্যায়বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিতেও এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে সমর্থনযোগ্য।

কিন্তু এতগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও আয়কেই তার কর-প্রদান-সামর্থ্যের নিখুঁত ও নির্ভুল মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা চলে না, কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে আয় বা অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা পৃথক। ফলে দুই ব্যক্তির আর্থিক আয় সমান হলেও তাদের কর দেওয়ার ক্ষমতা আলাদা হতেই পারে। দ্বিতীয়ত, দুই ব্যক্তির সমান পরিমাণ আয় থাকলেও তাদের ব্যয়ের পরিমাণ যদি সমান না হয়, তাহলে তাদের কর-প্রদান সামর্থ্যও আলাদা হতে বাধ্য। তৃতীয়ত, দুই ব্যক্তির আয় এক হলেও ওই আয় উপার্জন করতে দুজনকে একই পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার নাও করতে হতে পারে। অধিকাংশ লোককেই কঠিন পরিশ্রম করে উপার্জন করতে হয়, কিন্তু সম্পত্তির মালিক বিনা আয়াসেই প্রচুর আয় করে থাকেন। সুতরাং একই আয়ের ভিত্তিতে এই দুই ব্যক্তির উপর একই হারে কর ধার্য করলে যার সম্পত্তি নেই, সেই লোকটির সম্পর্কে ন্যায়বিচার করা হবে না, কারণ এই অবস্থায় ওই দুই ব্যক্তির মধ্যে সমান ত্যাগ স্বীকার হওয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং যে কোনও লোকের কর-প্রদান-সামর্থ্য ঠিকভাবে মাপতে হলে কেবলমাত্র বর্তমান আয়ের মাপকাঠিই যথেষ্ট নয়। অধ্যাপক জোসিয়া স্ট্যাম্পের মতে ব্যক্তিগত আয়ের সঙ্গে আরও পাঁচটি বিষয় যদি একসঙ্গে বিচার করা হয় তবেই কর-প্রদান-সামর্থ্য মোটামুটি সঠিকভাবে মাপা হতে পারে, যেমন (১) আয় উপার্জনের সময়, (২) আয় নিয়মিত কি অনিয়মিত, (৩) আয় উপার্জনের আনুষাঙ্গিক খরচ কি পরিমাণ, (৪) আয়ের উৎস কি কি অর্থাৎ এর মধ্যে উদ্বৃত্ত অংশ (surplus element) কতটুকু এবং (৫) সব শেষে তার পারিবারিক অবস্থা। আয় উপার্জনের সময় বা কাল বিবেচনা করা এ জন্যই প্রয়োজন যে এর ওপরেই কোনও ব্যক্তির কর-প্রদান-সামর্থ্য অন্তত আংশিকভাবেও নির্ভর করে। যখন আয় উপার্জিত হয়, তখনই তা আদায় হলে এক ব্যক্তি যে পরিমাণ করভার বহন করতে পারে, ওই আয় উপার্জনের কয়েক মাস পরে যখন সে ওই টাকা খরচ করে ফেলে, তখন আর তার পক্ষে এই পরিমাণ করভার বহন করা সম্ভব নাও হতে পারে। এই কারণেই বর্তমান কালে সব রাষ্ট্রই আয়ের সঙ্গে কর প্রদান করতে থাক' (pay as you earn) নীতি মেনে চলে। আয়ের কাল বিচারের সঙ্গে সঙ্গে ওই আয় নিয়মিত কি অনিয়মিত তাও বিবেচনা করা দরকার। বর্তমান বছরে দুই ব্যক্তির আয় এক হলেও আগামী বছরের আয় সম্পর্কে যদি একজনের কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকে তবে তার কর-প্রদান-সামর্থ্য অন্য ব্যক্তির তুলনায় কম হবে। ব্যবসায়ীদের আয়ও অত্যন্ত অনিশ্চিত, এক বছর ভাল লাভ হলেও পরের বছরে প্রচুর ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং, অনেক রাষ্ট্রেরই ব্যবসায়ীদের এক বছরের লাভ থেকে পরের বা আগের বছরের ক্ষতির পরিমাণ বাদ দিয়ে আয়কর ধার্য করবার ব্যবস্থা থাকে।

আয় উপার্জনের আনুষঙ্গিক ব্যয় কত তাও বিবেচনা করা দরকার। দুই ব্যক্তি একই পরিমাণে আয় করলেও, ওই আয় করতে যদি একজনকে মোটরগাড়ি রাখতে হয় (যেমন ডাক্তারদের ক্ষেত্রে) অথবা একজন সহকারীকে নিযুক্ত করতে হয় (উকিলদের ক্ষেত্রে), তবে ওই মোটরগাড়ি রাখবার খরচ বা সহকারীর মাইনে তাঁদের মোট আয় থেকে বাদ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আয়ের উৎস কি কি এবং আয়ের মধ্যে উদ্বৃত্ত অংশ কতটুকু তাও লক্ষ্য করা দরকার। সম্পত্তি থেকে বিনা আয়াসে যে লাভ করা যায়, তার উপর অর্জিত আয় (earned income) অপেক্ষা কিছুটা উচ্চহারে

করস্থাপনা করা ন্যায়সঙ্গত। একইভাবে, আয়ের মধ্যে উদ্বৃত্ত অংশ বেশি থাকলে, ওই ব্যক্তির উপর উচ্চহারে করভার চাপানো উচিত। সর্বশেষে, করদাতার পারিবারিক অবস্থা ও দায়িত্বের কথাও মনে রেখে তাঁর কর-প্রদান-সামর্থ্যের হিসাব করতে হবে। একই আয় হওয়া সত্ত্বেও যাঁর পোষ্যসংখ্যা বেশি, বা যাঁকে সম্বলহীন বৃদ্ধ অথবা অন্ধ মা-বাবার দায়িত্ব বহন করতে হয়, তাঁর উপর বেশি উচ্চহারে কর ধার্য করা ন্যায়বিচার নয়।

উপসংহার : ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে কর-প্রদান-সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে নাগরিকদের উপর করভার চাপানো হোক— এ বিষয়ে আধুনিক যুগে অর্থনীতিবিদরা সম্পূর্ণ একমত, একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। যেহেতু কর-প্রদান-সামর্থ্যের আদর্শ ও নির্ভুল মাপকাঠি খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, সেজন্য বর্তমান যুগের অধিকাংশ রাষ্ট্র ব্যক্তিগত আয়, ভোগব্যয় বা সম্পদ— এদের যে কোনও একটির ভিত্তিতে কর-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না করে সব কটির সংমিশ্রণে এমন একটি কর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করে যা অন্যগুলির চেয়ে বেশি সন্তোষজনক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই অবস্থায় ব্যক্তিগত আয়-ভিত্তিক করের পরিপূরক হিসাবে সম্পদ কর, উত্তরাধিকার কর, ব্যয়কর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে থাকে।

১০.৬ সমানুপাতিক, ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান কর-ব্যবস্থা (Proportional, Progressive and Regressive Taxation)

অ্যাডাম স্মিথের সমতার নীতির ব্যাখ্যা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতবিরোধের প্রসঙ্গে আমরা সমানুপাতিক ও ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থার পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছি। বিভিন্ন ব্যক্তির আয়ের ভিত্তিতে কর-ভার বণ্টন সম্পর্কে এই দুই প্রকার নীতি ভিন্ন তৃতীয় একটি নীতিও আছে—তাকে বলা হয় ক্রমহ্রাসমান কর স্থাপনের নীতি। এখানে আমরা সংক্ষেপে এই তিনটি নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

করদাতাদের আয় যাই হোক না কেন, যদি প্রত্যেকের আয় থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে কর সংগ্রহ করা হয়, তাহলে তাকে সমানুপাতিক কর (Proportional Tax) বলা হয়। যেমন, করের নির্দিষ্ট হার যদি শতকরা ৫ টাকা হয়, তাহলে যাঁর আয় ১০,০০০ টাকা তিনিও যেমন শতকরা ৫ টাকা হারে কর দেবেন, যাঁর আয় একলক্ষ টাকা তিনিও ওই একই অর্থাৎ শতকরা ৫ টাকা হারেই কর দেবেন।

করদাতাদের আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি ক্রমশ বর্ধিত হারে কর আদায়ের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে তাকে ক্রমবর্ধমান কর (Progressive Tax) বলে। এই ব্যবস্থায় আয়ের পরিমাণ যত বাড়ে, করের হারও সেইরকম দ্রুত-গতিতে বেড়ে চলে। ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থা অনুসারে যাঁর বার্ষিক আয় ১০,০০০ টাকা তিনি যদি শতকরা ৫ টাকা হারে কর দেন, তাহলে যাঁর বার্ষিক আয় একলক্ষ টাকা তাঁকে শতকরা ৫ টাকার চেয়ে বেশি হারে, ধরা যাক, শতকরা ৭ বা ৮ টাকা হারে, কর দিতে হবে।

অন্যদিকে, করদাতাদের আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি ক্রমশ কম হারে কর সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে তাকে ক্রমহ্রাসমান কর (Regressive Tax) বলা হবে। এই ব্যবস্থায় ১০,০০০ টাকা বার্ষিক আয়সম্পন্ন ব্যক্তির দেয়

করের হার যদি শতকরা ৫ টাকা হয়, তাহলে যে ব্যক্তির বার্ষিক আয় একলক্ষ টাকা তাঁর উপর আরও কম হারে— শতকরা ৩ বা ৪ টাকা হারে কর ধার্য করা হবে। সুতরাং ক্রমহ্রাসমান কর ক্রমবর্ধমান করেরই ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা; এক ক্ষেত্রে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে করের হার বাড়ে, অপর পক্ষে করের হার কিছুটা কমে। ক্রমহ্রাসমান কর-ব্যবস্থায় করভারের বেশি অংশই দরিদ্র শ্রেণীর উপর পড়ে। সুতরাং ন্যায়বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিতে তা কোনও রকমেই সমর্থনযোগ্য নয়। আধুনিক রাষ্ট্রে আয়কর, ব্যয়কর, সম্পদকর, মৃত্যুকর, অতিরিক্ত মুনাফা কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর (Direct Tax) -এর ক্ষেত্রে এই নীতি কোনরকমেই গ্রহণযোগ্য নয়। (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের পার্থক্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।) তবে, রাষ্ট্র আয়বৃদ্ধি র তাগিদে নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক ভোগ্যদ্রব্যের উপরে কর বা অন্তঃশুল্ক বসালে তার ভার প্রধানত গরিবদের উপরে পড়ে, এবং সেজন্য ওই জাতীয় কর বা শুল্ককে ক্রমহ্রাসমান করের দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রত্যক্ষ কর সাধারণত ক্রমবর্ধমান নীতি অনুসরণ করে। সুতরাং যদি কোনও দেশের কর-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ করের চেয়ে পরোক্ষ কর হতে বেশি পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ হয়ে থাকে এবং পরোক্ষ কর প্রধানত নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের উপর ধার্য হয়ে থাকে, তাহলে ঐ দেশের কর-ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে ক্রমহ্রাসমান ব্যবস্থা (Regressive Tax System) বলা হবে। অনেকে মনে করেন, আমাদের দেশের বর্তমান কর-ব্যবস্থা ক্রমহ্রাসমান ব্যবস্থা এবং গরিবের স্বার্থের পরিপন্থী। এ সম্পর্কেও আমরা পরে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব।

সমানুপাতিক কর-ব্যবস্থায় কর-স্থাপনের পদ্ধতি খুবই সরল এবং প্রধান উদ্দেশ্য জাতীয় আয় বণ্টনের কাঠামোর কোনও পরিবর্তন না করা। সব করদাতাই যদি তাঁদের নিজ নিজ আয় থেকে নির্দিষ্ট একই হারে কর প্রদান করেন, তবে কর প্রদানের পরও বণ্টনের কাঠামো একই রকম থেকে যাবে। কিন্তু প্রয়োগগত সরলতা কর-ব্যবস্থার যত বড় গুণই হোক না কেন, কেবলমাত্র এই গুণের জন্য তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সমানুপাতিক করনীতির বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান অভিযোগ এই যে, এই ব্যবস্থা বর্তমান ধনবণ্টনব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নেয় এবং কোনও পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে না। কিন্তু বর্তমান যুগে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই ধনবণ্টনব্যবস্থা ন্যায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় - এ কথাই অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ বিশ্বাস করেন এবং সেজন্যই তাঁরা কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে এই বণ্টন ব্যবস্থার সংস্কারের চেষ্টা করেন। সমানুপাতিক কর এই নীতিকে কার্যকর করার ব্যাপারে কোনও সহায়তা করে না বলে তঁদের মতে এটি সমর্থনযোগ্য নয়।

ক্রমবর্ধমান কর (Progressive Taxation)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন, সমানুপাতিক কর-ব্যবস্থার মাধ্যমেই কর-ধার্যের ব্যাপারে সমতা বা ন্যায়ের নীতি মেনে চলা হয়; সুতরাং এই ব্যবস্থাই যথেষ্ট সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এই শতাব্দীর শেষ দিকেই জেভন্স, সেঞ্জার, ওয়ালরাস প্রভৃতি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ-বিধি (Lax of Diminishing Marginal Utility) পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার পরে সমানুপাতিক করের পক্ষে যুক্তিগুলি অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে (এ সম্পর্কে নীচে আলোচানা করা হয়েছে) এবং তখন থেকেই জনসাধারণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও অর্থনীতিবিদরা অনুভব করতে থাকেন, ন্যায়বিচার ও সমতার আদর্শকে যদি সত্যই রূপদান করতে হয়, তাহলে ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই সময় থেকেই ক্রমবর্ধমান কর নীতির সমর্থনে বহু তত্ত্বগত যুক্তি বেশ দৃঢ় ভিত্তির উপরেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই যুক্তিগুলি যে অকাট্য ও সম্পূর্ণ নির্ভুল তা হয়তো বলা চলে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের চাপে তাত্ত্বিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য না হলেও, এই ক্রমবর্ধমান কর নীতি ধীরে ধীরে

পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই গৃহীত হয়েছে। এই নীতির সমর্থনে যেসব তাত্ত্বিক যুক্তি উপস্থাপিত করা হয় নীচে সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

প্রথমত, ক্রমবর্ধমান কর কর-প্রদান-সমার্থ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যে কোনও ব্যক্তির অয়বৃদ্ধির সঙ্গে তার কর-প্রদান-সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়। অল্প আয়ের ক্ষেত্রে কর-প্রদান-সামর্থ্য ও আয় মোটামুটি একই অনুপাতে বাড়তে থাকে, কিন্তু উচ্চ আয়ের স্তরে কর-প্রদান-সামর্থ্যের বৃদ্ধি আয়ের অনুপাতের চেয়ে অনেক বেশি। যেহেতু, উচ্চ আয় স্তরে কর প্রদান - সামর্থ্যের বৃদ্ধি খুব দ্রুতগতিতে হয়, সেজন্য উচ্চ-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর করের ভার আয়ের একই নির্দিষ্ট অনুপাতে না হয়ে আরও বেশি হওয়াই ন্যায় ও নীতির দৃষ্টিভঙ্গিতে বাঞ্ছনীয় এবং সমর্থনযোগ্য। ক্রমবর্ধমান করের সমর্থনে সম্ভবত এটাই সবচেয়ে জোরালো যুক্তি।

দ্বিতীয়ত, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্বের দিক থেকেও ক্রমবর্ধমান কর নীতি সমর্থনযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। অন্যান্য জিনিসের মতো টাকার ক্ষেত্রেও দেখা যায় ব্যক্তির হাতে টাকার পরিমাণ যত বাড়তে থাকে, তার প্রান্তিক উপযোগিতাও তত কমে। যে ব্যক্তির ১০০ টাকা আয়, তার কাছ থেকে শেষ টাকাটি কর হিসাবে সংগ্রহ করা হলে যে পরিমাণে তার তৃপ্তি কমে যায়, তার চেয়ে যার আয় ১০০০ টাকা তার আয় থেকে শেষ টাকাটি কর হিসাবে নিয়ে নিলে তার তৃপ্তি-হ্রাস অনেক কম পরিমাণে হবে। শুধু তাই নয়, ১০০০ টাকা আয় হতে ১০ টাকা নিলেও দুজনের ত্যাগস্বীকারে সমতা আসে না, কারণ ১০০ টাকার আয়ে ১ টাকার যতটা গুরুত্ব, ১০০০ টাকার আয়ে ১০ টাকার (শতকরা ১ টাকা হিসাবের ভিত্তিতে) গুরুত্ব তার চেয়ে অনেক কম। সুতরাং ত্যাগস্বীকারে সমতা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ১০০০ টাকা আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর শতকরা ১ টাকার চেয়ে কিছু বেশি হারে—ধরা যাক, শতকরা ৩ টাকা হারে — কর বসাতে হবে এবং এই ব্যবস্থাই ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থা। সুতরাং ন্যায় ও অন্যায়ের প্রশ্ন বাদ দিলেও, ক্রমহ্রাসমান উপযোগবিধি অনুসারেও এই ব্যবস্থা সমর্থন ও গ্রহণযোগ্য।

তৃতীয়ত, অধ্যাপক মার্শাল ক্রমবর্ধমান কর নীতিকে বর্তমান ধনবণ্টনব্যবস্থার সংস্কারসাধনের একটি শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ধন-বণ্টনে বৈষম্য দেখা যায়। এই বৈষম্য থাকতে বা বাড়তে দেওয়া উচিত নয়; যে করস্থাপন নীতির সাহায্যে এই বৈষম্য কিছুটা কমানো যায় বা দূর করা যায়, তা সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। ধনীদের উপর অত্যন্ত উচ্চহারে ও গরিবদের উপরে বেশ কিছুটা স্বল্পহারে কর ধার্য করে ক্রমবর্ধমান কর নীতি এই উদ্দেশ্যসাধনে বিশেষভাবে সহায়তা করে, সুতরাং তিনি এই ব্যবস্থার পক্ষপাতী।

চতুর্থত, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদ হবসন ভিন্ন এক ধরনের যুক্তির সাহায্যে ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থা সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের মধ্যে দুটি উপাদান আছে— একটি ব্যয়-উপাদান (cost element), অন্যটি উদ্বৃত্ত-উপাদান (surplus element)। ব্যয়-উপাদানের উপর কর বসানো ঠিক নয়, কারণ তাতে আয়ের একটি বড় অংশই নষ্ট হবার সম্ভাবনা। তাই সব করের উদ্দেশ্যই হল, আয়েব ওই উদ্বৃত্ত-উপাদান থেকেই যতটা সম্ভব সংগ্রহ করা। গরিবদের আয়ের অধিকাংশই ব্যয়-উপাদান, তার মধ্যে উদ্বৃত্ত-উপাদান যৎসামান্য। কিন্তু ধনীদের আয়ের মধ্যে ব্যয়-উপাদান সামান্য, উদ্বৃত্ত-উপাদানই প্রধান। সুতরাং গরিবদের তুলনায় ধনীদের ওপর অনেক উচ্চহারে কর স্থাপনা করলেও, তাঁরা ধার্য কর আয়ের উদ্বৃত্ত-উপাদান থেকেই দিতে পারবে। অতএব করস্থাপন ব্যাপারে এই নীতিটিই অনুসরণ করা উচিত ও যুক্তিসংগত।

অধ্যাপক পিগু ক্রমবর্ধমান কর নীতিকে সর্বনিম্ন সামগ্রিক ত্যাগের তত্ত্ব (Least Aggregate Sacrifice Theory) ও সমত্যাগের তত্ত্ব (Equal Sacrifice Theory)— এই উভয় তত্ত্বের ভিত্তিতেই সমর্থন করেছেন। ক্রমবর্ধমান হারে করধার্য না করলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ত্যাগস্বীকারে সমতা আনা যায় না, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। সর্বনিম্ন সামগ্রিক ত্যাগের তত্ত্ব অনুযায়ী, বিশেষ একটা স্তরের ঊর্ধ্বে উচ্চ আয়ের সবটাই রাষ্ট্রের কর হিসাবে আদায় করে নেওয়া উচিত। তাতেই সমাজের সামগ্রিক ত্যাগ সবচেয়ে কম হবে এবং বেশ কিছুসংখ্যক গরিব ব্যক্তিকে কর থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব হবে। বণ্টনের দিক থেকে এই চরম নীতি ভাল হলেও, এর ফলে কর্মোদ্যম, সঞ্চয় ও মূলধন গঠন ব্যাহত হয়ে শেষ পর্যন্ত জাতীয় আয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যেতে পারে। সুতরাং কর ধার্যের ব্যাপারে এই জাতীয় চরম নীতি অবলম্বন না করে মধ্যপন্থা গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থাই সেই মধ্যপন্থা।

সব শেষে উল্লেখ করা যায়, লর্ড কেইনস প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদরা দেশের পূর্ণ কর্মসংস্থান স্থাপনে ও সংরক্ষণে ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে বলে মনে করেন এবং সেজন্য এই ব্যবস্থা সমর্থন করেন। তাঁদের মতে, পূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন সমাজের ভোগ-প্রবণতা বৃদ্ধি অথবা বিনিয়োগ বৃদ্ধি। ভোগ-প্রবণতা আবার প্রধানত নির্ভর করে বণ্টন-ব্যবস্থার উপর। ধনীদের চেয়ে গরিবদের ভোগ-প্রবণতা অনেক বেশি। সুতরাং ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনীদের উপর অত্যন্ত উচ্চহারে কর ধার্য করে সংগৃহীত রাজস্ব গরিব শ্রেণীর হাতে তুলে দিলে, সমাজের সামগ্রিক ভোগব্যয় বাড়বে ও অর্থনীতি পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌঁছাতে পারবে। কেইনসের নিজের ভাষায় বলা যায় : "পূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন উচ্চহারের প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা। ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থা নীচু হারের ভোগ-প্রবণতাসম্পন্ন ধনীদের কাছ থেকে উচ্চহারের ভোগ-প্রবণতাসম্পন্ন গরিবদের হাতে সম্পদ স্থানান্তর করে বলেই এই ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য।"

ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থার পক্ষে যে যুক্তিগুলি এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাদের অধিকাংশের বিরুদ্ধেই কিন্তু সমালোচনা করা চলে। আধুনিক অর্থনীতিবিদদের একাংশ অর্থের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার তত্ত্ব — যা ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি— মানেন না। তাঁরা মনে করেন, ব্যক্তির আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সব ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে অর্থের উপযোগিতা কমে যায় না। কোনও কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনবোধ বা অভাববোধ আরও তীব্র হয়ে ওঠে, অনেক রকম অনুপূরক জিনিসের (complimentary goods) চাহিদাও বেড়ে যায়। যেমন, যাঁর গাড়ি আছে, তাঁর আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি তৈরির প্রয়োজনবোধ আরও তীব্র হয়ে ওঠে; যাঁর শহরে একখানি বাড়ি আছে, তিনি গ্রামাঞ্চলে বা শহরতলিতে আর একখানি বাড়ি কেনার জন্য প্রবলভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এইসব লোকের ক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা ক্রমশ কমতে থাকে না; তাঁদের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান আয় ক্রমবর্ধমান উপযোগিতা এনে দেয়। সমাজে এই ধরনের মনোভাবসম্পন্ন লোকের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে— সুতরাং অর্থের ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার তত্ত্ব আর নির্ভুল হিসাবে গ্রহণ করা চলে না এবং তার উপর ভিত্তি করে যে ক্রমবর্ধমান কর নীতি গড়ে উঠেছে, তাও আর সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা চলে না। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, বিভিন্ন আয়স্তরে ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থায় করের হার নির্ধারিত হয় কর-প্রশাসকদের খেয়ালখুশির দ্বারা, তাঁদের মর্জি-মাফিক। এই অবস্থা কিছুতেই যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা যায় না। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ম্যাককুলাক তাই বলেছেন, "যে মুহূর্তে তুমি করদাতাদের কাছ থেকে তাদের আয় বা সম্পত্তির উপরে একই অনুপাতে কর সংগ্রহের অতি মূল্যবান নীতি পরিত্যাগ

করবে, তার পরমুহূর্তেই তোমার অবস্থা হবে গভীর সমুদ্রে হাল ও দিগদর্শনযন্ত্রবিহীন নাবিকের মতো এবং তখন তোমার পক্ষে যে কোনও মারাত্মক অন্যায় বা ভুল করা অসম্ভব নয়।"

দ্বিতীয়ত, হবসনের যুক্তির সম্পর্কে বলা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের মধ্যে ব্যয় ও উদ্বৃত্ত যে দুটি উপাদানের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তা একেবারেই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। রাষ্ট্রের পক্ষে কর ধার্যের সময় এই পার্থক্য খুঁজে বের করা এবং প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের মধ্যে কোন্ উপাদান কতটা অংশ অধিকার করে আছে, তার সঠিক মাপ করে সেই অনুসারে তার কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা, একেবারেই অসম্ভব ও অবাস্তব ব্যাপার।

তৃতীয়ত, মার্শাল ও পিগুর যুক্তিগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায়, এগুলি ন্যায়-অন্যায়বোধ ও নিজস্ব মনগড়া নীতিবোধের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হিসাবে অর্থনীতিশাস্ত্রে 'উচিত-অনুচিতে'র বিশ্লেষণ একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কি উচিত, কি অনুচিত, তার কোনও সর্বজনগ্রাহ্য মাপকাঠি নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন উত্থাপন না করাই সংগত।

কিন্তু এসব ত্রুটি ও অসুবিধা সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থা আধুনিক যুগে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শুধু যে জনমতের প্রবল চাপ ও সমর্থনই এই নীতিকে গ্রহণযোগ্য করে তুলছে, তা নয়। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থা সঞ্চয় ও মূলধন গঠনে কোনও বাধা সৃষ্টি করেনি, উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাজও ব্যাহত করেনি। উপরন্তু কেইন্স প্রমুখ অর্থনীতিবিদরা যেমন বলেছেন, এই ব্যবস্থা কর্মসংস্থান, জাতীয় আয় ও মূল্যস্তরের স্থিতিকরণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

করঘাত, কর-সঞ্চালন ও করপাত (Impact, Shifting & Incidencce of Taxes)

কর-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এগুলি হল করঘাত (Impact), কর-সঞ্চালন (Shifting) ও করপাত (Incidence)। কোনও কর ধার্য করা হলে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর তা ধার্য করা হল এবং যাঁর বা যাঁদের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ তা আদায় করেন, করের প্রথম আঘাত তাঁর বা তাঁদের ওপর পড়েছে এ কথা বলা যেতে পারে। সুতরাং করের প্রথম আঘাত বা করঘাত বহন করেন সেই ব্যক্তি, যাঁর উপর কর ধার্য হয়েছে এবং যিনি আইনত ওই কর দিতে বাধ্য।

কর-প্রদান-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও করভার সহজে কেউ বহন করতে চান না। সুতরাং করঘাত হওয়া মাত্র যে ব্যক্তির উপর করঘাত হয়েছে, তিনি নিজে ওই ভার বহন না করে অপর কোনও ব্যক্তির উপর সেটি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। এইভাবে একজনের ওপর আরোপিত করের ভার অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াকে বলা হয় কর-সঞ্চালন (shifting of taxes)। কর-সঞ্চালনের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট: করের ভার নিজের ঘাড় থেকে সরিয়ে অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। সুতরাং করঘাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর-সঞ্চালন শুরু হয়ে যায়। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপারটি সহজে বোঝা যাবে। মনে করা যাক, কোনও ভোগ্য-দ্রব্যের উৎপাদনের উপর একটি নতুন কর বা উৎপাদন-শুল্ক ধার্য করা হল। করটি বসানো হয়েছে ঐ জিনিসটির উৎপাদকের উপর, তিনিই ওই কর সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে বাধ্য। সুতরাং এক্ষেত্রে করঘাত ওই উৎপাদকের ওপর। করঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদক চেষ্টা শুরু করলেন, ওই করের ভার নিজের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে। অর্থাৎ, কর-রাজস্ব তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিলেও,

সেটি যেন প্রকৃতপক্ষে তাঁর পকেট থেকে না এসে অপর কোনও ব্যক্তির পকেট থেকে আসে। এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল না হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তত আংশিকভাবে সফল হয়ে থাকে এবং এই প্রচেষ্টাকেই কর-সঞ্চালন বলে।

কর-সঞ্চালন বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে। ভোগ্যদ্রব্যের উপর কর বসানো হলে উৎপাদক জিনিসটির দাম করের পরিমাণ অনুযায়ী বাড়িয়ে দিয়ে কর-ভার ক্রেতার ওপর দিতে পারেন অথবা দাম একই রেখে জিনিসটির গুণ বা উৎকর্ষ বা পরিমাণ আগের তুলনায় কমিয়ে দিয়েও কর-ভার ক্রেতাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন। জিনিসের দাম না বাড়িয়ে জিনিসটির পরিমাণ বা উৎকর্ষ কমিয়ে দিয়ে যে কর-সঞ্চালন করা হয় তাকে লুক্কায়িত কর-সঞ্চালন (concealed shifting) বলা যেতে পারে।

আবার কর-সঞ্চালন অগ্রমুখী (Forward shifting) বা পশ্চাৎমুখী (Backward shifting) হতে পারে। উৎপাদকের ওপর ধার্য কর মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রেতাদের উপর সরিয়ে দেওয়াকে অগ্রমুখী কর-সঞ্চালন বলা চলে। অপরপক্ষে, উৎপাদক কাঁচামাল সরবরাহকারীদের ওপর চাপ দিয়ে কম দামে কাঁচামাল সরবরাহে তাদের বাধ্য করতে পারলে, ওই ব্যবস্থাকে পশ্চাৎমুখী কর-সঞ্চালন বলা হয়।

কর-সঞ্চালন কিন্তু অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে পারে না। করঘাতের পর শুরু হল কর-সঞ্চালন এবং কিছুকাল ধরে তা চলার পরে এমন এক অবস্থায় পৌঁছানো গেল, যখন কর-সঞ্চালন আর সম্ভব নয়। কর-সঞ্চালন শেষ হয়ে গেল তখন বোঝা যায়, করের সমস্ত ভার প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত কার ঘাড়ে এসে পড়ল। করের প্রকৃত ভার শেষ পর্যন্ত যাঁর উপর এসে পড়ে, করঘাত তাঁরই ওপর হয়েছে, এ কথা বলা যায়। এখন বোঝা গেল, কর-সঞ্চালন আরম্ভ হয় করঘাতের পর এবং শেষ হয় কর-পাতে।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়— তা হল কর-সঞ্চালন এবং কৌশলে করভার এড়ানো (tax shifting and tax evasion), এই দুয়ের পার্থক্য। কর-সঞ্চালন আইনবিরুদ্ধ বা আইনবহির্ভূত কাজ নয়; যাঁর উপর করঘাত হয়েছে, তিনিই তাঁর আইনগত দায়িত্ব পালন করে ওই কর রাজকোষে জমা দেন। পরে তিনি তাঁর অর্থনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার করে সকলের জ্ঞাতসারেই ওই করের ভার অপরের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কৌশলে কর-ভার এড়ানো ব্যাপারটি কিন্তু একেবারেই আইনবিরুদ্ধ কাজ। এক্ষেত্রে যার উপর করঘাত হয়েছে, তিনি নানাপ্রকার অসদুপায় অবলম্বন করে ও কর না দিয়ে রাষ্ট্রকে ফাঁকি দেন। ফাঁকি দিয়ে কর-ভার এড়ানো শুধু আইনবিরুদ্ধ কাজ নয়, এটি সমাজ-বিরোধী ও নীতিবিরুদ্ধ কাজও বটে।

করপাত (Incidence of tax) এবং করের ফলাফলের (Effect of tax) মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য আছে। যেমন, কোন উৎপাদক যদি উৎপন্ন ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়ে নতুন করের ভার ক্রেতাদের ওপর চাপিয়ে দেন, তাহলে ওই উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রি কিছুটা কমে যাওয়ায় তাঁর নিজের, শ্রমিকদের বা কাঁচামাল সরবরাহকারীদের আয়, ব্যয়, সঞ্চয় সবই কিছু না কিছু কমবে। এগুলো সবই ওই করের ফলাফল। করপাত বলতে কিন্তু এই ধরনের ফলাফল বোঝায় না। সর্বশেষ স্তরে করের আর্থিক ভার কার ওপর পড়ছে, করপাত কেবলমাত্র তাই নির্ধারণ করে। করের আর কোন ফলাফলের সঙ্গে করপাতের কোন সম্পর্ক নেই।

১০.৭ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর এবং তাদের গুণাগুণ (Direct and Indirect Taxes : Merits and Demerits)

বহু ক্ষেত্রেই করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির উপর না হওয়ায় প্রচলিত করগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে : প্রত্যক্ষ কর (Direct tax) ও পরোক্ষ কর (Indirect tax) । যে ব্যক্তির ওপর কর ধার্য করা হয়েছে, যদি শেষ পর্যন্ত তাকেই করের আর্থিক ভার বহন করতে হয়, তাহলে এই শ্রেণীর করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়। আয়কর এই শ্রেণীর সর্বপ্রধান দৃষ্টান্ত। আয়কর যে ব্যক্তির উপর ধার্য করা হয়, সাধারণত তাকেই ওই কর-ভার বহন করেত হয়। অর্থাৎ, যে করের ক্ষেত্রে করঘাত (impact) ও করপাত (incidence) একই ব্যক্তির ওপর সেগুলি প্রত্যক্ষ কর। অপরপক্ষে, যার ওপর কর ধার্য হয়েছে এবং যে সরকারি তহবিলে ওই টাকা জমা দিতে বাধ্য, সে ব্যক্তি যদি কোন প্রকারে কর-সঞ্চালনে সফল হয় এবং শেষ পর্যন্ত করের আর্থিক ভার নিজের ওপর হতে সরিয়ে অপর কোন ব্যক্তির ওপরে ফেলতে পারে, তাহলে ওই করকে পরোক্ষ কর বলা হবে। বিক্রয় কর, উৎপাদন কর, আমদানি শুল্ক প্রভৃতি ব্যবহার্য জিনিসপত্রের উপর চাপানো করগুলি (commodity taxes) পরোক্ষ করের উদাহরণ। এগুলি উৎপাদক, বিক্রেতা বা আমদানি-কারকের উপর ধার্য করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্রেতাদেরই এইসব করের বা শুল্কের ভার বহন করতে হয়, পরোক্ষ কর এই কারণে প্রত্যক্ষ করের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। এদের ক্ষেত্রে করঘাত ও করপাত আলাদা আলাদা ব্যক্তির ওপর।

প্রত্যক্ষ করের সর্বপ্রধান সুবিধা: (১) এই কর ক্রমবর্ধমান হারে ধার্য করা যায়, করদাতার কর - প্রদান-সামর্থ্যের ভিত্তিতে তার কাছ থেকে এই কর আদায় করা সম্ভবপর। সুতরাং এই কর সামর্থ্যের নীতি বা সমতার নীতি অনুসরণ করে। (২) প্রত্যক্ষ কর অ্যাডাম স্মিথের অন্য দুটি প্রধান নীতি— নিশ্চয়তার ও ব্যয়-সংক্ষেপের নীতি — মেনে চলে। এই ব্যবস্থায় করদাতা সঠিকভাবে জানেন, তাঁকে কি পরিমাণ কর কখন দিতে হবে। রাষ্ট্রও জানে, কর থেকে কখন কি পরিমাণ রাজস্ব সংগৃহীত হবে। (৩) প্রত্যক্ষ কর উৎস-স্থানে আদায় হয় বলে করদাতাদের কেউ কেউ অসাধু হলেও ফাঁকি দিতে পারে না। ফলে এই করের উৎপাদনশীলতাও সাধারণত অনেক বেশি হয়ে থাকে। (৪) প্রত্যক্ষ করের স্থিতিস্থাপকতা যথেষ্ট বেশি। করের হার সামান্য বাড়ালেও রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করা যেতে পারে। (৫) প্রত্যক্ষ কর-ব্যবস্থায় করদাতা রাষ্ট্রীয় ব্যয় সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়ে ওঠে, নাগরিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কেও অনেক বেশি সজাগ হয়ে ওঠে। সু-নাগরিকের এই গুণগুলি জনসাধারণের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করে বলেও প্রত্যক্ষ কর-ব্যবস্থার প্রচলন বর্তমান কালে অত্যন্ত বেশি।

প্রত্যক্ষ করের কিছু অসুবিধাও আছে : (১) এই ব্যবস্থা করদাতাদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক ও সেজন্য অপ্রিয়। এই করের চাপ সরাসরি পড়ে বলে এর ভার অন্যান্য করের তুলনায় বেশি বলে মনে হয়। করদাতাদের ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ ও উৎস প্রকাশ করতে হয়, এটা অনেকেই পছন্দ করেন না। সারা বছর ধরে অল্প অল্প পরিমাণে আয় করে বছরের শেষে হঠাৎ একসঙ্গে সমস্ত করের টাকা দেওয়া অধিকাংশ লোকের পক্ষেই কষ্টকর। (২) প্রত্যক্ষ করকে বলা হয় সাধুতার ওপর কর (tax on honesty), কারণ এই ব্যবস্থায় বছরের শেষে করদাতা আয়ের যে হিসাব দাখিল করেন, তার ভিত্তিতেই তাঁর কাছ থেকে কর আদায় করা হয়। ইচ্ছা করলেই ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ থাকায়,

এই ব্যবস্থায় লোকের কর ফাঁকি দেওয়ার ও অসাধুতা অবলম্বনের প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। (৩) প্রত্যক্ষ কর সাধারণত ক্রমবর্ধমান হারে ধার্য হয়ে থাকে। বিভিন্ন আয়স্তরে ধার্য ক্রমবর্ধমান করহার নির্ধারণের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকায় এটি নির্ভর করে কর-পরিচালকদের খেয়ালখুশির ওপর— এই ধরনের ব্যবস্থা কখনই সন্তোষজনক হতে পারে না। (৪) উচ্চ-আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর উচ্চহারে আরোপিত হয় বলে প্রত্যক্ষ কর করদাতাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও কর্মোদ্যম কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ বাড়তি আয়ের অধিকাংশই যদি কর দিতে চলে যায় তাহলে অতিরিক্ত রোজগারের উদ্যম কমে যেতে বাধ্য। আবার বাড়তি আয় থেকে উচ্চবিত্ত মানুষেরা যা সঞ্চয় করতে পারতেন, তা আর ঘটে ওঠে না। ফলে লগ্নির পরিমাণও কমে যায়। এটাও জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর।

পরোক্ষ করের প্রধান সুবিধা : (১) ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই এই কর দিতে হয় বলে কর-ব্যবস্থার ভিত্তি অত্যন্ত প্রশস্ত (broadbased) হয়ে থাকে। দরিদ্র শ্রেণীর উপর প্রত্যক্ষ কর বসানো যায় না, কারণ ওই করের সংগ্রহ ব্যয় অত্যধিক হয়ে পড়ে। পরোক্ষ কর এই সমস্যার সহজ সমাধান করতে পারে। (২) পরোক্ষ কর জিনিসপত্রের দামের সঙ্গে মিশে যায় ও অল্প অল্প পরিমাণে এই কর লোককে দিতে হয় বলে এর কর-ভার লোকে ততটা অনুভব করতে পারেনা। সুতরাং জাতীয় অর্থনীতির উপর পরোক্ষ কর সংগ্রহের কোন ক্ষতিকর ফলাফল দেখা যায় না। (৩) মাদক দ্রব্য ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী অনেক জিনিসের ব্যবহার উচ্চাহারে পরোক্ষ করের মাধ্যমে কমিয়ে দিয়ে সমাজ-সংস্কারের কাজে একে নিয়োগ করা যায়। (৪) পরোক্ষ কর সাধারণত ভোগ্যদ্রব্যের ওপর বসানো হয় এবং ওই সকল জিনিস বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংগৃহীত হয় বলে এই কর ফাঁকি দেবার কোনও উপায় থাকে না। (৫) এই কর উৎপাদনশীলতা ও স্থিতিস্থাপকতার নীতিও অনুসরণ করে চলে। কর-হার বাড়ালে বা আরও বেশিসংখ্যক জিনিস করের আওতার মধ্যে আনলে আপনা থেকেই কর-রাজস্ব বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু এইসব গুণ থাকা সত্ত্বেও পরোক্ষ কর প্রধানত ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে আপত্তিজনক বলে বিবেচিত হয়। নিত্যব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ওপর সাধারণত পরোক্ষ কর বসানো হয়। ধনী ও দরিদ্রের কর-প্রদান-সামর্থ্য এক নয়; সুতরাং একই হারে সকলের ওপর ধার্য করলে তা ক্রমহ্রাসমান কর-ব্যবস্থা হতে বাধ্য এবং আমরা আগেই দেখেছি, ক্রমহ্রাসমান কর-ব্যবস্থা ন্যায়বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিতে অত্যন্ত আপত্তিজনক। দ্বিতীয়ত, পরোক্ষ করের আর-এক অসুবিধা ওর অনিশ্চয়তা। কি পরিমাণ রাজস্ব এই জাতীয় কর থেকে সংগৃহীত হবে, তার সঠিক হিসাব করা কোনমতেই সম্ভব নয়, কারণ এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার। তৃতীয়ত, পরোক্ষ কর সংগ্রহের শাসনতান্ত্রিক ব্যয়ও সাধারণত অত্যন্ত বেশি। সুতরাং সব খরচ মেটানোর পর এই কর থেকে যেটুকু রাজস্ব লাভ করা যায় তার পরিমাণ আশানুরূপ না হবারই সম্ভাবনা।

উপসংহারে বলা যায়, ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ কর বেশি গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এবং এর উল্লেখযোগ্য অন্যান্য সুবিধার জন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এর ব্যাপক প্রচলন সত্ত্বেও, আধুনিক রাষ্ট্রের আর্থিক প্রয়োজন এতই বিশাল যে এই দুই ধরনের করই ধার্য করা না হলে, সেই প্রয়োজন মেটানো যায় না। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের বিচক্ষণ সংমিশ্রণে যে কর-ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রে গড়ে উঠেছে, সেটাই সবচেয়ে সন্তোষজনক ব্যবস্থা বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১০.৮ কর-বহন ক্ষমতা (Taxable Capacity)

জনকল্যাণকর আধুনিক রাষ্ট্রের আর্থিক প্রয়োজন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এবং এই ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তাগিদে আরও বেশি পরিমাণে কর সংগ্রহ করাও রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু কর-রাজস্বের পরিমাণ ইচ্ছামত যত খুশি বাড়ানো রাষ্ট্রের পক্ষেও সম্ভবপর নয়। সর্বোচ্চ কি পরিমাণ কর-রাজস্ব সংগৃহীত হতে পারে তা নির্ভর করে দেশের কর-বহন ক্ষমতার উপর।

কোনও নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের জনসাধারণ মোট যে পরিমাণ কর-ভার বহন করতে সক্ষম, সেটাই ওই দেশের কর-বহন ক্ষমতা। স্যার জোশিয়া স্টাম্পের মতে, "দেশের মোট উৎপাদন থেকে অস্তিত্ব বজায় রাখার স্তরে জনসাধারণকে বেঁচে থাকতে হলে যে টাকার প্রয়োজন, তা বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, সেটাই ঐ দেশের কর-বহন ক্ষমতা"। কিন্তু এই সংজ্ঞা অনুযায়ী বাস্তবক্ষেত্রে কর-বহন ক্ষমতার মাপ করতে বেশ কিছুটা অসুবিধা হয়, কারণ অস্তিত্ব রক্ষার স্তর কি, কোথায় এটি নির্দিষ্ট করা হবে অথবা এই স্তর বজায় রাখতে গেলে কি পরিমাণ টাকা খরচ করা প্রয়োজন—এগুলি স্থির করার কোনও নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। আরও অসুবিধা, এই উদ্বৃত্তের সবটুকুই যদি রাষ্ট্র বর্তমান কর হিসাবে আদায় করে নেয়, তাহলে মূলধন গঠনের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না; ফলে জাতির ভবিষ্যত উৎপাদন-ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ কর-বহন ক্ষমতা স্বভাবতই কমে যাবে।

সুতরাং, অধিকতর সন্তোষজনক বিকল্প একটি সংজ্ঞা অনুসারে বলা যেতে পারে, দেশের মোট উৎপাদন বা মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন অক্ষুণ্ণ এবং জনসাধারণের দক্ষতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, সেটাই দেশের কর-বহন ক্ষমতা। কিন্তু এর মধ্যেও রয়েছে যথেষ্ট অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তা; কারণ মূলধন অক্ষুণ্ণ ও জনসাধারণের দক্ষতা বজায় রাখার জন্য কি পরিমাণ টাকা প্রয়োজন, তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করবার কোনও মাপকাঠি নেই। দ্বিতীয়ত জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বজায় রাখতে হলে মূলধন শুধু অক্ষুণ্ণ রাখলেই চলবে না— ক্রমশ বাড়াতে হবে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মূলধন ও দক্ষতা অক্ষুণ্ণ রেখে জাতীয় আয়ের অবশিষ্ট অংশের সবটুকুই কর হিসাবে তুলে নিলে, মূলধন বৃদ্ধির আর কোনও উপায় থাকবে না।

ভবিষ্যৎ জাতীয় আয়, উৎপাদনের পরিমাণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বজায় রাখার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে অপর একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কিন্ডলে সিরাম এই জন্য বলেছেন, "জীবনযাত্রার মান অপরিবর্তিত রেখে ভবিষ্যতে একই পরিমাণ উৎপাদন করতে যে ন্যূনতম ভোগব্যয় প্রয়োজন, তা বর্তমান মোট উৎপাদন থেকে বাদ দিলে যে উদ্বৃত্ত থাকেই, সেটাই ওই দেশের কর-বহন ক্ষমতা।" কিন্তু ডালটনের মতে এই সংজ্ঞাটিও অন্য সংজ্ঞাগুলির চেয়ে কোনও অংশে বেশি সন্তোষজনক নয়। এগুলির মধ্যে যেসব দোষত্রুটি, অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তা আছে, সিরামের সংজ্ঞাটিও তার থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, 'কর-বহন ক্ষমতা ধারণাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে, চূড়ান্ত কর-বহন ক্ষমতা বলে কিছু নেই এবং রাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় একে কোনও স্থান দেওয়া চলে না।"

কর-বহন ক্ষমতার সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং এ ব্যাপারে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতৈক্য নেই। অথচ আশ্চর্যের কথা, কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর কর-বহন ক্ষমতা নির্ভর করে সে সম্পর্কে এঁরা মোটামুটিভাবে একমত। নীচে এগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

(১) জনগণের মনোভাব (Psychology of people)

জনগণের মনোভাবের উপর কর-বহন ক্ষমতা অনেকখানি নির্ভর করে। যুদ্ধ বা জাতীয় সংকটের সময় জনসাধারণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য যে কোনও ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হন। ফলে, সাময়িকভাবে কর-বহন ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়।

(২) মাথাপিছু আয় (Per Capita Income)

জনসাধারণের মাথাপিছু আয় যে দেশে যত বেশি, স্বভাবতই সামগ্রিকভাবে সে দেশের কর-বহন ক্ষমতা অনেকটা বেড়ে যায়।

(৩) জাতীয় আয়ের বন্টন (Distribution of National Income)

কর-বহন ক্ষমতা নির্ধারণে মাথাপিছু আয় বা মোট জাতীয় আয়ের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে জাতীয় আয়ের বন্টন। এই আয় বন্টনে যত বৈষম্য থাকবে, কর-বহনের ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং সুষম বণ্টন-ব্যবস্থা ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে যতই বাঞ্ছনীয় হোক, কর-বহন ক্ষমতা তার ফলে কিছুটা কমে যায়।

(৪) জীবনযাত্রার মান (Standard of Living)

জীবনযাত্রার মানের উপরও কর-বহন ক্ষমতা অনেকটা নির্ভরশীল, কোনও দেশে জীবনযাত্রার মান যদি বেশ উন্নত হয়, তাহলে জাতীয় উৎপাদন থেকে ভোগব্যয় বাবদ বেশি পরিমাণ অর্থ বাদ দিতে হবে; ফলে দেশের কর-বহন ক্ষমতাও কমে যাবে।

(৫) শিল্প-সংগঠনের প্রকৃতি (Nature of Industrial Organisation)

দেশ যদি শিল্পে অনুন্নত হয় এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত শিল্পগঠনে আগ্রহী হয়, তাহলে মূলধন গঠনের হার বাড়াতে হবে। ফলে, জাতীয় কর-বহন ক্ষমতাও কিছুটা কমে যাবে।

(৬) কর-ব্যবস্থার প্রকৃতি (Nature of Tax System)

দেশের কর-কাঠামোতে পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের উপর বেশি গুরুত্ব দিলে, দেশের কর- বহন ক্ষমতা যথেষ্ট বাড়বে, কারণ কর সংগ্রহের খরচ কম।

(৭) রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতি (Nature of Public Expenditure)

রাষ্ট্র যদি কর-রাজস্ব, শিক্ষাপ্রসার, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই দেশের করবহন ক্ষমতা অবশ্যই বাড়বে।

কর-বহন ক্ষমতার সন্তোষজনক সংজ্ঞা যেমন নেই, তেমনই জাতীয় আয়ের কি পরিমাণ অংশ কর হিসাবে রাষ্ট্র সংগ্রহ করতে পারে, সে বিষয়েও মতের ঐক্য নেই। তবে আধুনিক কালে জাতীয় আয়ের ওঠা-পড়ার পরিসংখ্যান বিচার করে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কলিন ক্লার্ক বলেছেন, জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত জনগণের কর-বহনের ক্ষমতা থাকতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, সব অবস্থায় সব রাষ্ট্রই জাতীয় আয়ের ২৫ শতাংশ কর আদায়ে সফল হবে। বরং এই রাশিটি কর আদায়ের একটি গ্রহণযোগ্য ঊর্ধ্বসীমারূপে বিবেচনা করা যায়।

১০.৯ অনুশীলনী

(১) কর-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(২) বিভিন্ন কর তত্ত্বের মধ্যে কোন্‌টি আপনি সমর্থন করেন এবং কেন?

(৩) ক্রম-বর্ধমান কর-ব্যবস্থার মূল বক্তব্য কি এবং কি কারণে এটি সারা পৃথিবীতে চালু হয়েছে।

(৪) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের গুণাগুণ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা, তা সংক্ষেপে জানান।

(৫) কর-বহন ক্ষমতা নির্ভর করে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর, সংক্ষেপে এ বিষয়ে আলোচনা করুন।

১০.১০ গ্রন্থপঞ্জি

1. Taylor — Public Finance
2. Due— Government Finance
3. Bhattacharya, Mohit— New Horizons of Public Administration
4. রায়চৌধুরী, সুনীল—রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি

একক ১১ ☐ রাষ্ট্রীয় ব্যয়

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য
১১.২ প্রস্তাবনা
১১.৩ রাষ্ট্রীয় ব্যয়বৃদ্ধির কারণ
১১.৪ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ
১১.৫ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলাফল
১১.৬ পরিপূরক ব্যয়
১১.৭ অনুশীলনী
১১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল, রাষ্ট্রীয় ব্যয় ও সে সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যাগুলি নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা। এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধি র কারণ
- রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ
- রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলাফল
- পরিপূরক ব্যয় সম্পর্কে কিছু তত্ত্ব

১১.২ প্রস্তাবনা

আমরা আগেই বলেছি, একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের (আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশই আবার এই শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে) কাজের পরিধি বিশাল এবং উত্তরোত্তর সেই পরিধি বেড়েই চলেছে। এই পরিধির যত বৃদ্ধি ঘটছে, রাষ্ট্রীয় আয় সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাও ততই বাড়ছে। রাষ্ট্রীয় আয়ের মূল উৎস হল কর। আগের এককটিতে তাই আমরা কর-ব্যবস্থা ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব রকমের সমস্যা সম্পর্কে বেশ কিছুটা দীর্ঘ আলোচনা করেছি। এখন আমরা সংক্ষেপে রাষ্ট্রীয় ব্যয় সম্বন্ধে অনুরূপ একটি অলোচনা করতে চলেছি যার মধ্যে থাকবে (১) উত্তরোত্তর রাষ্ট্রীয় বাববৃদ্ধি র কারণ, (২) রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ, (৩) রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলাফল এবং এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি যার নামকরণ করা হয়েছে (৪) পরিপূরক ব্যয়। আমাদের পাঠক-পাঠিকারা সম্ভ বত জানেন, আয়ের চেয়ে ব্যয়টাই অনেক বেশি প্রয়োজনীয় এবং তারই ফলে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমরা সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি—রাষ্ট্রীয় ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করতে চলেছি।

১১.৩ রাষ্ট্রীয় ব্যয়বৃদ্ধির কারণ (Reasons for Increased Public Expenditure)

জাতীয় অর্থনীতির, বিশেষত উৎপাদন, কর্মসংস্থান, জীবনযাত্রার মান, জাতীয় আয় নির্ধারণ ইত্যাদির ওপর রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাব যে রাষ্ট্রীয় আয় থেকে কিছুমাত্র কম নয়, প্রখ্যাত আধুনিক অর্থনীতিবিদরা প্রায় সকলেই এখন এ কথা স্বীকার করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মতবাদে বিশ্বাসী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল খুব অল্প। সুতরাং তখন এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও ফলাফল সম্পর্কে অর্থনীতিবিদরা তেমন সচেতন ছিলেন না। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কাজের পরিধি আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে, ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এবং ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলেছে। তার ওপর আবার কেইনসীয় মতবাদের প্রভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বা সমগ্রালোচনা পদ্ধতি (Macro-analysis) অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে গৃহীত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের আলোচনাও আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়বৃদ্ধির কারণ : বর্তমান যুগে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধির অনেক কারণ আছে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান কারণটি সম্বন্ধে উপরে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মতবাদমূলক। সুতরাং তখন স্বভাবতই রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। বর্তমানে সমাজকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিদিনই নতুন নতুন দায়িত্ব বহনের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। ফলে রাষ্ট্রে কার্যবলীর পরিধি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণও দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। আধুনিক রাষ্ট্র আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়াও শিক্ষাবিস্তার, জনস্বাস্থ্য সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতি খাতে প্রচুর ব্যয় করছে। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পর্কে মতবাদের পরিবর্তন ছাড়াও রাষ্ট্রে ব্যয়বৃদ্ধির মূলে আছে রাষ্ট্রে ভৌগোলিক সীমানা বা আয়তনবৃদ্ধি এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, সরকারি উদ্যোগের ওপর আস্থা আগের তুলনায় এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছুকাল আগে পর্যন্ত মনে করা হত, বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত সংস্থাগুলি অনেক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, কিন্তু এ ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, জাতীয় রেলপথ প্রভৃতি সরকারি অথবা বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হবে কিনা কিছুকাল আগে পর্যন্ত তা তর্কের বিষয় ছিল। কিন্তু এখন এ সম্পর্কে আর কোন দ্বিমত, দ্বিধা বা সন্দেহ নেই যে জনস্বার্থ-সম্পর্কিত সব প্রতিষ্ঠানই সরকারি উদ্যোগের অধীনে থাকবে। তৃতীয়ত, আধুনিক যুগে যুদ্ধের কলাকৌশলের উন্নয়ন প্রকৃতির পরিবর্তনের ফলে যুদ্ধ-প্রস্তুতি, যুদ্ধ-পরিচালনা বা বিভিন্ন ধরনের সমরোপকরণ সংগ্রহ করা প্রভৃতি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বিশেষভাবে বেড়েছে। অধিকাংশ রাষ্ট্রকেই এখন মোট রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের অন্তত অর্ধেক পরিমাণ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করতে হচ্ছে। চতুর্থত, লর্ড কেইনস ও তাঁর অনুগামীদের চিন্তাধারা রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। পরিণত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় (mature capitalism) বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধ রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন সমস্যা, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধের জন্য কর-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস যতটা প্রয়োজন, তার তুলনায় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি, গতি ও প্রকৃতির পরিবর্তনের গুরুত্ব কিছু কম নয়। কেইনসের মতে, পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌঁছবার জন্য ও ঐ অবস্থায় মোটামুটি স্থায়িভাবে থাকার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনমতো ঘাটতি বাজেট নীতি অনুসরণ করবে এবং মন্দা বাজারের প্রভাব কমানোর জন্য মন্দার সময়ে রাষ্ট্রীয় ব্যয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে। এই ধরনের ব্যয়কে পূরণকারী ব্যয় (compensatory spending) বলা যেতে পারে। বহু রাষ্ট্রকেই বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে এই ধরনের ব্যয় করতে হচ্ছে এবং ফলে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের ব্যয় বেড়ে চলেছে।

সর্বশেষে, এ কথাও মনে রাখতে হবে, বর্তমানে প্রায় সকল রাষ্ট্রেই জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটছে, মাথাপিছু ব্যক্তিগত আয় বাড়ছে, জীবনযাত্রার মানও বাড়ছে। ফলে রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় দুটিই এখন অত্যন্ত দ্রুতহারে বাড়ছে।

১১.৪ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Public Expenditure)

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে।

প্রথমত, সরকারের শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে (১) যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়, (২) রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারের ব্যয় এবং (৩) স্থানীয় বা স্বায়ত্তশাসনমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যয়—এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। বলা বাহুল্য, শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় না হয়ে এককেন্দ্রিক হলে এই ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় তিন শ্রেণীর না হয়ে দু-শ্রেণীরও হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে অর্থসাহায্য বা ক্রয়মূল্য (Grants of Purchase Prices) — এভাবেও ভাগ করা চলে। কোন জিনিস বা সেবাদানের জন্য রাষ্ট্র যদি কিছু পরিমাণ অর্থব্যয় করে, তবে ঐ ব্যয়কে ক্রয়মূল্য বলা যেতে পারে। অপরপক্ষে, রাষ্ট্র যদি কোন জিনিস বা সেবার পরিবর্তে নয়, নিছক সাহায্যের জন্য কিছু পরিমাণ অর্থ প্রদান করে, তাহলে তাকে অর্থসাহায্য বলা হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের তৃতীয় শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের যে অংশ উৎপাদন ও জাতীয় আয়বৃদ্ধির সহায়ক, তাকে উৎপাদনশীল (productive) ব্যয় বলা হয়ে থাকে। যেমন, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে ব্যয়। অপরপক্ষে, ধ্বংসমূলক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে ব্যয় অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের বিরাট সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখার বা অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের জন্য যে ব্যয় তা জাতীয় উৎপাদনশীলতা অথবা জাতীয় আয়বৃদ্ধিকে কিছুমাত্র সহায়তা করে না। সুতরাং এই জাতীয় ব্যয়কে অনুৎপাদনশীল (unproductive) ব্যয় বলা যেতে পারে।

চতুর্থত, ডালটনের মতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার হাত থেকে দেশকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় এবং (২) সামাজিক জীবনের উৎকর্ষবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যয়। এই শ্রেণীবিভাগ অনুসারে জাতীয় প্রতিরক্ষা, পুলিশবাহিনী, বিচারব্যবস্থা প্রভৃতি বাবদ যে ব্যয় তা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং অন্যান্য জাতিগঠনমূলক কাজগুলি সম্পাদনের জন্য যে ব্যয় হবে তা দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যয় বলে গণ্য হবে। ক্রয়মূল্য এবং অর্থসাহায্য—রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কেও ডালটন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

অধ্যাপক পিও রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে দুভাগে ভাগ করেছেনঃ (১) প্রকৃত ব্যয় (real expenditure) এবং হস্তান্তর ব্যয় (transfer expenditure)। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে ক্রয়-ক্ষমতা বা সম্পদ সমাজের এক অংশের কাছ থেকে অপর অংশের কাছে কেবলমাত্র হস্তান্তরিত হতে পারে অথবা ব্যবহার দ্বারা ঐ সম্পদের উপযোগ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতেও পারে। এর মধ্যে প্রথমটি ঘটলে, অর্থাৎ সম্পদ শুধু হস্তান্তরিত বা স্থানান্তরিত হলে ঐ জাতীয় ব্যয়কে হস্তান্তর ব্যয় বলা যেতে পারে। অপরপক্ষে, যদি ঐ সম্পদের উপযোগিতা ব্যবহারের দ্বারা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় (যেমন যুদ্ধের ফলে অনেক জিনিস ও সেবার ক্ষেত্রে হয়), তাহলে ওটিকে প্রকৃত ব্যয় বলা হবে। রাষ্ট্রীয় ঋণের সুদ দেওয়ার জন্য যে ব্যয় হয়, তা প্রকৃত ব্যয় নয়—হস্তান্তর ব্যয়মাত্র। কারণ, এক্ষেত্রে সম্পদ করদাতাদের কাছ থেকে ঋণদাতাদের কাছে চলে যায় মাত্র।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্যভাবেও করা সম্ভব। কিন্তু উপরে যে শ্রেণীবিভাগগুলি আলোচিত হল, সেগুলিই সাধারণত প্রধান প্রধান শ্রেণীবিভাগ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১১.৫ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলাফল (Effects of Public Expenditure)

(ক) উৎপাদনের ওপর (On production) : উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক অর্থনীতিবিদের ধারণা ছিল, রাষ্ট্রীয় ব্যয় সাধারণত অনুৎপাদনশীল। সুতরাং, তার ফলে দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যাহত হতে বাধ্য। যেমন, যুদ্ধ-প্রস্তুতি বা যুদ্ধ চালাবার জন্য রাষ্ট্র যে ব্যয় করেন, তা অনুৎপাদনশীল। এই জাতীয় ব্যয় দেশের উৎপাদনের ওপর কোন সুফল দেয় না; অতএব এর পরিমাণ ন্যূনতম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই মতবাদ সম্পূর্ণ সঠিক ও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রতিরক্ষা বা যুদ্ধ-প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থব্যয় না করলে দেশের অভ্যন্তরে সুষ্ঠু উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার মতো শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় না। আবার অনেক সময় যুদ্ধে জয়লাভ করলে নানা ধরনের অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া যায়, যেগুলি জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। সুতরাং যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যয় সকল ক্ষেত্রেই অনুৎপাদনশীল নয়, যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যয় অনেক ক্ষেত্রেই পরোক্ষভাবে উৎপাদনের সহায়তা করে।

অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ই হয় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উৎপাদনশীল। বর্তমানে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কিছু কিছু শিল্প বা ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে। এইসব শিল্পে বা ব্যবসায়ে রাষ্ট্র যে অর্থ বিনিয়োগ করে, তার ফলে প্রত্যক্ষভাবে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় ব্যয় পরোক্ষভাবে দেশের উৎপাদনকে প্রভাবিত করে—প্রত্যক্ষভাবে নয়। ডালটনের মতে, রাষ্ট্রীয় ব্যয় উৎপাদনকে পরোক্ষভাবে তিন রকমে প্রভাবিত করতে পারে; (১) মানুষের কাজ ও সঞ্চয় করবার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে, (২) তার কাজ ও সঞ্চয় করবার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে এবং (৩) বিভিন্ন কর্মনিয়োগ ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পদগুলি বণ্টনকে প্রভাবিত করে।

(১) কাজ ও সঞ্চয় করবার ক্ষমতার ওপর রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাব (Effects of public expenditure upon peoples ability to work and save)

কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় ব্যয় সরাসরি লোকের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়; এর ফলে দেশের মোট উৎপাদনও বিশেষভাবে বেড়ে যায়। যেমন, শিক্ষাবিস্তার, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, বাসস্থানের সুব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। মানুষের কর্মক্ষমতার ওপর এদের সরাসরি এবং গভীর প্রভাব আছে। এগুলি সম্পর্কে রাষ্ট্র সুব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অর্থব্যয় করলে মানুষের কর্মক্ষমতা সাধারণত অনেক বেড়ে যায়; সেই সঙ্গে জাতীয় উৎপাদনও বেড়ে যায়।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে মানুষের কর্মক্ষমতা ও উৎপাদন বাড়লে তাদের আয়ের পরিমাণও বাড়বে এবং আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয় করবার ক্ষমতাও নিশ্চয়ই বাড়বে। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে আয় ও ব্যয়ের ব্যবধান যতটা বৃদ্ধি পায়, সেটাই হল সঞ্চয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মাপ। করধার্যের ফলে আয়-ব্যয়ের এই ব্যবধান কমে আসে, সুতরাং সঞ্চয়ক্ষমতাও কমে যায়। আবার ঐ সংগৃহীত অর্থ রাষ্ট্র যখন কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য-উন্নয়ন, বাসস্থানের সুবিধা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে খরচ করে তখন লোকের আয় বেড়ে যায় এবং ফলে সঞ্চয়ের ক্ষমতাও বাড়ে। ডালটন সহ অনেক অর্থনীতিবিদ মনে

করেন, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কর হিসেবে সংগৃহীত হলে করদাতাদের সঞ্চয়ক্ষমতা যতটুকু কমে, ঐ অর্থ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের মারফত আর-এক শ্রেণীর লোকদের আয় বৃদ্ধি করে সঞ্চয়ক্ষমতাও ঠিক একই পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অনেক অর্থনীতিবিদই একথা মানতে চান না। তাঁদের মতে, কর ধার্যের ফলে ক-এর সঞ্চয় ক্ষমতা যদি ১০০ টাকার মতো কমে যায় এবং কর সংগৃহীত ঐ ১০০ টাকা খ-এর হাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের মারফত যদি আসে, তবে একটিমাত্র অবস্থাতেই খ-এর সঞ্চয় ক্ষমতা ১০০ টাকার মতো বাড়বে : যদি ক ও খ দুজনের একই পরিমাণ ভোগপ্রবণতা থাকে। ধনীদের তুলনায় গরিবদের ভোগব্যয়ের বাধ্যবাধকতা সাধারণত বেশি। সুতরাং ধনী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কর আরোপের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করে তা গরিবদের হাতে, যাদের ভোগপ্রবণতা ধনীদের চেয়ে বেশি, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের মারফত হস্তান্তরিত করলে তাদের সঞ্চয় ক্ষমতা বিশেষ বাড়ে না। অপরপক্ষে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের মাধ্যমে টাকাটা গরিবদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে ধনীদের হাতে তুলে দিলে, সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয়ক্ষমতা কিছুটা বাড়তে পারে। আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে অবশ্য এই জাতীয় নীতি কেউই সমর্থন করতে চান না। ফলে কল্যাণকামী রাষ্ট্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের মারফত টাকা হস্তান্তরের ফলে সমাজের সঞ্চয়ক্ষমতা কমবার সম্ভাবনা। অবশ্য এত দূর সরলীকরণ যথার্থ নাও হতে পারে। কারণ, ব্যক্তির ব্যয়বাহুল্য অন্য নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিগত আয়ের পুনর্বন্টন হলে সাধারণভাবে সমাজে ব্যয়ের স্তর বাড়লেও অর্থনৈতিক মন্দা কমতে থাকায় বিনিয়োগ বাড়ে। সেজন্য সঞ্চয়প্রবণতাও উৎসাহ পেতে পারে।

(২) কাজ ও সঞ্চয় করবার ইচ্ছার ওপর রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাব (Effects of public expenditure upon people's desire to work and save)

আধুনিক কালে প্রায় সব রাষ্ট্রই সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে বেকার-ভাতা, অসুস্থতা-ভাতা, বার্ধক্য-ভাতা ইত্যাদি ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সব নাগরিককেই দেওয়ার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করছে। মানুষের কাজ করবার ও সঞ্চয় করবার ইচ্ছার ওপর এই জাতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাব যে বিশেষ ভাল নয়, এ কথা অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ স্বীকার করেছেন। ডালটনও মনে করেন, বিনা শর্তে এত উচ্চ-হারে ভাতা দিলে, যাঁরা এই ভাতা পাচ্ছেন তাঁদের কাজ করবার ও সঞ্চয় করবার ইচ্ছা কিছুটা ব্যাহত হবেই। লোকে যদি জানে, অসুস্থ বা বেকার হয়ে পড়লে সরকার থেকে যথেষ্ট ভাতা পাওয়া যাবে অথবা বার্ধক্যে যথেষ্ট পেনসন পাওয়া যাবে, তাহলে ভোগ ও বিশ্রাম বর্জন করে ভবিষ্যতের সংস্থান করার জন্য তারা আর তেমন পরিশ্রম বা সঞ্চয় করতে চাইবেন না। ফলে কাজ ও সঞ্চয় করার ইচ্ছা—দুটিই ব্যাহত হবে। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন ধরনের ভাতা শর্তহীনভাবে না দেওয়াই যুক্তিসংগত এবং অধিকাংশ দেশেই এই নীতি গৃহীত হয়েছে। বেকারভাতা যদি কেবলমাত্র অনিচ্ছামূলক বেকারত্বের (involuntary unemployment) জন্য দেওয়া হয়, অসুস্থতা- ভাতা কেবলমাত্র রাষ্ট্র-অনুমোদিত চিকিৎসকদের সুপারিশে দেওয়া হয় এবং এইসব ভাতা আয়ের একটা বড় অংশের সমান হারে দেওয়া না হয়, তাহলে হয়ত কাজের ইচ্ছা অব্যাহত রাখা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এইভাবেও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বজায় রাখা যাবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সঞ্চয়ের ইচ্ছা বজায় রাখার বোধহয় একটিই পথ আছে : এইসব ভাতা সঞ্চয়ের অনুপাতে নির্দিষ্ট করা, অর্থাৎ যে যত সঞ্চয় করেছে, তার ভাতা তত বেশি হবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা বাস্তবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, মজুরির মতো সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুসারে ভাতা নির্দিষ্ট করলে ধনীরা গরিবদের চেয়ে অনেক বেশি হারে ভাতা পাবে, ধনী ও গরিবদের মধ্যে

আর্থিক ব্যবধানও ক্রমশ বাড়তে থাকবে, যা নাকি একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। এককথায়, সামাজিক নিরাপত্তামূলক রাষ্ট্রীয় ভাতার ফলে লোকের কাজ করবার ইচ্ছা না কমলেও, সঞ্চয়ের ইচ্ছা বেশ কিছুটা কমতে পারে।

(৩) বিভিন্ন কর্মনিয়োগ ও অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পদ বন্টনের ওপর প্রভাব (Effects upon the diversion of economic resources as between employments and localities)

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ বিভিন্ন কর্মনিয়োগের ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অবাঞ্ছিতভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। যেমন, করস্থাপন ও রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবসা ক্ষেত্র থেকে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হতে পারে; ঝুঁকিহীন শিল্পের ক্ষেত্রে ঝুঁকিবহুল শিল্পের ক্ষেত্রে চলে যেতে পারে, গ্রামাঞ্চল থেকে শহর অঞ্চলেও উঠে যেতে পারে, বেসরকারি উদ্যোগ থেকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সরে আসতে পারে ইত্যাদি। এই স্থান বদলের ফলে যতদিন পর্যন্ত সামগ্রিক উৎপাদন ও জাতীয় আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকবে, ততদিনই তা সমর্থনযোগ্য। তবে মনে রাখতে হবে, শুধু বর্তমানকে মাপকাঠি করলে চলবে না, ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করতে হবে।

(৪) বন্টনের ওপর রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলাফল (Effects of Public Expenditure on Distribution)

ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান কমিয়ে এনে জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টনব্যবস্থা গড়ে তুলতে রাষ্ট্রীয় আয় ও ব্যয়ের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা আছে। রাষ্ট্রীয় আয় এমনভাবে সংগ্রহ করবার চেষ্টা করা হয় যাতে গরিবদের চেয়ে ধনীদের ওপরই বেশি ভার পড়ে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয়-ব্যবস্থা এই নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হলে ধনী ও গরিবদের অর্থনৈতিক ব্যবধান অনেকটা কমে যায় এবং আরও বেশি উন্নত ও সন্তোষজনক বণ্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিনা বেতনে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনাধীন বেকারভাতা, অসুস্থতাভাতা, বার্ধক্যভাতা, বাসস্থানের ও যানবাহনের সুব্যবস্থা ইত্যাদি খাতে মোট রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের একটি বড় অংশই নিয়োজিত হলে বণ্টনব্যবস্থা অনেক বেশি সন্তোষজনক হয়ে উঠবে, কারণ এইসব ব্যবস্থার ফলে ধনীদের চেয়ে গরিবরাই বেশি লাভবান হয়ে থাকেন এবং ধনীদের ও গরিবদের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান অনেকটা কমে আসে। আধুনিক জনকল্যাণ রাষ্ট্রে এই নীতির ভিত্তিতেই রাষ্ট্রীয় ব্যয়-ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল এই যে, এর ফলে ধনীদের কাজ এবং সঞ্চয় করবার ক্ষমতা ও ইচ্ছা দুই-ই কমে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে; এমন কি, এর ফলে গরিবদের মধ্যেও কাজ এবং সঞ্চয় করবার ইচ্ছাও কমে যেতে পারে। সুতরাং এই নীতি অনুসরণ করার সময়ে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, কারণ এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার প্রধান দুটি লক্ষ্যের মধ্যে সংঘর্ষ রয়েছে। ধনী ও গরিবদের মধ্যে বণ্টন-বৈষম্য দূর করতে গেলে উৎপাদন ব্যাহত হয়ে জাতীয় আয় ও জীবনযাত্রার মান কমে যেতে পারে। এই দুই পরস্পর-বিরোধী লক্ষ্যের সংঘাত দূর করে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করবে, এমন রাষ্ট্রীয় ব্যয়-ব্যবস্থা গড়ে তোলা কঠিন হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। আধুনিক রাষ্ট্র সব সময় সেই চেষ্টাই করছে।

১১.৬ পরিপূরক ব্যয় (Compensatory Spending)

জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান নির্ভর করে মোট ব্যয়ের পরিমাণের ওপর, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। মোট ব্যয় অপরিবর্তিত থাকলে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান স্তরে সাধারণত তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্তু কোন কারণে সমাজের মোট ব্যয় কমে গেলে জিনিসপত্রের চাহিদা কমে যায় ; ফলে উৎপাদন কমতে শুরু করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত হতে থাকে এবং জাতীয় আয় স্বভাবতই নিম্নাভিমুখী হয়।

সমাজের মোট ব্যয়ের দুটি ব্যয়ের দুটি প্রধান বিভাগ—ব্যক্তিগত বা বেসরকারি ব্যয় (private expenditure) ও রাষ্ট্রীয় ব্যয় (public expenditure)। ব্যক্তিগত ব্যয় আবার দুপ্রকার ঃ ভোগ-ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়। পরিণত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ধনবণ্টনের বৈষম্যের জন্য সামগ্রিকভাবে সমাজের ভোগ-ব্যয় কম। যতদিন যাচ্ছে, মূলধনি ব্যয়ের চেয়ে সমাজের এই সামগ্রিক ভোগ-ব্যয় তুলনামূলকভাবে আরও কমছে। সুতরাং পরিণত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগত বা বেসরকারি ভোগ-ব্যয়ে ঘাটতি। ভোগ-ব্যয়ে এই ঘাটতি বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয়বৃদ্ধির দ্বারা পূরণ করা সাধারণত সম্ভব হয় না, কারণ ভোগ-প্রবণতা ও ভোগ-ব্যয় কমে গেলে লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগও অনেক সংকুচিত হয়ে যায়। এই অবস্থায় যখন ভোগ-প্রবণতায় ও ভোগ-ব্যয়ে ঘাটতি পড়েছে এবং ব্যক্তিগত বা বেসরকারি বিনিয়োগে ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনাও কম, তখন একমাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যয়বৃদ্ধির দ্বারাই এই ঘাটতি পূরণ করতে পারলে সর্বাধিক জাতীয় আয় ও পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রাখা চলে। ব্যক্তিগত বা বেসরকারি ব্যয়ের ঘাটতি পূরণ করার উদ্দেশ্যে এইভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয়বৃদ্ধিকে পরিপূরক ব্যয় বলা হয়ে থাকে। বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন অবস্থায় এই পরিপূরক প্রয়োজনমতো বাড়াতে বা কমাতে হয়।

বাণিজ্যচক্রের মন্দা অবস্থায় ব্যক্তিগত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় কমে যায়, কর্মসংস্থান এবং জাতীয় আয় সংকুচিত হয়। এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধি করে ব্যক্তিগত ব্যয়ের ঘাটতি পূরণ করতে না পারলে মন্দার হাত থেকে রক্ষা পাবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। রাষ্ট্রকে তখন নানা-রকম ত্রাণ ও উন্নয়নমূলক কার্যসূচি গ্রহণ করে পরিপূরক ব্যয়ের জন্য এগিয়ে যেতে হয়। এই ব্যয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্র অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি করে জাতীয় অর্থনীতির পুনরভ্যুদয়ে (recovery) সাহায্য করে থাকে। ত্রাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির রূপায়ণে রাষ্ট্রকে যে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থব্যয় করতে হয়, তা অবশ্য নতুন কর স্থাপন করে সংগ্রহ করাটা সমীচীন নয়, কারণ মন্দা অবস্থায় অতিরিক্ত করভার চাপালে ভোগ ও বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয় আরও কমে যাবে। সুতরাং এই ব্যয়ভার রাষ্ট্রকে ঋণগ্রহণ দ্বারা সংগহ করতে হবে। কিন্তু এই ঋণও আবার জনসাধারণের কাছ থেকে সংগ্রহ করা চলবে না, কারণ তাতেও বেসরকারি বিনিয়োগ বায় কমবার সম্ভাবনা। পরিপূরক ব্যয়ের প্রসারণশীল প্রভাবকে (expansionary effects) যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী করতে গেলে রাষ্ট্রকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ-সংগ্রহ করে এইসব পরিকল্পনার ব্যয়ভার বহন করতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নতুন কাগজি নোট ছাপিয়ে রাষ্ট্রকে ঋণদান করে থাকেন। এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে নতুন নোট ছাপিয়ে সৃষ্ট অর্থ গ্রহণ করে রাষ্ট্র যখন ব্যয়বৃদ্ধির পরিকল্পনা করে এবং এই ব্যবস্থাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য বাজেটে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি ধার্য করে, তখন তাকে ঘাটতি ব্যয় (Deficit spending) নীতি বলে। ঘাটতি ব্যয় নীতি এমনভাবে পরিচালিত করতে হয় যেন রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বেসরকারি বা ব্যক্তিগত বিনিয়োগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না

করে। আরও লক্ষ্য রাখা দরকার যেন ঘাটতি ব্যয় থেকে সৃষ্ট আয় সমাজের এমন শ্রেণীর হাতে না পড়ে যারা ঐ অর্থ আবার ব্যয় না করে শুধুই সঞ্চয় করবে। সুতরাং নতুন সৃষ্ট আয় এমন এক শ্রেণীর হাতে যাওয়া বাঞ্ছনীয় যারা ঐ আয়ের কোন অংশ সঞ্চয় না করে সম্পূর্ণ আয়ই আবার খরচ করবে।

অপরপক্ষে, বাণিজ্যচক্র যখন সমৃদ্ধির শিখরে উঠেছে এবং মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির সূচনা দেখা দিয়েছে, তখন ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় পরিপূরক ব্যয় সংকুচিত করে ফেলতে হয়। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ব্যয় যতই বাড়তে থাকবে রাষ্ট্র নিজের পরিপূরক ব্যয়ও তত কমিয়ে ফেলবে, নতুবা মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌঁছানো মাত্র রাষ্ট্রীয় পরিপূরক ব্যয় একেবরে বন্ধ করে দিতে হবে।

এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের তেজি ও মন্দা অবস্থায় পরিপূরক ব্যয় কমিয়ে বা বাড়িয়ে পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং সর্বোচ্চ জাতীয় আয়স্তর সংরক্ষণ করার চেষ্টা আধুনিক সব রাষ্ট্রই করে থাকে।

১১.৭ অনুশীলনী

(১) বর্তমানকালে রাষ্ট্রীয় ব্যয়বৃদ্ধি র কারণ কি, তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(২) রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ কিসের ভিত্তিতে ও কিভাবে হয়?

(৩) উৎপাদন ও বন্টনের ওপর রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৪) পরিপূরক ব্যয় বলতে কি বোঝায় এবং কেমনভাবে এই ব্যবস্থাটি সফলভাবে চালু রাখতে পারেন?

১১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

1. Dalton–Public Finance
2. Taylor–Public Finance
3. Bhattacharya, Mohit–New Horizons of Public Administration.

একক ১২ ❑ ভারতের আর্থিক প্রশাসন ব্যবস্থা

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য

১২.২ প্রস্তাবনা

১২.৩ যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার মূলনীতিগুলি

১২.৪ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামো ও প্রকৃতি

১২.৫ রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় রাজস্বের বন্টন

১২.৬ কেন্দ্রীয় অনুদান

১২.৭ অনুশীলনী

১২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল, সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে আমাদের নিজের দেশ ভারতের রাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামো সম্পর্কে মূল বিষয়গুলি জানা। পরবর্তী কোন এককে আমরা এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। আপাতত এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার মূলনীতিগুলি কি
- ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামো ও প্রকৃতি
- রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় রাজস্বের বন্টন

১২.২ প্রস্তাবনা

জন-প্রশাসনের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে আর্থিক প্রশাসনের তাত্ত্বিক দিক সম্বন্ধে আমরা আগের তিনটি এককে দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় ব্যয় মেটাবার জন্য কিভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা যায়। অর্থ সংগ্রহের বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে কর-ব্যবস্থা ধার্য করার এবং সংশ্লিষ্ট জটিল ও কঠিন সমস্যার সমাধানের পথ নির্ণয় করাই ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দুটি এককের আলোচ্য বিষয়ই এইসব কঠিন সমস্যা। তৃতীয় এককটিতে আমরা দৃষ্টি দিয়েছি, রাষ্ট্রীয় ব্যয়, তার ফলাফল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যাগুলি সম্পর্কে। এখন আমরা চতুর্থ ও এই পর্যায়ের শেষ এককটিতে তাত্ত্বিক সমস্যার পাশাপাশি কিছু ব্যবহারিক বিষয় সম্বন্ধে ও আলোচনা করব। তাত্ত্বিক

বিষয়টি হল সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার মূলনীতিগুলি এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে এ সম্পর্কে বর্তমান সাংবিধানিক অবস্থা। পরের পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের বাজেট, তাদের গুণাগুণ, হিসাব-নিকাশের পদ্ধতি, অকারণ অর্থব্যয় বা অর্থসংকট এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ তছরূপ বন্ধ করা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব।

১২.৩ যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক-ব্যবস্থার মূলনীতিগুলি (Principles of Federal Finance)

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি ভারতের বর্তমান সংবিধান চালু হয়েছে এবং এই সংবিধানের দ্বাদশ অধ্যায়ে (Part XII) নবগঠিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই আর্থিক ব্যবস্থার প্রকৃতি ও গুণাগুণ বিচার করতে হলে, তাত্ত্বিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার মূলনীতিগুলির সঙ্গে কিছুটা পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সুতরাং আমরা ভারতের রাষ্ট্রীয় আর্থিকব্যবস্থা আলোচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক-ব্যবস্থার মূলনীতিগুলির পরিচয় এখানে সংক্ষেপে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতার বণ্টন করা হয় যাতে দু পক্ষই নিজের নিজের ক্ষেত্রে অপরের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে। আর্থিক ব্যাপারে এই নিয়ন্ত্রণ-বিহীনতা সম্ভব করতে হলে উভয় সরকারেরই নিজস্ব কর্তব্য পালনের জন্য পর্যাপ্ত আয়ের ব্যবস্থা এবং ঐ আয়ের ওপর সংশ্লিষ্ট সরকারের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকা উচিত। সুতরাং দায়িত্ব পালনের পক্ষে পর্যাপ্ত হয় এমনভাবে প্রত্যেক সরকারের জন্য রাজস্ব প্রাপ্তির পৃথক পৃথক সূত্র নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন। এটাই যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার প্রথম ও সর্বপ্রধান নীতি এবং এটিকে 'দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত আয়ের ব্যবস্থা' (resources commensurate with responsibilities) নীতি বা সংক্ষেপে পর্যাপ্তির নীতি (Principle of Adequacy) বলা চলতে পারে। কিন্তু এইভাবে কর্তব্য ও রাজস্ব প্রাপ্তির সূত্রের মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্য বিধান করা বাস্তব ক্ষেত্রে একেবারে অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলে, রাজ স্বসূত্র বণ্টনের সময়ে দুই সরকারের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সম্প্রসারণশীল কাজের দায়িত্ব যে সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকে, তারই হাতে প্রসারণশীল রাজস্ব-সূত্র দেওয়া যুক্তিযুক্ত (elastic sources of revenue should go to the authority with expanding responsibilities)। অপরপক্ষে, যে কর্তৃপক্ষের হাতে কাজের দায়িত্ব তেমন পরিবর্তনশীল নয়, তাদের রাজস্ব-সূত্র অনতিপরিবর্তনশীল (inelastic) হলেও বিশেষ ক্ষতি নেই। তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে বর্তমানে সব যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রিকতার প্রবণতা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে—ফলে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য প্রায় লোপ পেতে চলেছে। এই কেন্দ্রীয় প্রবণতার পিছনে আছে শিল্পগত কলাকৌশল ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, বড় আকারের শিল্পের প্রসার, রাষ্ট্রের নানা ধরনের সমাজ-কল্যাণকর কাজ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, যুদ্ধ, আর্থনৈতিক সংকট এবং এই ধরনের আরও বহু কারণ। এই কেন্দ্রীয় প্রবণতার প্রভাবে, অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই অনেক বেশি ক্ষমতা ও প্রধান প্রধান করগুলি সংগ্রহের দায়িত্ব ও অধিকার এসে পড়েছে।

এই আলোচনা থেকে একটু এগোলেই আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নীতি বা বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই। কেন্দ্রীয় প্রবণতার ফলে প্রধান প্রধান করগুলি ধার্য ও সংগ্রহ করবার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের

হাতে থাকলে অঙ্গরাজ্যগুলির রাজস্ব-আদায়ের পরিমাণ এত কমে যায় যে, ঐ সামান্য আয়ের দ্বারা তাদের ব্যয় সংকুলান হতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থাতেই এমন কয়েকটি কর থাকবে যেগুলি থেকে সংগৃহীত রাজস্ব কেন্দ্রীয় ও অঙ্গ-রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে। অধ্যাপক ভার্গব এই ব্যবস্থাকে principle বা Scheme of Shared Taxes নামে অভিহিত করেছেন। এই করগুলি ধার্য করার ও সংগ্রহ করবার দায়িত্ব ঐসব দেশের সংবিধানে সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দেওয়া হয় এবং সংবিধানে এগুলিকে বণ্টিত কর (Shared taxes) বলে ঘোষণা করা হয় এবং ঐ সব কর থেকে সংগৃহীত রাজস্ব যাতে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টিত হতে পারে, সেজন্য উভয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত নিরপেক্ষ ও স্বাধীন একটি সংস্থা গঠনের ব্যবস্থাও সংবিধানে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য ও পর্যাপ্তির নীতির (Principle of Independence and Adequacy) সঙ্গে শুধুমাত্র বণ্টিত করের নীতি (Principle of Shared taxes) গ্রহণ করলেই যথেষ্ট হয় না, তাই ঐ সঙ্গেই গৃহীত হওয়া চাই এক সরকার কর্তৃক অপর সরকারকে আর্থিক সাহায্যদানের নীতি। এই ব্যবস্থাকে Scheme of grants-in-aid বলা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই সাধারণত প্রধান প্রধান কর ধার্য ও সংগ্রহ করবার অধিকার থাকে। সুতরাং অর্থ সাহায্যের নীতি অনুযায়ী অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যগুলিকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করে থাকেন। অনুমোদিত পরিকল্পনাকে রূপদান করার জন্য বা বাজেট ঘাটতি মেটাবার জন্য এই ধরনের অর্থসাহায্য করা হয়, অর্থ সাহায্য নীতির মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সব অঙ্গরাজ্যেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রসার একই স্তরে রাখবার চেষ্টা করে থাকেন। এই নীতি-অনুযায়ী শিল্পে অনগ্রসর গরিব অঙ্গরাজ্যগুলিকে অন্যদের তুলনায় কিছুটা বেশি পরিমাণ অর্থসাহায্য কেন্দ্রীয় সরকার করতে পারেন।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য বা পর্যাপ্তির নীতি অথবা সাহায্যদান ও বণ্টিত করের নীতির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল শাসনতান্ত্রিক সুবিধা বা দক্ষতার ও ব্যয় সংক্ষেপের নীতি (Principle of Administrative Expediency or Efficiency and Economy)। যেভাবে কর স্থাপনের ক্ষমতা দু-পক্ষের মধ্যে ভাগ হলে দক্ষতার সঙ্গে প্রধান প্রধান করগুলি ধার্য ও সংগৃহীত হতে পারে, কর সংগ্রহের ব্যয় কমানো যায়, সাধারণ করদাতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয়, একই শ্রেণীভুক্ত করদাতাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে একই ধরনের করের ভার অসমানভাবে না পড়ে এবং অসাধু করদাতাদের পক্ষে কর ফাঁকি দেওয়া সম্ভাবনা হয়, সেইভাবেই সংবিধানে ব্যবস্থা থাকলে সংশ্লিষ্ট সকলেই উপকৃত হবেন। যেহেতু বড় বড় শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীরা একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ব্যবসা চালিয়ে অর্থ উপার্জন করেন ও তাঁদের অর্জিত আয় ও সম্পদ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে, সেজন্য এই নীতি অনুযায়ী আয়কর, সম্পদকর, মৃত্যুকর প্রভৃতি ধার্য ও সংগ্রহ করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়। একই কারণে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক প্রভৃতি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর বসানো হলে অল্প খরচে, দক্ষতার সঙ্গে এগুলি সংগৃহীত হবে। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক সুবিধা, দক্ষতা ও ব্যয় সংক্ষেপের নীতি অনুযায়ী প্রধান প্রধান সব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ধার্য ও সংগ্রহ করার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দিলে অঙ্গরাজ্যগুলির রাজস্ব প্রাপ্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় না। সুতরাং পর্যাপ্তির নীতি অনুসরণ করে আবার বণ্টিত কর ও অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু বণ্টিত কর ও অর্থসাহায্যের নীতি মেনে নিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের নীতি কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়ই, কেন-না এর ফলে অঙ্গরাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হতে হয়। সুতরাং, এ কথা মানতেই হয় যে, ক্ষেত্রবিশেষে উপরে-আলোচিত যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার প্রধান প্রধান নীতিগুলি পরস্পর-বিরোধী হয়ে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে এই আপাত পরস্পরবিরোধী নীতিগুলির সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়,

নতুবা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হতে পারে না।

এখন দেখা যাক, আমাদের নতুন সংবিধানে বর্ণিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামো ও প্রকৃতি কেমন এবং এতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার সাধারণ নীতিগুলি কতদূর পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়েছে।

১২.৪ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক-ব্যবস্থার কাঠামো ও প্রকৃতি (Federal Finance in India : Nature & Structure)

যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বর্তমান ভারতীয় সংবিধান মোটামুটিভাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ব্যবস্থাকেই বজায় রেখেছে। (১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ইংরেজ শাসকদেরই তৈরি, কিন্তু নানা রাজনৈতিক গোলমালের জন্য এই অংশ কোনদিনই চালু করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে ইউনিয়ন তালিকা (Union list) রাজ্য তালিকা, (State list) ও যুগ্ম তালিকা (Concurrent list) এই তিনটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যুগ্ম তালিকায় মাত্র দুটি রাজস্বের উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের গুরুত্ব অতি সামান্য। এই দুটি উৎস হল : (১) বিচারবিভাগীয় স্ট্যাম্পের (Judicial Stamp) মারফত আদায় হয় না এবং অপর দুটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এরূপ ধরনের স্ট্যাম্প শুল্ক এবং (২) যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সংক্রান্ত ফী (আদালতে জমা দিতে হয় সে জাতীয় ফী বাদে)।

সুতরাং, রাজস্বের প্রধান উৎসগুলি ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ইউনিয়ন ও রাজ্য তালিকার মাধ্যমে ভাগ করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, একাধিক রাজ্য সংশ্লিষ্ট উৎসগুলি ইউনিয়ন তালিকায় ও স্থানীয় উৎসগুলি রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্গত উৎসগুলি হল : (১) কৃষিজাত আয় ভিন্ন অপর সকল প্রকার আয়ের উপর কর ; (২) আমদানি ও রপ্তানির উপর ধার্য বাণিজ্য-শুল্ক, (৩) তামাক ও ভারতে উৎপন্ন সব জিনিসের (মদ গাঁজা, আফিম ও অন্যান্য নিদ্রাবহ মাদক দ্রব্য ব্যতীত) উপর অন্তঃশুল্ক; (৪) করপোরেশন ট্যাক্স বা কোম্পানি আয়কর, (৫) কৃষিজমি ছাড়া ব্যক্তির ও কোম্পানিসমূহের যাবতীয় সম্পদের মূলধন মূল্যের উপর কর; (৬) কোম্পানিসমূহের মূলধনের ওপর কর ; (৭) কৃষিজমি বাদে অন্যান্য সকল প্রকার সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর (Duties in respect of succession to property except agricultural land) অথবা সম্পত্তি শুল্ক (Estate duty in respect of property other than agricultural land); (৮) আকাশপথে,সমুদ্রপথে বা রেলপথে পরিবাহিত দ্রব্য ও যাত্রীদের ওপর ধার্য সীমা কর (terminal taxes on goods or passengers carried by railways, sea or air); (৯) রেলের যাত্রীভাড়া ও মালের ভাড়ার ওপর কর (taxes on railway fares and freights); (১০)শেয়ার বাজার ও আগাম বাজারে লেনদেনের উপর ধার্য স্ট্যাম্প শুল্ক ব্যতীত কর (taxes other than Stamp duties on transactions in stock exchange and future markets); (১১) হুন্ডি, চেক, ইন্সিওরেন্স পলিসি, শেয়ার হস্তান্তর,অঙ্গীকার-পত্র (Promissory note), আস্থাসূচক-পত্র (letter of credit) ইত্যাদির ওপর স্ট্যাম্প শুল্ক, (১২) সংবাদপত্রের ক্রয়-বিক্রয়ের এবং তাতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ওপর কর, এবং (১৩) আদালতে প্রদেয় ফী বাদে ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কে ধার্য ফী। এই তালিকাটি ভাল

করে পরীক্ষা করলে এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ভারতীয় সংবিধান প্রায় সব ধরনের প্রধান প্রধান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ও শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করেছে। সুতরাং আর্থিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলি অপেক্ষা নিঃসন্দেহে বহুলপরিমাণে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। সম্ভবত প্রশাসনিক সুবিধা, দক্ষতা ও ব্যয় সংক্ষেপ নীতিগুলির অনুকরণে এ রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এতে রাজ্য সরকারগুলি সম্পূর্ণভাবেই কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সুতরাং এ কথা সম্ভবত বলা যেতে পারে যে ভারতীয় সংবিধান প্রশাসনিক সুবিধা, দক্ষতা ও ব্যয় সংক্ষেপ নীতি অন্ধ ভাবে অনুসরণ করে স্বাতন্ত্র্যের নীতি ও পর্যাপ্তির নীতি (Principles of Indepedence and Adequacy) প্রায় বর্জন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য কয়েকটি কর থেকে সংগৃহীত রাজস্ব কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বণ্টনের এবং অপর কয়েকটি কর থেকে সংগৃহীত রাজস্বের সম্পূর্ণ অংশ রাজ্য সরকারগুলিকে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করে সংবিধান সম্ভবত এই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নানা ধরনের অনুদানের ব্যবস্থাও বোধহয় একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন, সংবিধান অবশিষ্ট বিষয়গুলির (Residuary Subjects) ওপর আইন প্রণয়নের অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়েছে, সুতরাং কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকার বাইরে অন্য যে কোন করই কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত।

এখন রাজ্য তালিকার অন্তর্গত করগুলি সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন সংখ্যায় বেশি হলেও রাজ্য সরকারগুলিকে যেসব কর ধার্য করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, তার কোনটিই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং দু-একটি ভিন্ন এগুলির কোনটিই বিশেষ প্রসারশীল (elastic) বা উৎপাদনশীল (productive) নয়। এদের মধ্যে প্রদান কর বা শুল্কগুলি হল ঃ (১) ভূমি-রাজস্ব; (২) কৃষি আয়কর; (৩) কৃষিজমির ওপর উত্তরাধিকার কর অথবা সম্পত্তি শুল্ক; (৪) জমি ও বাসস্থানের ওপর কর; (৫) মদ, গাঁজা, আফিম ও অন্যান্য নিদ্রাবহ মাদক দ্রব্যের ওপর অন্তঃশুল্ক ; (৬) ভোগ, ব্যবহার বা বিক্রির উদ্দেশ্যে কোন স্থানীয় এলাকায় আনীত যে কোন জিনিসের ওপর কর; (৭) বৈদ্যুতিক শক্তি বিক্রয় বা ব্যবহারের ওপর কর; (৮) সংবাদপত্র ব্যতীত অন্য সকল জিনিসপত্রের ক্রয় বা বিক্রয়ের ওপর কর; (৯) সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ভিন্ন অন্য প্রকার বিজ্ঞাপনের উপর কর; (১০) পথ-কর ও যানবাহন কর; (১১) প্রমোদ অনুষ্ঠান ও জুয়া-খেলার ওপর কর; (১২) বৃত্তি, ব্যবসায় ও পেশার ওপর ধার্য কর; (১৩) খনিজ স্বত্বের উপর কর; (১৪) আদালতে প্রদেয় ফী বাদে রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কে ধার্য ফী ইত্যাদি।

১২.৫ রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় রাজস্বের বন্টন (Distribution of Central Revenues among States)

উপরের দুটি তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার কর ধার্য করার অধিকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। রাজ্য তালিকাভুক্ত করগুলি রাজ্য সরকারই ধার্য করেন, সংগ্রহ করেন এবং এবং সংগৃহীত রাজস্বের পুরোটাই নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। কিন্তু, আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, রাজ্যগুলির রাজস্বের উৎসগুলি তাদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসগুলি অনেক বেশি সম্পসারণশীল। সুতরাং রাজ্য সরকারগুলির আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য কতকগুলি কেন্দ্রীয় রাজস্বের আংশিক ব ণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথমত, কতকগুলি শুল্ক আছে যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য করেন, কিন্তু এগুলি সংগ্রহ করেন রাজ্য সরকারগুলি, তাঁরাই এই রাজস্ব সম্পূর্ণভাবে ভোগ করেন (Duties levied by the Union but collected and wholly appropriated by the States)। ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত স্ট্যাম্প শুল্ক এবং ঔষধপত্র ও প্রসাধন সামগ্রীর উপর অন্তঃশুল্ক এই পর্যায়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, কৃষিজমি ভিন্ন অন্যান্য সব রকম সম্পত্তির ওপর উত্তরাধিকার কর অথবা সম্পত্তি শুল্ক, আকাশপথে, সমুদ্রপথে বা রেলপথে পরিবাহিত জিনিসপত্র ও যাত্রীদের ওপর ধার্য সীমা কর, রেলের যাত্রীভাড়া ও মালের ভাড়ার ওপর কর, শেয়ার বাজার ও আগাম বাজারে লেনদেনের ওপর ধার্য স্ট্যাম্প-শুল্ক ব্যতীত কর, সংবাদপত্রের ক্রয়বিক্রয়ের এবং তাতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ওপর কর ও শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য করেন, আদায়ও তাঁরাই করেন কিন্তু আদায়-খরচ বাদে নিট রাজস্ব রাজ্য সরকারগুলিকে দেওয়া হয়। সংবিধানের ২৬৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনে নির্ধারিত বণ্টন নীতি অনুযায়ী এইসব কর ও শুল্ক থেকে সংগহীত নিট রাজস্ব রাজ্য সরকারগুলির মধে ভাগ করে দেওয়া হবে।

তৃতীয় পর্যয়ে আছে একটি কর যা ধার্য ও আদায় করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু আদায় খরচ বাদে সংগৃহীত নিট রাজস্ব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এই করটি হল : কৃষিজাত আয় ভিন্ন অন্য সব রকম আয়ের ওপর ধার্য কর। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে করপোরেশন ট্যাক্স বা কোম্পানির ওপর ধার্য আয়কর বণ্টিত হয় না। এ ছাড়া ইউনিয়ন অঞ্চলগুলিতে উৎপন্ন আয়কর এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত বেতন প্রভৃতির উপর দেয় করও বণ্টনযোগ্য আয়করের মধ্যে পড়ে না। এইসব কর সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বাদ দিয়ে প্রতি আর্থিক বছরে আয়কর থেকে যে নিট রাজস্ব পাওয়া যায়,তারই একটি অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। মোট আয়করের শতকরা কত ভাগ রাজ্যগুলি পাবে এবং রাজ্যগুলি মোট প্রাপ্য কিভাবে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ভাগ হবে তা প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি ফিনান্স কমিশনের সুপরিশ বিবেচনা করে নির্ধারণ করে থাকেন। ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ বিবেচনা করা রাষ্ট্রপতির কর্তব্য হলেও ঐ সুপারিশ গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য নন। সুতরাং আয়কর থেকে রাজ্যের আয় অনেকাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনার ওপর নির্ভর করে।

চতুর্থত, সংবিধানের ২৭১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ২৬৯ ও ২৭০ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত (অর্থাৎ উপরে আলোচিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের) কোন কর বা শুল্কের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার নিজের প্রয়োজনে কোন সারচার্জ বসালে ঐ সারচার্জ থেকে সংগৃহীত রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরাকর নিজেই ভোগ করবেন— মূল কর বা শুল্কজাত রাজস্ব রাজ্য সরকারগুলিকে দেয় হলেও অথবা উহা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বিভাজ্য হলেও, সারচার্জের কোন অংশই রাজ্য সরকারগুলি পাবার অধিকারী নন, ঐ সারচার্জ থেকে প্রাপ্ত অর্থ সম্পূর্ণভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য।

সর্বশেষে উল্লেখ করা যায়, ঔষধপত্র ও প্রসাধন সামগ্রী ছাড়া ভারতে উৎপন্ন অন্য সকল জিনিসের ওপর ধার্য ইউনিয়ন অন্তঃশুল্ক কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই ভোগ করতে পারেন অথবা প্রয়োজনবোধে এবং পার্লামেন্টে যদি সেই মর্মে আইন প্রণয়ন করেন, তা হলে এ সব ইউনিয়ন অন্তঃশুল্ক থেকে সংগৃহীত রাজস্বের একাংশ অথবা সমস্তই রাজ্য সারকারগুলির মধ্যে বণ্টন করতে পারেন। ইউনিয়ন অন্তঃশুল্ক থেকে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আদায় হয়। সুতরাং ঐ বিপুল পরিমাণ রাজস্বের কিছুটা অংশ পেলেও রাজ্য সরকারগুলির প্রয়োজন অনেকটা মিটতে পারে।

১২.৬ কেন্দ্রীয় অনুদান (Grants from the Union Government)

আয়কর, ইউনিয়ন অন্তঃশুল্ক প্রভৃতি কয়েকটি অত্যন্ত উৎপাদনশীল কেন্দ্রীয় উৎস থেকে সংগৃহীত রাজস্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারগুলির আয় অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের তুলানায় পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার আর-একটি উল্লেখযোগ্য নীতি মেনে নিয়ে আমাদের সংবিধানে রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বেশ বড় ধরনের আর্থিক সাহায্য বা অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই অনুদান দুধরনের (১) নির্দিষ্ট অনুদান (specific grants) এবং (২) সাধারণ অনুদান (general grants)। নির্দিষ্ট অনুদান সম্পর্কে সংবিধানে বলা হয়েছিল প্রতি বছর পাট বা পাটজাত জিনিসের ওপর ধার্য রপ্তানি শুল্ক হতে পাট-উৎপাদনকারী চারটি রাজ্যকে— আসাম, বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবাংলাকে— ঐ শুল্কের একাংশের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্য করা হবে। সংবিধান চালু হবার পর দশ বছর এই ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। দ্বিতীয় এক ধরনের নির্দিষ্ট অনুদানের কথাও সংবিধানে উল্লেখ করা আছে। তফসিলি উপজাতিদের (Scheduled Tribes) কল্যাণ সাধনের ও তফসিলভুক্ত অঞ্চলে (Scheduled Areas) শাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত পরিকল্পনার ব্যয় বহনে রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে এই দ্বিতীয় ধরনের নির্দিষ্ট অনুদান দেওয়া যেতে পারে। সংবিধানের ২৭৫নং অনুচ্ছেদে এই ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। ঐ একই অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে যে পার্লামেন্টে যে সব রাজ্যের সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলে সিদ্ধান্ত করবে, সেইসব রাজ্যকে পার্লামেন্ট নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অনুদান হিসাবে দিতে পারবে। মোটামুটিভাবে আমাদের সংবিধানের আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আপাতত এতটুকুই বলা হল।

১২.৭ অনুশীলনী

(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার মূলনীতিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(২) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থির ব্যবস্থার কাঠামো ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যেটুকু জানেন, অল্প কথায় তা প্রকাশ করুন।

(৩) রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় রাজস্বের বণ্টন, বিশেষ করে, আয়করের বণ্টন সম্পর্কে সংক্ষেপে আপনার বক্তব্য জানান।

(৪) রাজগুলিকে কেন্দ্রীয় অনুদানের প্রয়োজন আছে কি? এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

১২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

1. Constitution of India (latest edition)
2. Bhargava— Theory and Working of Union Finances in India.
3. Basu, Durgadas— Introduction to the Constitution of India.
4. Bhattacharya, Mohit— New Horizons of Public Administration

একক ১৩ ❑ রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসন ব্যবস্থা ঃ বাজেট ব্যবস্থা

গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য
১৩.২ প্রস্তাবনা
১৩.৩ বাজেট কাকে বলে
১৩.৪ সমতাপূর্ণ বা সুষম বনাম সমতাহীন বাজেট
১৩.৫ সমতাপূর্ণ ও সমতাহীন বাজেটের সুবিধা-অসুবিধা
১৩.৬ বিভিন্ন ধরনের বাজেট ও বাজেট ব্যবস্থার সংস্কার
১৩.৭ কার্যমাফিক বা কার্য-অনুসারী বাজেট
১৩.৮ অনুশীলনী
১৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১ উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এই এককটি এবং এই পর্যায়ের অন্যান্য এককগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই এককটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন :

- বাজেট কাকে বলে, এর প্রয়োজনীয়তা কি এবং কত রকমের বাজেট বর্তমানে চালু আছে।
- বিভিন্ন ধরনের বাজেটের সুবিধা-অসুবিধা।
- বাজেট ব্যবস্থার সংস্কার।
- নতুন বাজেট ব্যবস্থা : কার্যমাফিক বা কার্য-অনুসারী বাজেট (Performance Budget)।

১৩.২ প্রস্তাবনা

রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আমরা আগের পর্যায়ে বিভিন্ন এককে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই আলোচনার সময় আমরা দেখেছি, আধুনিক রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন ধরনের জনহিতকর কাজে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করছে এবং এই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের যত রকম উপায় আছে সবই প্রয়োগ করছে। অর্থ সংগ্রহের (Resource Mobilisation) এই পন্থাগুলি একদিকে এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ক্রমবর্ধমান পরিমাণ—দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা থেকেই উৎপত্তি হয়েছে বাজেট ব্যবস্থার। এই এককে আমরা প্রথমে আলোচনা করব বাজেট কাকে বলে; এর পর একে একে আসবে (১) সমতাপূর্ণ বা সুষম বাজেট বনাম সমতাহীন বাজেট; (২) সমতাপূর্ণ ও সমতাহীন বাজেটের সুবিধা-অসুবিধা; (৩) বিভিন্ন ধরনের বাজেট ও বাজেট ব্যবস্থার সংস্কার; এবং সব শেষে (৪) আলোচনা করা হবে বাজেট ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক নতুন পথের যার নাম দেওয়া হয়েছে কার্যমাফিক বা কার্য-অনুসারী বাজেট বা Performance Budget। ধরে নেওয়া যেতে পারে, রাষ্ট্রীয় আর্থিক

প্রশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটাই সর্বাধুনিক সংযোজন এবং বহু বিদেশি অর্থনীতিবিদের পাশাপাশি আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও অনেকেই এ ব্যাপারটি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন।

১৩.৩ বাজেট কাকে বলে (What is a Budget?)

একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের পরিমাণ ও তার বিভিন্ন প্রকার আয়ের উৎস এবং আয়ের পরিমাণ একত্রিত করে যে হিসাব তৈরি হয়, তাকেই বাজেট বলা হয়। সাধারণত বাজেটে আগের বছরের প্রকৃত আয় ও ব্যয়ের সঠিক এবং সর্বশেষ হিসাব থাকে, কিন্তু মুখ্যত এর উদ্দেশ্য হল, আগামী আর্থিক বছরে বিভিন্ন সূত্র থেকে কি পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে এবং বিভিন্ন খাতে কি পরিমাণ ব্যয় করা যাবে, সে সম্পর্কে একটি সম্ভাব্য চিত্র তুলে ধরা। অধ্যাপক ডিউ তাই বাজেটের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "A budget, in the general sense of the term, is a financial plan for a specified period of time. A government budget, therefore, is a statement of proposed expenditure and expected revenues for the coming period, together with data of actual expenditure and revenues for current and past periods." অর্থাৎ "সাধারণভাবে বলতে গেলে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আর্থিক পরিকল্পনাকে বাজেট বলা যেতে পারে। সরকারি বাজেট বলতে তাই বোঝায়। আগামী কিছুকালের জন্য মোট রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের একটি সম্ভাব্য হিসাব এবং সেই সময়ের মধ্যে মোট রাজস্বপ্রাপ্তির একটা সম্ভাবনা ও পরিমাণ। ওই সঙ্গেই থাকে, বর্তমান ও আগের বছরের আয়-ব্যয়ের একটি হিসাব।" কিন্তু বাজেটে শুধু আয় ও ব্যয়ের হিসাব থাকলেই চলে না। কারণ আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত করে বাজেট তৈরি করা প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাজেটে সম্ভাব্য আয়ের বা প্রস্তাবিত ব্যয়ের আধিক্য দেখা যাবে। ব্যয়ের তুলনায় আয় বেশি হলে সেই অতিরিক্ত অর্থ কি করা হবে— পুরোনো ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যবহার হবে কিনা; অথবা আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হলে কোন্ উৎস থেকে সেই ঘাটতি পূরণ করা হবে— নতুন ঋণ সংগ্রহ করা হবে, না ঘাটতি-ব্যয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে—এ সকল তথ্যএ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়, না হলে বাজেটের মারফত অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও আর্থিক লেনদেনের সামগ্রিক রূপটি ধরা পড়ে না। এই কারণেই অধ্যাপক টেলর বাজেটকে "master financial plan of a government" অর্থাৎ কোনও সরকারের আর্থিক লেনদেনের সামগ্রিক রূপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, বাজেটের মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের সম্ভাব্য আয় ও প্রস্তাবিত ব্যয়ের হিসাব গ্রহণ এবং এই হিসাব থেকেই সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও তার জন্য অর্থসংস্থানের পদ্ধতির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। একমাত্র বাজেটের মধ্যেই সরকারের সব রকম কার্যসূচির পরিধি ও প্রকৃতির সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় এবং সরকার কোন্ পথে ও কি ধরনের আর্থিক নির্দেশের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতির পরিচালনা করেছেন, তাও বোঝা যায়। সুতরাং আদর্শ বাজেটের মধ্যেই সাধারণ নাগরিক দেখতে পান সরকারি ফিসকাল নীতির প্রকৃত অখণ্ড রূপটি। এই প্রসঙ্গে ফিসকাল নীতির একটি ছোট সংজ্ঞা অধ্যাপক টেলরের ভাষায় বলা যেতে পারে। ফিসক (fisc) শব্দটির অর্থ হল রাজকোষ বা রাষ্ট্রীয় অর্থদপ্তর (Public Treasury)। সুতরাং রাষ্ট্রীয় অর্থদপ্তর যে সব নীতি নির্ধারণ করে এবং পরিচালনা করে সামগ্রিকভাবে তাদের ফিসকাল নীতি বা অর্থ দপ্তর সংক্রান্ত নীতি বলা যেতে পারে।

১৩.৪ সমতাপূর্ণ বা সুষম বনাম সমতাহীন বাজেট (Balanced Budget vs Unbalanced Budget)

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন, সমতাপূর্ণ বা সুষম বাজেটই রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আর্থিক ব্যবস্থা, কিন্তু আধুনিক যুগে এই ধারণা একেবারে পরিত্যক্ত হয়েছে। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা প্রায় সকলেই মনে করেন, সমতাপূর্ণ বাজেটের এমন কোনও বিশেষ গুণ নেই যে সব অবস্থাতেই একে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা যাবে। বরং অনেক অবস্থাতেই সুষমতাহীন বাজেটই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও ব্যবস্থার পক্ষে মঙ্গলজনক। এই দুটি মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যেসব যুক্তি দেখানো হয়, সেগুলি আলোচনার আগে আমাদের জানা দরকার সমতাপূর্ণ বা সুষম এবং সমতাহীন বাজেট বলতে ঠিক কি কি বোঝায় এবং এদের বৈশিষ্ট্য কি।

একটি বিশেষ আর্থিক বছরে রাষ্ট্রের রাজস্বপ্রাপ্তির (revenue receipts) পরিমাণ যদি ওই বছরের মোট চলতি রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের (current expenditure) সমান হয় অথবা সংগৃহীত রাজস্ব যদি চলতি ব্যয়ের চেয়ে কম না হয়, তা হলে ওই বাজেটকে সমতাপূর্ণ বা সুষম বাজেট বলা হবে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক টেলরের ভাষায়, "The budget is to be regarded as balanced if, during the fiscal year, revenue reciepts exceed, or at least, do not fall short of current expenditure." অর্থাৎ ধ্রুপদি (classical) অর্থনীতিবিদরা সকলেই জোর দিয়েছেন চলতি বছরের রাষ্ট্রীয় আয় ও ব্যয়ের ওপর : রাষ্ট্রীয় আয় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের চেয়ে বেশি, অন্ততপক্ষে সমান হলে ওই বাজেটকে সমতাপূর্ণ বা সুষম বাজেট বলা হবে। বিপরীতপক্ষে, যদি কোনও আর্থিক বছরে চলতি রাষ্ট্রীয় ব্যয় রাজস্ব সংগ্রহ বা প্রাপ্তির চেয়ে বেশি হয়, তা হলে তাকে সমতাহীন বা ঘাটতি বাজেট বলা যেতে পারে। ব্যাপারটি কিন্তু অতটা সহজ নয়। সমতাহীন বা সমতাপূর্ণ বাজেট সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে, উপরে যে ক' টি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে—যথা, রাজস্বপ্রাপ্তি, চলতি রাষ্ট্রীয় ব্যয়, ইত্যাদি—সেগুলির সঠিক অর্থ প্রথমে জানতে হবে। অধ্যাপক টেলর চলতি রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে cost payments আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, "রাষ্ট্রের যে সমস্ত প্রাপ্তি রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি না করে রাষ্ট্রীয় তহবিলে ব্যয়-উপযোগী অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে অথবা ব্যয়-উপযোগী অর্থের পরিমাণ না কমিয়ে রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দেয়, তাদের রাজস্বপ্রাপ্তি বলা যেতে পারে।" সুতরাং রাজস্বপ্রাপ্তির দ্বারা রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি কোনও অবস্থাতেই হবে না, অর্থাৎ নতুন ঋণ গ্রহণ করে রাষ্ট্র যদি নিজের আয় বৃদ্ধি করে, তবে ওই অতিরিক্ত আয়কে রাজস্ব-প্রাপ্তি (revenue receipts) বলা চলবে না। অন্যদিকে মজুত তহবিল থেকে অর্থ তুলে অথবা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বিক্রি করে সংগৃহীত অর্থ রাষ্ট্রের হাতে ব্যয়-উপযোগী অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করলেও, এগুলিকেও রাজস্বপ্রাপ্তি বলা চলেবে না। অপরপক্ষে, রাজস্ববহির্ভূত প্রাপ্তি (Non-revenue receipts) সম্পর্কে অধ্যাপক টেলরের মত, এগুলি হল রাষ্ট্রের সেইসব প্রাপ্তি যা রাষ্ট্রের হাতে ব্যয়-উপযোগী অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ঋণও সমপরিমাণে বৃদ্ধি করে। রাষ্ট্রের চলতি ব্যয় বা cost payments সম্বন্ধে অধ্যাপক টেলর বলেন, এগুলি রাষ্ট্রের হাতে ব্যয়-উপযোগী অর্থের পরিমাণ কমিয়ে দেয়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ এদের দ্বারা কমে না ("cost payments are payments which reduce the usable funds of the treasury without reducing its debt obligations.") সুতরাং কোনও বছর রাষ্ট্র ঋণ পরিশোধের জন্য যে অর্থব্যয় করবে, তা ওই বছরে

রাষ্ট্রের চলতি ব্যয় বা cost payments-এর অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না। তবে, মনে রাখতে হবে, মূল ঋণ পরিশোধের ব্যয় চলতি ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত না হলেও রাষ্ট্রীয় ঋণের ওপর যে সুদ দিতে হয়, তা অবশ্যই ওই বছরের চলতি ব্যয়ের মধ্যে ধরতে হবে। এই সংজ্ঞাগুলি দেবার পর অধ্যাপক টেলর মন্তব্য করেছেন, বাজেটকে সুষম বা সমতাপূর্ণ বলা হবে, যদি ওই বিশেষ সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রের রাজস্বপ্রাপ্তি তার চলতি ব্যয়ের ঠিক সমান হয়। ("A budget is balanced if during the budget period, revenue receipts are exactly equal to cost payments.") অপরপক্ষে, রাজস্বপ্রাপ্তি চলতি ব্যয় অপেক্ষা বেশি হলে তিনি তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট আখ্যা দিয়েছেন রাজস্বপ্রাপ্তি চলতি ব্যয় অপেক্ষা কম হলে, তাঁর মতে একে ঘাটতি বাজেট বলা হবে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটি বেশ জটিল ও কঠিন। তাই শিক্ষার্থীদের কাছে অনুরোধ, অন্ততপক্ষে কয়েকবার এই অংশটি বিশেষ যত্নসহকারে পড়বেন ও বোঝার চেষ্টা করবেন।

ডালটন ও অন্যান্য অনেক অর্থনীতিবিদ অবশ্য বাজেটকে এইভাবে তিনভাগে বিভক্ত না করে সমতাপূর্ণ বা সুষম ও সমতাহীন এই দুভাগে ভাগ করেছেন। তাঁদের মতে, কেবলমাত্র চলতি ব্যয় ও রাজস্বপ্রাপ্তির পূর্ণসমতা হলেই তাকে সমতাপূর্ণ বাজেট বলা হবে না (কারণ, এ রকম সমতা প্রায় কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না—এটি একেবারে অবাস্তব ব্যাপার)। চলতি ব্যয় অপেক্ষা রাজস্বপ্রাপ্তি বেশি হলেও তাকে সুষম বা সমতাপূর্ণ বাজেট বলা হবে। অর্থাৎ তাঁরা অধ্যাপক টেলর বর্ণিত সুষম ও উদ্বৃত্ত—এই দুধরনের বাজেটকেই সুষম বা সমতাপূর্ণ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অধ্যাপক টেলর যাকে ঘাটতি বাজেট বলেছেন, ডালটনের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী তাকেই সমতাহীন বাজেট বলা হচ্ছে। উপরে দেখেছি, ঋণ থেকে সংগৃহীত অর্থ রাষ্ট্রের রাজস্বপ্রাপ্তির চেয়ে বেশি হলে ওই ঘাটতি মেটাতে রাষ্ট্রের পক্ষে নতুন অনুৎপাদক ঋণ সংগ্রহ ভিন্ন কোনও উপায় থাকে না। এই কারণেই সমতাপূর্ণ বা সুষম বাজেটের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ডালটন বলেছেন, "যদি হিসাব-নিকাশের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুৎপাদক রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি না পায়, তাহলে তাকেই সমতাপূর্ণ বাজেট বলা হবে।"

১৩.৫ সমতাপূর্ণ ও সমতাহীন বাজেটের সুবিধা-অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Balanced & Unbalanced Budgets)

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন, সমতাপূর্ণ বা সুষম বাজেটই রাষ্ট্রের পক্ষে আদর্শ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আর্থিক ব্যবস্থা প্রতি বছরই রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় সমান হওয়া দরকার, বাজেট ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত কিছুই থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে অখণ্ড বিশ্বাস থেকেই তাঁরা এই মতবাদ প্রচার করতেন তা বোধহয় ঠিক নয়; তাঁদের দৃঢ় ধারণা ছিল, একমাত্র সুষম বাজেটই রাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দিতে পারে এবং আর্থিক ব্যবস্থার এই স্থায়িত্বই (financial stability) দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ও বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয় সে সময়ে মোট জাতীয় ব্যয়ের একটি বিরাট অংশ ছিল; জাতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধিও তারই ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং রাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব না থাকলে, কোনও কারণে রাষ্ট্র ঘাটতি বাজেট ব্যবস্থা অবলম্বন করলে, শিল্পপতিরা বিশেষভাবে আতঙ্কিত হতেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়ে ফেলতেন। সুতরাং স্বভাবতই এই অবস্থায় সমতাপূর্ণ বাজেটই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা ফিসকাল নীতি বলে স্বীকৃতি লাভ করত।

ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদদের কাছে সমতাপূর্ণ বাজেটের এই নীতি আদর্শ এবং সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃতি লাভ করলেও আধুনিক অর্থনীতিবিদরা এই মত তেমন গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে, বারো মাস পরে প্রত্যেক বছর নিয়ম করে বাজেটে সমতা ঘটাতে হবে বা তারই মধ্যে যে কোনও প্রকারে আয়-ব্যয়ের হিসাবগত মিল করতেই হবে। এ জাতীয় ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ধরনের (unscientific and mechanical)। উপরন্তু, বাজেটে তথাকথিত সমতা সাধনেরই বা বিশেষ গুরুত্ব কি, আধুনিক অর্থনীতিবিদরা এই প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। দেশের কর্মসংস্থান, আয়স্তর, জীবনযাত্রার মান সব কিছুই ভারসাম্যবিহীন থাকল, কেবল শুধু বছরের শেষে বাজেটে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের নিছক সমতা রাখাটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—আধুনিক অর্থনীতিবিদরা তা স্বীকার করেন না। শুধু তাই নয়, তাঁরা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে বছরের শেষে বাজেট সমতা সাধনের নীতি বাণিজ্য সংকট ও বাণিজ্য সমৃদ্ধিকে গভীর সমস্যার মাঝে ফেলতে পারে; ফলে, ভারতীয় অর্থনীতির ওপর সমতাপূর্ণ বাজেটের প্রভাব বহুক্ষেত্রেই অত্যন্ত অবাঞ্ছিত হতে বাধ্য। বাণিজ্য-সংকটের সময়ে রাষ্ট্রীয় আয় কম থাকায় সমতার নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রকে (১) উচ্চহারে কর বসাতে হবে এবং (২) রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমাতে হবে—এই দুই ধরনের ব্যবস্থাই সংকটকে তীব্রতর করে তুলবে। আমরা আগেই জেনেছি, বাণিজ্যচক্রের প্রতিরোধ করতে হলে সংকটের সময়ে করের বোঝা কমাতে হয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়াতে হয়—একমাত্র এই অবস্থাতেই জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে কিছুটা সহায়তা হতে পারে। অথচ, বাজেট সমতার নীতি অনুসরণ করতে হলে এরই সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং, বাজেট সমতার নীতি অনুযায়ী সমৃদ্ধির যুগে (১) রাষ্ট্রীয় ব্যয় বেশি থাকে এবং (২) করের বোঝা কমিয়ে দেওয়া হয়—এই দুই অবস্থাতেই মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, সমৃদ্ধির অবসান ঘটতে শুরু করে ও আগামী সংকটের আর্বিভাব অনেকখানি এগিয়ে আসে।

সাফল্যের সঙ্গে বাণিজ্যচক্রের প্রতিরোধে সমতাহীন বাজেটের ফিসকাল নীতি ১৯২৯-৩০ সালের পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য সংকটের সময়ে সর্বপ্রথমে গৃহীত হয়। কেইনস প্রমুখ অর্থনীতিবিদরা ওই সময়েই বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিসকাল নীতির ব্যাখ্যা করেন এবং দৃঢ়ভাবে এই মত প্রচার করেন যে জাতীয় অর্থনীতি বাণিজ্য সংকটের সম্মুখীন হলে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকলে চলবে না। নানারকম নির্মাণকাজের পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য সমতাহীন ঘাটতি বাজেটের নীতি তাকে গ্রহণ করতে হবে যাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে; সমতাহীন বাজেট চালু করার জন্য হয় নতুন রাষ্ট্রীয় ঋণ সংগ্রহ করতে হবে অথবা সরাসরি ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদদের প্রচারিত বাজেট সমতার নীতি তখন এতই প্রভাবশালী ছিল যে তাঁরা ওই নীতি পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত সর্বসমক্ষে খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করেন এবং তার ফলে উদ্ভব হয় মূলধনি বাজেটের (Capital budget) রাজস্ব বাজেটের (Revenue budget)—পরিপূরক হিসাবে। কোনও কোনও দেশ আবার এই পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থাকালীন বা সংকটকালীন বাজেট (Emergency Budget) প্রণয়ন করতে আরম্ভ করে। (এই সব বিভিন্ন ধরনের বাজেট সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।)

সমতাহীন বা ঘাটতি বাজেটের সমর্থনে উপরে যেসব যুক্তি দেখানো হয়েছে, সেগুলি মোটামুটিভাবে ঠিক হলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে বাণিজ্য সংকট থেকে জাতীয় অর্থনীতিকে পুনরায় অভ্যুদয়ের পথে এগিয়ে দেবার উপযুক্ত পরিবেশ সুষম বা সমতাপূর্ণ বাজেট ব্যবস্থার মাধ্যমেও গড়ে তোলা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,

বাণিজ্য সংকটের সময় মজুরির হার কমিয়ে কমে-যাওয়া জাতীয় আয়স্তরের সঙ্গে ঠিকমতো মিলিয়ে দিতে পারলে, সমতাপূর্ণ বাজেটের মধ্যেই বেকারসমস্যার সমাধান বেশ সাফল্যের সঙ্গেই করা যায় এবং পরিপূরক ব্যয়বৃদ্ধি, অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ প্রভৃতি ফিসকাল অস্ত্রগুলি ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। বাজেট সমতা নীতির সমর্থনে ও সমতাহীন ঘাটতি বাজেটের সাহায্যে জাতীয় আয়স্তর ও পূর্ণ কর্মসংস্থান সংরক্ষণ করা সম্ভব হলেও, এর দ্বারা অর্থনৈতিক সমস্যার কোনও স্থায়ী সন্তোষজনক সমাধান করা সম্ভব হয় না, কারণ ঘাটতি বাজেট পদ্ধতি অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ফিসকাল অস্ত্র হলেও নিঃসন্দেহে এটি একটি অতি বিপজ্জনক অস্ত্র এবং একটানা দীর্ঘকাল এর প্রয়োগ হলে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবী।

আধুনিক অর্থনীতিবিদরা অবশ্য একথা স্বীকার করেন না যে ঘাটতি বাজেট থেকে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবী। তাঁরা বলেন, ঘাটতি বাজেটের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে কিনা তা নির্ভর করে প্রধানত দুটি বিষয়ের ওপর : (১) ঘাটতির পরিমাণ ও (২) ঘাটতি ব্যয় থেকে পাওয়া রাষ্ট্রীয় আয়ের যথাযথ ব্যবহার। ঘাটতির পরিমাণ যদি যুক্তিপূর্ণ সীমার মধ্যে পরিমিত রাখা যায় এবং ঘাটতি ব্যয় যদি উৎপাদনশীল পরিকল্পনার অন্তর্গত কাজে ঠিকমতো প্রয়োগ করা হয়, তবে মূল্যস্তর সামান্য পরিমাণ ঊর্ধ্বমুখী হবে (যা জাতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধির শিখরে মোটামুটি স্থায়িভাবে থেকে যাওয়ার পক্ষে সহায়ক), কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির কোনও আশঙ্কা থাকবে না। অপরপক্ষে, ঘাটতির পরিমাণ যদি যথেষ্ট বেশি হয় এবং ঘাটতি ব্যয়বৃদ্ধি প্রধানত অনুৎপাদনশীল হয় যার সম্ভাবনা একেবারে নেই একথা বলা চলে না—তাহলে ঘাটতি বাজেট নিশ্চিতভাবেই মুদ্রাস্ফীতির পথ প্রশস্ত করে দেবে। ঠিক কতটুকু ঘাটতি ব্যয় নিরাপদ, দুর্ভাগ্যক্রমে তার কোন মানদণ্ড নেই। অপর দিকে, ঘাটতি ব্যয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এটিই সর্বপ্রধান অখণ্ডনীয় যুক্তি এবং এই আশঙ্কা থাকার জন্যই আধুনিক অর্থনীতিবিদরাও একাদিক্রমে দীর্ঘকাল এর প্রয়োগ ও ব্যবহার অনুমোদন করেন না।

এখন বিভিন্ন ধরনের বাজেট ও বাজেট ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে প্রধান কয়েকটি প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে আমরা বাজেট সংক্রান্ত এই দীর্ঘ আলোচনা শেষ করব।

১৩.৬ বিভিন্ন ধরনের বাজেট ও বাজেট ব্যবস্থার সংস্কার (Types of Budgets & Proposals for Budgetary Reform)

(১) মূলধনি বাজেট (Capital Budget)

সাম্প্রতিককালে অনেক অর্থনীতিবিদ চলতি বাজেটের (revenue/current budget) পরিপূরক হিসাবে মূলধনি বাজেট (capital budget) প্রণয়নের নীতি সমর্থন করেছেন। পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য নতুন রেলপথ তৈরি, জাতীয় সড়ক তৈরি, সেচব্যবস্থার উন্নতির জন্য বহু অর্থব্যয়ে বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নির্মাণকার্যের জন্য রাষ্ট্রের যে ব্যয় হয় তা এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের একই ধরনের ব্যয় এই মূলধনি বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই জাতীয় ব্যয়ের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, এগুলি মাত্র একবারই করতে হয়—প্রতি বছর এর জন্য আবার বিপুল রাষ্ট্রীয় ব্যয় করার প্রয়োজন হয় না (non-recurring expenditure)। এই বিশেষ ধরনের

বিনিয়োগধর্মী ব্যয়ের জন্য অর্থসংস্থান করা হয়, নতুন রাষ্ট্রীয় ঋণ সংগ্রহের দ্বারা। সুতরাং রাষ্ট্রের চলতি আয় এবং ব্যয় থেকে এই জাতীয় প্রাপ্তি ও ব্যয় সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের, এগুলি চলতি বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করলে বিরাট ঘাটতি দেখা দেবে এবং ওই বাজেটে সমতা আনতে গেলে, রাষ্ট্রীয় ঋণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি করতে হবে অথবা খোলাখুলিভাবে ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। আধুনিক যুগের সাধারণ শিক্ষিত দায়িত্বশীল নাগরিকমাত্রই অবশ্য বোঝেন, এই ধরনের বিনিয়োগধর্মী ব্যয়ের জন্য অর্থসংস্থান করতে হলে রাষ্ট্রীয় ঋণবৃদ্ধিতে বা ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতি অবলম্বন করলে কোনও ক্ষতি হয় না, কিন্তু এই শতাব্দীর প্রথম ভাগেও বাজেট ঘাটতি বা রাষ্ট্রীয় ঋণের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি আতঙ্কের কারণ বলে মনে করা হত। সুতরাং ১৯৩০ সালের পর পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলা কবার জন্য যখন রাষ্ট্রের বিনিয়োগ ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দিল এবং এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য ঘাটতি বাজেটের ফিসকাল নীতির প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে উঠল, তখন থেকেই চলতি বাজেটের পরিপূরক মূলধনি বাজেট চালু করা হল। অধ্যাপক ডিউয়ের অনবদ্য ভাষায়, 'General adoption of the system (of separate capital budgets) resulted from the desire of the governments to facilitate the incurring of deficits for purposes of fiscal policy in periods of depression, particularly during the 1930's (Government Finance, p. 64) অর্থাৎ "১৯৩০-এর দশকে অর্থনৈতিক সংকটের সময় ফিসকাল নীতির অঙ্গ হিসাবে ঘাটতি বাজেটের জায়গায় চলতি বাজেটের পরিপূরক হিসাবে পৃথক মূলধনি বাজেট অন্তর্ভুক্ত করার পদ্ধতি চালু করা হল।" অধ্যাপক ডিউ আরও বলেছেন, ১৯৪০ সালের পর থেকে এই দ্বিধাবিভক্ত বাজেট ব্যবস্থা অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের জন্য পরিকল্পিত দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ সহজতর করার উদ্দেশ্যে সর্বত্র গৃহীত হয়েছে এবং এর ফলে কোথাও গুরুতর কোনও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে, প্রধানত সুইডেনে এই ব্যবস্থা প্রথম চালু করা হয়। ধীরে ধীরে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষেও ১৯৪৬ সাল থেকে পৃথক মূলধনি বাজেট প্রণয়নের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বাজেট সংস্কারের এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব এবং উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, এই ব্যবস্থা বর্তমানে প্রায় সর্বত্র গৃহীত হয়েছে।

(২) জরুরি অবস্থাকালীন বা সংকটকালীন বাজেট (Emergency Budget)

যুদ্ধ, বাণিজ্য সংকট অথবা অপর কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে যখন রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়, তখন নিয়মিত চলতি বাজেটের পাশাপাশি দ্বিতীয় একটি জরুরি অবস্থাকালীন বাজেট প্রণয়নের প্রস্তাব আধুনিক কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ করেছেন। ১৯৩৩ সালে বাণিজ্য সংকটের সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের দ্বিধাবিভক্ত বাজেট ব্যবস্থা চালু করে। বাজেট ব্যবস্থা সংস্কারের এটি আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব। অধ্যাপক টেলর অবশ্য একে দ্বিধাবিভক্ত বা বহুবিধ বাজেটের (double or multiple budgeting) দৃষ্টান্ত হিসাবে স্বীকার করেননি। তিনি এর কোনও উল্লেখযোগ্য সুবিধাও খুঁজে পাননি, বরং তাঁর মতে, এই ধরনের ব্যবস্থা বাজেট প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনসাধারণের মনে নানারকম সন্দেহ জাগিয়ে তুলে কিছুটা অবাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

মূলধনি বাজেট ও জরুরি অবস্থাকালীন বাজেট— উভয়ই দ্বিধা-বিভক্ত বাজেটের দৃষ্টান্ত হলেও এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে এবং তা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। মূলধনি বাজেটের অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবিত ব্যয় মূলত বিনিয়োগ ব্যয়; জরুরি অবস্থাকালীন বাজেটের অন্তর্গত প্রস্তাবিত ব্যয় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ ব্যয় নয়। যুদ্ধজনিত জরুরি অবস্থাকালীন যে কোনও একটি বাজেটের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এই পার্থক্য যে কত গভীর তা সহজেই বোঝা যায়।

(৩) বাণিজ্যচক্রকালীন বাজেট (Cyclical Budget)

উপরে বাজেট সংস্কারের যে দুটি প্রস্তাবের আলোচনা করা হয়েছে, তাদের সমর্থকরা বাজেট সমতার প্রাচীন নীতিটি অবৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক ও অকেজো বলে বিশ্বাস করলেও খোলাখুলিভাবে ওই নীতি পরিহার করেছেন, একথা স্বীকার করতে চান না। তাঁদের এই মনোভাবের দ্বারা তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে বাজেট-সমতার নীতির গুরুত্ব মেনে নিয়েছেন, একথা বললে ভুল বলা হয় না।

বাজেট সমতার প্রাচীন নীতি পরিত্যাগ না করে, এর দোষত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে, আধুনিক কালের কিছুসংখ্যক সুইডিশ অর্থনীতিবিদ বাজেট সংস্কারের জন্য তৃতীয় এক ধরনের বাণিজ্যচক্রাকালীন বাজেট গঠনের প্রস্তাব করেছেন। তাঁদের মতে, সমতাপূর্ণ বাজেট গঠনের চিরাচরিত নীতি ভালই, তবে ক্যালেন্ডারের বারো মাসে একবছর হিসাব করে তারই মধ্যে আয় ও ব্যয় সমান না হলেও ক্ষতি নেই। সমৃদ্ধির যুগ ও সংকটের যুগ—এই দুই যুগ মিলিয়ে যে বাণিজ্যচক্র কাল—তার মধ্যে বাজেটের আয় ও ব্যয় সমান হলেই চলবে। সংকটের যুগে কয়েক বছর বাজেট ঘাটতি থাকবে, কেননা সংকটাবস্থা থেকে ধাপে ধাপে জাতীয় অর্থনীতির ওপরে ওঠবার জন্য ওই সময়ে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ কিছুটা বাড়াতেই হবে। সংকটকালের শেষে ক্রমে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমাতে হবে, সমৃদ্ধির যত প্রসার হবে বাজেট ঘাটতি তত কমবে এবং শেষ পর্যন্ত জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলা হবে, কিন্তু ওই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির ফলে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হওয়ায় বাজেটে প্রচুর উদ্বৃত্ত দেখা দেবে। এককথায়, সংকটের যুগের ঘাটতি সমৃদ্ধির উদ্বৃত্তের দ্বারা পুষিয়ে নিতে হবে। সুতরাং সংকট ও সমৃদ্ধির যুগের, অর্থাৎ সম্পূর্ণ একটি বাণিজ্যচক্রের জন্য একটি বাজেট তৈরি করতে হবে—আলদা আলদা বছরের জন্য আলদা আলাদা বাজেট নয়—এবং ওই বাজেট স্বচ্ছন্দেই সমতার নীতি অনুসরণ করে গঠিত হতে পারে।

কিন্তু চক্রকালীন বাজেট গঠনের এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ এখনও পর্যন্ত বিশেষ কোনও দেশে হয়নি, কারণ এর কিছু প্রয়োগগত অসুবিধা রয়েছে। আগামী বাণিজ্যচক্র ঠিক কবে আসবে; ঘাটতি বা উদ্বৃত্তের পরিমাণ কেমন হতে পারে—এসব তথ্য সঠিকভাবে অনুমান করে তার ভিত্তিতে বাজেট তৈরি করা বাস্তবে খুবই অসুবিধাজনক ও কঠিন ব্যাপার—অসম্ভবই বলা যেতে পারে। সুতরাং তাত্ত্বিক বিচারে বাণিজ্যচক্রকালীন বাজেট গঠনের প্রস্তাবটি যথেষ্ট আকর্ষণীয় হলেও এর বাস্তব প্রয়োগ একেবারেই অনিশ্চিত।

বাজেট সংস্কারের যে প্রস্তাবগুলি উপরে আলোচনা করা হল, তার মধ্যে তৃতীয়টি গৃহীত হলে বাজেট ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির চিরন্তন অভিশাপ বাণিজ্যচক্রের প্রতিরোধ ও অন্যান্য

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে বাজেটই যে রাষ্ট্রের হাতে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, তাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে। তবে বাণিজ্যচক্রকালীন বাজেট গঠনের প্রস্তাব কার্যকরি করার বাস্তব অসুবিধার দরুন, এ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হতে সম্ভবত এখনও অনেক দেরি হবে। তবে, পৃথিবীর সকল দেশেই অন্যান্য অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যেভাবে বাজেটের ব্যবহার ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে, তা থেকে একথা দৃঢ়ভাবেই ঘোষণা করা যাবে যে, বাজেটই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা কার্যকরি ও শক্তিশালী অস্ত্রবিশেষ।

১৩.৭ কার্যমাফিক বা কার্য-অনুসারী বাজেট (Performance Budgeting)

বাজেট ব্যবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে এতক্ষণ যে আলোচনা হল, এবার তা শেষ করা হবে সম্পূর্ণ একটি নতুন বিষয়ের অবতারণা করে। বিষয়টি এখনও খুব বেশি ব্যাপকভাবে চালু হয়নি, তবে ভবিষ্যতে হতেও পারে। ইংরেজিতে এটিকে Performance Budgeting বলা হয়। আমরা এর বাংলা অনুবাদ করছি "কার্যমাফিক বা কার্য অনুসারী বাজেট ব্যবস্থা।"

এই নতুন বাজেট ব্যবস্থাটি প্রথম চালু হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫০ সালে। পরবর্তীকালে তৃতীয় বিশ্বে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশ কিছুসংখ্যক উন্নয়নশীল দেশেও এটি চালু করা হয়েছে। ভারতবর্ষেও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কয়েকটি বিভাগে যেখানে অর্থব্যয়ের পরিবর্তে সুফল ও সাফল্যলাভ আশা করা যায়—যাদের বলা হয় (result oriented department)—সেখানেও এই ব্যবস্থা হয় প্রবর্তন করা হয়েছে নতুবা শীঘ্র চালু করার প্রস্তুতি চলেছে। জন-প্রশাসন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ মোহিত ভট্টাচার্য পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করে এই কথাই বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, "পরিকল্পনা সম্পর্কিত কমিটি (The Committee on Plan Projects) যেন এ বিষয়ে খুব ভালভাবে বিচার করে দেখে যে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিভাগীয় প্রকল্পগুলি আগের তুলনায় কিছুটা স্বল্পব্যয়ে ও অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে রূপায়িত হতে পারে কিনা।" তাঁর বক্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন (Administrative Reforms Commission) ১৯৬৮ সালে তাঁদের রিপোর্টে বলেছিলেন, নতুন এই কার্যমাফিক বাজেট ব্যবস্থা অন্ততপক্ষে কয়েকটি বিভাগ বা মন্ত্রকে যেন চালু করা হয়, যেগুলি সরাসরি উন্নয়নপ্রকল্পগুলি রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছে, যেমন কৃষি-ব্যবস্থা, জলসেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য বিষয়টির আরও গভীরে প্রবেশ করে জানিয়েছেন কিভাবে এই কার্যমাফিক বাজেট ব্যবস্থা চালু করা যায়। সরকারি বিভাগগুলি, মন্ত্রকগুলি অথবা পরিকল্পনা ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির মধ্যে থেকে বেশ কয়েকটি প্রথমে বেছে নিতে হবে যারা এই নতুন ব্যবস্থার আওতায় আসতে পারবে ও সাফল্য অর্জন করতে পারবে। এর পরে ওই সংগঠনগুলির কার্যক্রম তৈরি করতে হবে এবং প্রত্যেকটি প্রকল্প রূপায়ণের জন্য আর্থিক প্রয়োজনের হিসাবও পৃথক-পৃথকভাবে তৈরি করতে হবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাগুলিও (targets) সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে। পরিকল্পনা রূপায়ণে ওই সংগঠনগুলির অতীত ইতিহাস, তাদের সাফল্য, বর্তমান অবস্থা, বিশেষত শ্রমিকদের কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহ—যাকে এখন work-

culture বলা হচ্ছে—সমস্ত তথ্যই দিতে হবে এবং মোট যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তার বিস্তারিত হিসাবও অবশ্যই ঐ সঙ্গে থাকবে। এই তথ্যগুলি একত্রিত করলে আমরা যা পাব তাকেই বলা হচ্ছে কার্যমাফিক বাজেট ব্যবস্থা বা Performance Budgeting.

জন-প্রশাসন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ আর একজন ভারতীয় অধ্যাপক বলেছেন : কার্যমাফিক বাজেট কোনও বিভাগে, মন্ত্রকে বা সংস্থায় চালু করতে হলে এভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। প্রথমত, যে সংস্থা এই ধরনের বাজেট রূপায়ণের দায়িত্ব নেবে তাদের ওই ধরনের কাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে এবং সেই সঙ্গে তাদের সংস্থার ওই জাতীয় কাজ করবার পক্ষে উপযুক্ত কর্মীমণ্ডলী আছেন কিনা দেখতে হবে। দ্বিতীয় ধাপটি আরও গুরুত্বপূর্ণ : প্রকল্পটির রূপায়ণের জন্য মোট আর্থিক প্রয়োজনের পরিমাণ কত হবে এবং সেই পরিমাণ অর্থ কোন্ কোন্ কাজের জন্য কতটা লাগবে, তার বিস্তারিত হিসাব। এই হিসাবের মধ্যে থাকবে প্রত্যেকটি কাজের বা তার অংশবিশেষের জন্য কর্মীদের মাইনে ও অন্যান্য আর্থিক পাওনা যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Establishment charges, যাতায়াতের জন্য মোট খরচ, কাঁচামাল অথবা প্রয়োজনী অন্যান্য উপকরণ কেনার জন্য মোট অর্থের প্রয়োজন ইত্যাদি। তৃতীয় দফার হিসাবের মধ্যে থাকবে বিভিন্ন ধরনের প্রত্যেকটি কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন, ওই পরিমাণ প্রয়োজনীয় অর্থের যৌক্তিকতা এবং সব শেষে উল্লেখ থাকা চাই, ওই পরিমাণ অর্থ কোন্ উৎস থেকে কিভাবে পাওয়া যাবে। এই শর্তগুলি পূরণ করলে তবেই এ ব্যবস্থাকে কার্যমাফিক বা কার্য-অনুসারী বাজেট বলা হবে।

এই নতুন ধরনের বাজেট ব্যবস্থার অনেকগুলি সুবিধা বা গুণ আছে, যেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করাটা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। প্রথমত, এই ব্যবস্থায় স্বীকৃত সরকারি নীতি ও যে সরকারি বিভাগে ওই নীতিকে রূপদান করছে, তাদের মধ্যে একটা গভীর আদান-প্রদানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, ফলে ওই কাজটি অনেক দ্রুত সুসম্পন্ন হয় এবং সম্ভবত আর্থিক দিক থেকেও খরচ অনেকটা কমে যায়। সরকারি যে বিভাগটি ওই কাজটি করছে, তারা কাজের প্রতিটি খুঁটিনাটি অবস্থার কথা অত্যন্ত ভালভাবে জানার ফলে কাজটি অনেক সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হয়। বর্তমান অবস্থায় অন্য বিভাগগুলি ও তাদের কাজের মান কেমন—তার সঙ্গে তুলনা করলে, একথাটির তাৎপর্য ও সত্যতা বেশ পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাবে। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থায় ওই কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগটির আর্থিক দায়বদ্ধতা অনেক বেশি হবে এবং সেই সঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদ-সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি কার্যকর হবে এবং এই সার্বিক সুবিধার জন্য কাজটি অনেক বেশি সুসম্পন্ন হবে। সুতরাং আমাদের দেশ ও তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এ ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালু করতে পারলে সব দিক দিয়েই ভাল হবে। সেই সুদিনের অপেক্ষায় আমরা বসে থাকছি।

১৩.৮ অনুশীলনী

(১) বাজেট কাকে বলে এবং এর প্রয়োজনীয়তা কি?

(২) সুষম বনাম সমতাহীন বাজেট একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(৩) বাজেট ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য যে বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কোন্‌টি আপনি গ্রহণ করতে আগ্রহী?

(৪) কার্যমাফিক বা কার্য-অনুসারী বাজেট ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার মতামত কি এবং এদেশে ওই ব্যবস্থার প্রবর্তন আপনি কি সমর্থন করেন?

১৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

1. Due – Government Finance.
2. Taylor – Public Finance.
3. Bhattacharya, Mohit–New Horizons of Public Administration.
4. Basu, Rumki – Public Administration : Concepts and Theories.

একক ১৪ ☐ কেন্দ্রীয় বাজেট প্রণয়ন, অর্থ কমিশনের সুপারিশ ও ভারতের রাষ্ট্রীয় ঋণ

গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য
১৪.২ প্রস্তাবনা
১৪.৩ কেন্দ্রীয় বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন
১৪.৪ অর্থ কমিশন
১৪.৪.১ ব্যক্তিগত আয়কর বণ্টন
১৪.৪.২ কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের বণ্টন
১৪.৪.৩ কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলির নিকট সম্পদ হস্তান্তর
১৪.৫ ভারতের রাষ্ট্রীয় ঋণ
১৪.৬ অনুশীলনী
১৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.১ উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এই এককটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই এককটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন :

- ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় বাজেট প্রণয়ন এবং সংসদ কর্তৃক তা অনুমোদনের কি ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে।
- অর্থ কমিশনের গঠন, কার্যাবলী, কমিশনের সুপারিশ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলিও সংক্ষেপে আপনি জানতে পারবেন।
- ইদানীংকালে কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলির কাছে কিভাবে ও কি পরিমাণে সম্পদ হস্তান্তর হয়েছে, এ বিষয়েও আপনি অনেক তথ্য জানবেন।
- ভারতের রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে এর পরে আলোচনা হবে এবং এর ফলে কোনও জটিল সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে কিনা, তাও জানতে পারবেন।

১৪.২ প্রস্তাবনা

রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আগের পর্যায়ের শেষ এককটিতে অতি সাধারণভাবে ও অত্যন্ত সংক্ষেপে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামো ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদের কিছুটা ধারণা

দেবার চেষ্টা করেছি। এখন আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। সংবিধানে বাজেট তৈরি, অনুমোদন ও প্রয়োগ সম্পর্কে যতটুকু তথ্য আছে আপনাদের তা জানাব। সেই সঙ্গে নানারকম সমস্যার কথাও আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

অর্থ কমিশনের গঠন এবং তার কার্যাবলী সম্পর্কেও এর পরে বিস্তারিত আলোচনা হবে। ইদানীংকালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রাজ্যগুলির কাছে সম্পদ হস্তান্তর ও তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যগুলির আর্থিক স্বাধীনতার প্রশ্নটি এই প্রসঙ্গে তুলে ধরা হবে। সব শেষে রাষ্ট্রীয় ঋণ, তার দ্রুত বৃদ্ধি ও এ বিষয়ে উদ্বেগের কারণ আছে কিনা, তা নিয়েও আলোচনা করা হবে।

১৪.৩ কেন্দ্রীয় বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন (Preparation and Approval of Central Budget)

আমাদের সংবিধানের ১১২ নং ধারায় বলা হয়েছে, "The President shall in respect of every financial year cause to be laid before both the Houses of Parliament a statement of the estimated receipt and expenditure of the Government of India for that year, in this part referred to as the annual financial statement," অর্থাৎ প্রত্যেক আর্থিক বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের একটি হিসাব রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সামনে উপস্থাপিত করাবেন এবং এই হিসাবটিকে বলা হবে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণ। সাধারণ ভাষায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের এই বিবরণটিকেই বলা হয় বাজেট বা কেন্দ্রীয় বাজেট। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী যে কোন বছরের ১ এপ্রিল থেকে আর্থিক বছরের শুরু হয় এবং পরের বছর ৩১ মার্চ পর্যন্ত তার কার্যকাল। সংবিধানে আরও বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সারা বছরের খরচের এই হিসাব দুটি অংশে ভাগ করা হবে : (১) প্রথম অংশে থাকবে পুঞ্জীভূত রাষ্ট্রীয় তহবিল (Consolidated Fund of India) থেকে সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী সংসদের কোন অনুমোদন ছাড়াই সারা বছরে যেসব ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থ খরচ করা যাবে, যাকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে "expenditure charged upon the Consolidated Fund of India" এবং (২) দ্বিতীয় অংশে থাকবে সংসদের অনুমোদনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সারা বছরের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খাতে মোট ব্যয়। একই ধারায় আরও বলা হয়েছে, আয়-ব্যয়ের এই হিসাবটির মধ্যে (যাকে আমরা বাজেট বলে থাকি)। দুটি ভাগ থাকবে, একটিকে বলা হবে চলতি বা রাজস্ব খাত (Current অথবা Revenue Account) এবং অন্যটি মূলধনি খাত (Capital Account)। বাৎসরিক সরকারি আয় ও ব্যয়ের হিসাব বাজেটের চলতি খাতে এবং মূলধনি জিনিসপত্রের আয় ও ব্যয়ের হিসাব মূলধনি খাতে লিপিবদ্ধ করা হবে।

সংসদের অনুমোদন ছাড়াই যে সমস্ত খাতে সারা বছরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করা যায়, সেগুলি হল:

(১) রাষ্ট্রপতির মাহিনা, পেনশন, তাঁর জন্য অন্যান্য খরচপত্র এবং তাঁর অফিসের জন্য যাবতীয় অন্য সব রকমের খরচপত্র ;

(২) রাজ্যসভার সভাপতি (অর্থাৎ উপরাষ্ট্রপতি) ও উপসভাপতির এবং লোকসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের মাহিনা ও সারা বছর তাঁদের এবং তাঁদের অফিস সংক্রান্ত অন্য সব রকমের খরচপত্র ;

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের যেসব ঋণ গ্রহণ বা সংগ্রহ করেছে, সেইসব ঋণবাবদ দেয় বাৎসরিক সুদ, অন্যান্য খরচপত্র এবং সময়মত ঋণ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় মোট অর্থ (বলা বাহুল্য, দেশের ভিতর থেকে বা বিদেশ থেকে সংগৃহীত সব রকমের ঋণ সম্পর্কেই এই ব্যবস্থা চালু আছে) ;

(৪) সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের মাহিনা, পেনশন এবং তাঁদের জন্য দেয় অন্য সব রকমের খরচপত্র ;

(৫) বিভিন্ন রাজ্যে হাইকোর্টের বিচারপতিদের পেনশন ও অন্যান্য খরচপত্র ;

(৬) রাষ্ট্রীয় ব্যয়নিয়ন্ত্রণ ও হিসাব পরীক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ অধিকারিকের (Comptroller and Auditor General of India) মাহিনা, পেনশন ও অন্যান্য খরচপত্র ;

(৭) কোন আদালত বা ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের ভিত্তিতে দেয় প্রয়োজনীয় অর্থ, এবং সব শেষে

(৮) সংবিধান বা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যে কোন ধরনের ব্যয়।

উপরের তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, এমন বিষয় বাদে অন্য যে কোন খাতে সারা বছরের প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যয় বিভিন্ন বিভাগ অনুযায়ী লোকসভায় রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরা সংসদে পেশ করেন। মূল বাজেটটি যার মধ্যে বিভিন্ন খাতে আয়ের হিসাব বা কোন কর সংক্রান্ত কোন পরিবর্তনের প্রস্তাব সহ যে দীর্ঘ বিবৃতিটি থাকে—তা অবশ্য দিয়ে থাকেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়বরাদ্দ নির্দিষ্ট দিনে পেশ করেন বিভাগীয় মন্ত্রীমহাশয় এবং বিভাগটির গুরুত্ব অনুযায়ী সংসদ সেটি আলোচনার জন্য সময় ধার্য করে দেন এবং সময়ের শেষে ভোটের মাধ্যমে বাজেটের এই অংশটি লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে থাকে; কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রীমহাশয় কিছু কিছু প্রস্তাবিত পরিবর্তনও গ্রহণ করে থাকেন। তবে, বড়ই দুঃখের বিষয়, সময়ের স্বল্পতা ও অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে হট্টগোলের ফলে বিভাগীয় এই বাজেটগুলি ঠাণ্ডা মাথায় সুচিন্তিত আলোচনার পর অনুমোদন লাভ করে না। শেষ দিনে, বাকি সমস্ত বিভাগীয় খরচের প্রস্তাব প্রায়শই কোন আলোচনা ছাড়াই একটি বিরাট গুচ্ছের মতো অনুমোদিত হয়ে থাকে। লোকসভায় অনুমোদনের পর রাজ্যসভায় সেগুলি পেশ করা হয় এবং বলা বাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন আলোচনা বা পরীক্ষা ছাড়াই সেখানে সেগুলি পাস হয়ে যায় এবং পরবর্তী ধাপে, সেগুলি রাষ্ট্রপতির সম্মতি বা অনুমোনের জন্য তাঁর সামনে পেশ করা হয়।

বিভিন্ন বিভাগের বা মন্ত্রকের সারা বছরের খরচের হিসাব তৈরি যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এজন্য বিভিন্ন স্তরে অনেক বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন হয়। আমাদের এই সংসদীয় গণতন্ত্রে কেন্দ্রীয় বাজেট প্রণয়নের ওপর সংসদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন হয়, যার নাম 'প্রস্তাবিত আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কমিটি' (Estimates Committee)। এই কমিটি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিভাগীয় উচ্চ পদাধিকারী আমলাদের সঙ্গেও বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করে থাকেন। অপরপক্ষে, নতুন করস্থাপন, কর-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন বা রাষ্ট্রীয় আয়বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব থাকেল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী স্বয়ং গণতান্ত্রিক আদর্শের মর্যাদা রক্ষার জন্য বাজেট পেশের কয়েকদিন আগে দফায় দফায় অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতাগণের সঙ্গে এবং শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী সংস্থাসমূহের সঙ্গেও আলোচনা করেন এবং ওইসব আলোচনার ভিত্তিতে তাঁর বহু

প্রত্যাশিত বাজেট-বক্তৃতাটি তৈরি হয়। কোন বিভাগের অর্থের প্রয়োজন হলে, বছরের শেষ ভাগে পরিপূরক অনুদান (Supplementary Grant) সম্পর্কে সংসদে প্রস্তাব পেশ করা হয় এবং এইভাবেই ভারতবর্ষে বছরের পর বছর কেন্দ্রীয় বাজেট প্রণয়ন, আলোচনা, সংসদীয় অনুমোদন এবং সব শেষে রাষ্ট্রপতির সম্মতি সহ কার্যকর হয়।

১৪.৪ অর্থ কমিশন (Finance Commission)

কেন্দ্রীয় বাজেট প্রণয়ন, অনুমোদন এবং তা কার্যকর করা সম্পর্কে আমাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় যে পদ্ধতি ও ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে উপরে আমরা সে সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই প্রসঙ্গে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ও তাদের কাজের কিছুটা পরিচয় না দিলে আমাদের দায়িত্ব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাই আমরা সে সম্পর্কে কিছু তথ্য পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরব।

আমাদের সংবিধানের ২৮০ নং ধারায় বলা হয়েছে, "The President shall, within two years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every fifth year or at such earlier time as the President considers necessary, by order constitute a Finance Commission which shall consist of a Chairman and four other members to be appointed by the President", অর্থাৎ আমাদের সংবিধান চালু হবার ২ বছরের মধ্যে এবং পরবর্তীকালে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর রাষ্ট্রপতি বিশেষ আদেশবলে একজন চেয়ারম্যান ও ৪ জন সদস্য নিয়ে একটি অর্থ কমিশন (Finance Commission) গঠন করবেন। রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন মনে করলে, পাঁচ বছরের আগেও যে কোন সময়ে এই কমিশন গঠন করতে পারবেন। এই কমিশনের সভ্যদের কি ধরনের যোগ্যতা থাকবে এবং কেমন করে তাঁরা এই সংস্থার সভ্য হিসাবে নিয়োজিত হবেন—এ সম্পর্কে আমাদের সংসদ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সব নির্ধারণ করে দেবেন। সংবিধান যে সমস্ত কর বা শুল্ক কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করেছেন, সেগুলি কিভাবে বণ্টন করা হবে সে সম্পর্কে এবং রাজ্যগুলির মোট প্রাপ্য অর্থ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কোন্ নীতি অনুসারে ভাগ হবে—এই সমস্ত ব্যাপার সম্পর্কে তাঁরা রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁদের পরামর্শ দেবেন। এ ছাড়াও, কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে বিভিন্ন রাজ্যকে কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য বা অনুদান দেওয়া হবে, সে বিষয়েও তাঁরা তাঁদের বক্তব্য রাখবেন। রাষ্ট্রপতি তাঁদের রিপোর্ট সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত সহ পুরো ব্যাপারটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সংসদে পেশ করবেন।

সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে প্রয়াত কে সি নিয়োগীর সভাপতিত্বে প্রথম অর্থ কমিশনটি গঠিত হয় এবং ১৯৫২ সালের ১ এপ্রিল থেকে এই কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতি কমিশনের প্রত্যেকটি সুপারিশ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতি, সংসদ ও কেন্দ্রীয় সরকার এই নীতিই মেনে চলেছেন।

আগেই বলা হয়েছে, অর্থ কমিশনগুলির প্রধান কাজ হল, সংবিধান যে সমস্ত কর বা শুল্ক কেন্দ্র ও রাজ্যগুলর মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করেছে, সেগুলি কিভাবে বণ্টন করা হবে এবং রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার কি পরিমাণ অনুদান বা ঋণ দেবে, সে বিষয়ে তারা রাষ্ট্রপতি মারফত সংসদে তাদের সুপারিশ জানাবে। বণ্টনযোগ্য

কর বা শুল্কের মধ্যে যে দুটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং যেগুলি থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ রাজ্য সরকারগুলি পেয়ে থাকে, সেগুলি হল ব্যক্তিগত আয়কর (কোম্পানি আয়কর বা ব্যক্তিগত আয়করের উপর সারচার্জ বণ্টনযোগ্য নয়) এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইউনিয়ন অন্তঃশুল্ক।

১৪.৪.১ ব্যক্তিগত আয়কর বণ্টন (Distribution of Personal Income Tax)

নীচে যে সারণিটি দেওয়া হয়েছে, তাতে প্রথম পাঁচটি কমিশন আয়করের বণ্টনে কোন্ নীতি অবলম্বন করেছিল, অর্থাৎ বণ্টনের সূত্র কি ছিল, প্রধান রাজ্যগুলি আয়কর রাজস্বের কত শতাংশ পেয়েছিল, এই তথ্যগুলি পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে :

প্রধান প্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে আয়কর বণ্টন

রাজ্যগুলির মোটপ্রাপ্য (আয়কর রাজস্বের শতাংশের হিসাবে)	প্রথম কমিশন ১৯৫২-৫৭	দ্বিতীয় কমিশন ১৯৫৭-৬২	তৃতীয় কমিশন ১৯৬২-৬৬	চতুর্থ কমিশন ১৯৬৬-৬৯	পঞ্চম কমিশন ১৯৬৯-৭৪
উত্তরপ্রদেশ	১৫.৭	১৬.৪	১৪.৪	১৪.৬	১৬.০
মহারাষ্ট্র	১৭.৫*	১৬.০*	১৩.৪	১৪.৩	১১.৩
মাদ্রাজ ↑	১৫.২	৮.৪	৮.১	৮.৩	৮.২
পশ্চিমবঙ্গ	১১.২	১০.০	১২.১	১০.৯	৯.১
বিহার	৯.৭	৯.৯	৯.৩	৯.০	১০.০
বণ্টনের সূত্র					
জনসংখ্যার ভিত্তিতে	৮০	৯০	৮০	৮০	৯০
সংগ্রহের ভিত্তিতে	২০	১০	২০	২০	১০

* অবিভক্ত বোম্বাই রাজ্যের জন্য নির্ধারিত অংশ

↑ বর্তমানে তামিলনাড়ু

আয়কর বণ্টনের ক্ষেত্রে বণ্টনের সূত্র হিসাবে প্রথম পাঁচটি অর্থ কমিশন সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির জনসংখ্যাকেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে, কর-রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। ষষ্ঠ কমিশনও শতকরা ৯০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতেই বণ্টনের সুপারিশ করেছিল। ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি (যাকে চলতি ইংরেজিতে Population Explosion বলা হয়ে থাকে) জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির মধ্যে

বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হয়, জনসংখ্যার বৃদ্ধি রোধ করাটাই যখন আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি হওয়া উচিত ছিল, তখন আমরা জনসংখ্যার ভিত্তিতে অর্থ বণ্টন করে যে কত বড় ভুল করেছি, তা বোধহয় বলার নয়। এই ভুলের চরম মাসুল আমাদের দিতে হবে সম্ভবত আগামী দু-এক দশকের মধ্যে যখন ভারতবর্ষের জনসংখ্যাই হবে পৃথিবীর বৃহত্তম জনসংখ্যা। পরবর্তী অর্থ কমিশনগুলি এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য তেমন কোন আন্তরিক চেষ্টা করেনি। ফলে অবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত থেকে গেছে।

১৪.৪.২ কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের বণ্টন (Distribution of Union Excise Duties)

কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বণ্টনের ক্ষেত্রেও মনে হয় রাজ্যগুলির প্রতি তেমন সুবিচার করা হয়নি। নীচে যে সারণিটি দেওয়া হয়েছে, তা থেকে দেখা যাবে, প্রথম অর্থ কমিশন কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক সংগ্রহের শতকরা ৪০ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের সুপারিশ করলেও মাত্র তিনটি ভোগ্যবস্তু এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করেছিল—তামাক, দেশলাই ও বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিজ্জদ্রব্য। পরবর্তীকালে অন্য অর্থ কমিশনগুলি এই বণ্টনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়িই বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং ক্রমে সব রকম জিনিসই এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যগুলির ভাগ ৪০ শতাংশ থেকে মাত্র ২০ শতাংশতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

প্রধান প্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের বণ্টন

	প্রথম কমিশন	দ্বিতীয় কমিশন	তৃতীয় কমিশন	চতুর্থ কমিশন	পঞ্চম কমিশন
১। বণ্টনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত জিনিসের সংখ্যা	৩	৮	৩৫	সব জিনিস	সব জিনিস
২। রাজ্যগুলির জন্য নির্ধারিত অংশ (মোট রাজস্বের শতাংশের ভিত্তিতে)	৪০	২৫	২০	২০	২০
৩। রাজ্যগুলির নির্ধারিত অংশ					
উত্তরপ্রদেশ	১৮.২	১৫.৯	১০.৭	১৫.০	১৮.৮
বিহার	১১.৬	১০.৬	১১.৬	১০.০	১৩.৮
মধ্যপ্রদেশ	৬.১		৮.৪	৭.৪	৮.৫
মহারাষ্ট্র	১০.৪*	১২.১*	৫.৭	৮.২	৭.৯
অন্ধ্রপ্রদেশ			৮.২	৭.৮	৭.১
পশ্চিমবঙ্গ	৭.২	৭.৬	৫.০	৭.৫	৬.৮

* অবিভক্ত বোম্বাই রাজ্যের জন্য নির্ধারিত অংশ

উপরের সারণিগুলিতে পঞ্চম কমিশনের সুপারিশগুলির কথা বলা হয়েছে। আয়কর বণ্টনের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ কমিশন রাজ্যগুলির অনুরোধে তাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ আয়করজাত নিট রাজস্বের শতকরা ৭৫ ভাগ থেকে ৮০ ভাগে বর্ধিত করার সুপারিশ করে। সপ্তম কমিশনের কাছেও রাজ্যগুলি পুনরায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তাদের দাবি তুলে ধরে এবং তাঁদের দাবির কাছে নতিস্বীকার করে সপ্তম কমিশন আয়করজাত নিট রাজস্বের শতকরা ৮৫ ভাগ রাজ্যগুলির জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়। অষ্টম অর্থ কমিশনের মতই নবম অর্থ কমিশন আয়কর সংগ্রহের ৮৫ শতাংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়ার সুপারিশ করেছিল এবং তা কার্যকর হয়েছিল। দশম অর্থ কমিশন কিন্তু রাজ্যগুলির মধ্যে আয়করের বণ্টনযোগ্য রাজস্ব ৭.৫ শতাংশ কমিয়ে এটিকে ৮৫ শতাংশ থেকে ৭৭.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার সুপারিশ করেছে। তবে আয়কর বণ্টনের অংশটি হ্রাস করার ফলে রাজ্যগুলি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য দশম কমিশন কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অংশটি বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করেছে। নবম অর্থ কমিশন অন্তঃশুল্ক বাবদ আদায়ীকৃত অর্থের ৪৫ শতাংশ রাজ্যগুলির জন্য নির্দিষ্ট করলেও, দশম অর্থ কমিশন তা কিছুটা বাড়িয়ে ৪৭.৫ শতাংশ করার সুপারিশ করেছে। আশা করা যায়, এর ফলে রাজ্যগুলির জন্য আয়করের অংশ কিছুটা কমে গেলেও সামগ্রিকভাবে তারা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

১৪.৪.২ কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলির নিকট সম্পদ হস্তান্তর (Resources Transferred to States)

অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী শুধু যে কয়েকটি বিশেষ কর ও অন্তঃশুল্ক থেকে সংগৃহীত নিট রাজস্বের একটা বড় অংশ কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির হাতে তুলে দেন, একথা পুরোপুরি ঠিক নয়। আমাদের সংবিধানে রাজ্য সরকারগুলির নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে কটি কর বা শুল্কের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলি একেবারেই পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং অর্থ কমিশনগুলির সুপারিশে কেন্দ্রীয় সরকার অনুদান ও ঋণের মারফত রাজ্য সরকারগুলিকে যথাসাধ্য সাহায্য করে থাকেন। প্রথম আটটি অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রাজ্য সরকারগুলি সম্পদ হস্তান্তরের মারফত যে পরিমাণ সাহায্য পেয়েছেন, শতাংশের হিসাবে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হচ্ছে :

কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলির নিকট সম্পদ হস্তান্তর
(শতাংশের হিসাবে)

সময়	কর ও শুল্ক	অনুদান	ঋণ	মোট
প্রথম পরিকল্পনা	২৪.০	২০.১	৫৫.৯	১০০.০
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	২৩.২	২৭..৫	৪৯.৩	১০০.০
তৃতীয় পরিকল্পনা	২১.৪	২৩.৩	৫৫.৩	১০০.০
তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা	২৪.০	২৬.০	৫০.০	১০০.০
চতুর্থ পরিকল্পনা	৩০.২	২৫.৪	৪৪.৪	১০০.০
পঞ্চম পরিকল্পনা	৩২.৫	৩২.২	৩৫.৩	১০০.০
ষষ্ঠ পরিকল্পনা	৩৬.৩	২৭.৪	৩৬.৩	১০০.০
সপ্তম পরিকল্পনা	৩৫.২	২৯.২	৩৪.৯	১০০.০
১৯৯০-৯৫	৪০.৫	৩৭.১	২২.৪	১০০.০

সূত্র : Misra & Puri–Indian Economy

এই পরিসংখ্যানগুলি কিছুটা মনোযোগের সঙ্গে দেখার পর যে কোনও অর্থনীতিবিদই স্বীকার করবেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি যে ধরনের আর্থিক স্বাধীনতা ভোগ করে, ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলি এখনও পর্যন্ত ওই ধরনের আর্থিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। এখানে অধিকাংশ রাজ্যই মনে করছে যে ভারতের আর্থিক কাঠামোটি যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও এতে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব অত্যধিক—রাজ্য সরকারগুলির আর্থিক স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা যৎসামান্য, নেই বললেই চলে। এখানে রাজ্যগুলি তাই দাবি জানিয়েছে, আর্থিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য তাদের হাতে আরও ক্ষমতা দিতেই হবে।

ভারতে রাজ্যগুলির আর্থিক স্বাধীনতার অভাব এবং সেই সঙ্গে আর্থিক ব্যাপারে কেন্দ্রের ওপর অহেতুক নির্ভরশীলতার আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নমুনা এবার আমরা উপস্থিত করছি। রাজস্বে টান পড়লে কেন্দ্রীয় সরকারের নোট ছাপানোর অধিকার একটি স্বীকৃত ঘটনা। রাজ্যগুলির এ ধরনের সুযোগ নেই। উপরন্তু, আর্থিক সংকটে পড়লে রাজ্যগুলো রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ওভারড্রাফট নিতে বাধ্য হয়। সুতরাং রাজ্যগুলির বাজেটে ঘাটতি দেখা দিলে বা ওভারড্রাফট নিতে বাধ্য হলে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হতে হয়। কেন্দ্রে ও রাজ্যে ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সরকার থাকলে এ ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধ চরম অবস্থায় পৌঁছয়। মোট কথা, এখানে কেন্দ্রের ওপর রাজ্যগুলির নির্ভরশীলতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রাজ্যগুলির আর্থিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা চরমে উঠেছে। মনে রাখা দরকার যে রাজ্যগুলোকে দুর্বল করে সবল একটি কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে তোলা কোনমতেই সম্ভব নয়। তাই একান্ত প্রয়োজন অবিলম্বে কেন্দ্র-রাজ্যের বর্তমান সম্পর্কটির পরিবর্তনের। এক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব ও অবহেলা কিন্তু জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করতে পারে।

আগের পৃষ্ঠায় আমরা যে সারণিটি দিয়েছি, তাতে প্রথম পরিকল্পনাকাল অর্থাৎ ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলির কাছে সম্পদ হস্তান্তরের একটি হিসাব রয়েছে। কিন্তু ওই হিসাবটি তৈরি হয়েছে শতাংশের ভিত্তিতে, অর্থাৎ ওই হিসাবটি থেকে ওই সময়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কত টাকার সম্পদ কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলির হাতে গেছে, তার সঠিক ও বাস্তব একটি হিসাব করা সম্ভব নয়। অপর একটি সরকারি প্রকাশনায় (India 1999) বহু খোঁজাখুঁজির পর সেই তথ্যটি পাওয়া গেছে : কোটি টাকার ভিত্তিতে তৈরি সেই হিসাবটি পরের পাতায় দেওয়া হল :

কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলির নিকট সম্পদ হস্তান্তর

(কোটি টাকার ভিত্তিতে)।

সময়	কর ও শুল্ক	অনুদান	ঋণ	মোট হস্তান্তর
প্রথম পরিকল্পনা	৩৪৪	২৮৮	৭৯৯	১,৪৩১
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	৬৮৮	৭৮৯	১,৪১১	২,৮৮৮
তৃতীয় পরিকল্পনা	১,১৯৬	১,৩০৪	৩,১০০	৫,৬০০
বার্ষিক পরিকল্পনা				
১৯৬৬-৬৭	৩৭৩	৪১৯	৯১৬	১,৭০৮
১৯৬৭-৬৮	৪১৭	৪৭১	৮৬৯	১,৭৫৭
১৯৬৮-৬৯	৪৯২	৪৯৯	৮৯১	১,৮৮২
চতুর্থ পরিকল্পনা	৪,৫৬২	৩,৮৩১	৬,৭০৮	১৫,১০১
পঞ্চম পরিকল্পনা	৮,২৬৮	৮,১৯৮	৮,৯৭৮	২৫,৪৪৪
বার্ষিক পরিকল্পনা				
১৯৭৯-৮০	৩,৪০৬	২,২৮৮	২,৬৯৭	৮,৩৯১
ষষ্ঠ পরিকল্পনা	২৩,৭২৮	১৭,৯৪১	২৩,৭২২	৬৫,৩৯১
সপ্তম পরিকল্পনা	৪৯,৪৬৫	৪২,০০৫	৪৮,৯৪৫	১,৪০,৪১৫
১৯৯০-৯১	১৪,৫৩৪	১৩,২০২	১৪,৪৭৬	৪২,২১২
১৯৯১-৯২	১৭,১৯৭	১৫,৭০০	১৩,১৪৫	৪৬,০৪২
১৯৯২-৯৩	২০,৫২২	১৭,৮৩০	১৩,২৮২	৫১,৬৩৪
১৯৯৩-৯৪	২২,২৪২	২০,৮৩০	১৫,০৭৫	৫৮,১৪৭
১৯৯৪-৯৫	২৪,৮৪০	২০,০৪৭	১৮,২৩৪	৬৩,১২১
১৯৯৫-৯৬	২৯,২৮৫	২১,২৮৭	১৮,৭৬৩	৬৯,৩৩৫
১৯৯৬-৯৭	৩৫,০৬১	২৩,১৫৭	২৩,১০৬	৮১,৩২৪
১৯৯৭-৯৮	৪৩,৫৬২	৩০,২৪১	২৯,৩৫১	১,০৩,১৫৪
১৯৯৮-৯৯ (বাজেট)	৩৯,০৭৪	২৭,৫৩১	২৯,৬৭০	৯৬,২৭৫

এই হিসাবটি থেকে যে কথাটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে, তা হল আর্থিক ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলির কেন্দ্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা। প্রথম পরিকল্পনাকালে (১৯৫১-৫৬) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রাজ্য সরকারগুলির মোট প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল মাত্র ১,৪৩১ কোটি টাকা। দশ বছরের মধ্যে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই টাকার অংক প্রায় চারগুণ বেড়ে ৫,৬০০ কোটি টাকায় পৌঁছায়। ১৯৬৭-৬৮ সালে বার্ষিক পরিকল্পনার মাত্র এক বছরে কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলি মোট পেয়েছিল ১,৭১৭ কোটি টাকা। (রিজার্ভ ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী আগের পৃষ্ঠায়, কেন্দ্রীয় সরকারের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা India 1999-এ যে সারণিটি দেওয়া হয়েছে,

তাতে সামান্য হেরফের রয়েছে এবং এই টাকার পরিমাণ দেখানো হয়েছে ১,৭৫৭ কোটি টাকা)। ওই বছরই রাজ্য সরকারগুলি একত্রে মোট সংগ্রহ করেছিল : রাজস্ব খাতে ২,৪৩৩ কোটি টাকা এবং মূলধন খাতে ১,৩৪৭ কোটি টাকা, উভয় খাতে মোট ৩,৭৮০ কোটি টাকা। রাজ্য সরকারগুলির মোট প্রাপ্তি ৩,৭৮০ কোটি টাকার পাশাপাশি ওই একই বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল ১,৭১৭ কোটি টাকা। হিসাব করলে দেখা যাবে, উভয় খাতে রাজ্য সরকারগুলির মোট প্রাপ্তি (৩,৭৮০ +১,৭১৭) ৫,৪৯৭ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে মিলিতভাবে তারা পেয়েছিল ১,৭১৭ কোটি টাকা, অর্থাৎ তাদের মোট প্রাপ্তির প্রায় ৩১ শতাংশ। এর ১২ বছর পরে ১৯৮০-৮১ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক রিপোর্টে আমরা দেখছি, ওই বছর রাজ্য সরকারগুলি একত্রে মোট সংগ্রহ করেছিল : রাজস্ব খাতে ১৪,৬১০ কোটি টাকা এবং মূলধন খাতে ৪,৩৫২ কোটি টাকা, উভয় খাতে মোট ১৮,৯৬২ কোটি টাকা। ওই একই বছরে, এরই পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রাজ্য সরকারগুলি মিলিতভাবে পেয়েছিল ৮,৪৬০ কোটি টাকা। অর্থাৎ উভয় খাতে রাজ্য সরকারগুলির মোট প্রাপ্তি (১৮,৯৬২ + ৮,৪৬০) ২৭,৪২২ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে মিলিতভাবে তারা পেয়েছিল ৮,৪৬০ কোটি টাকা, অর্থাৎ তাদের মোট প্রাপ্তির প্রায় ৩১ শতাংশ। এই হিসাব থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে কেন্দ্রের ওপর রাজ্য সরকারগুলির আর্থিক নির্ভরতা একেবারে একই জায়গায় স্থিতিশীল হয়ে রয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে ভারতবর্ষে এখনও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির উপর যেভাবে আর্থিক কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে, তা যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। এর মধ্যে কয়েকটি কমিটির মাধ্যমে অবস্থার পুনর্বিন্যাসের জন্য কিছুটা চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। আমরা আগেই বলেছি, জাতীয় স্বার্থ ও সংহতি রক্ষার জন্য এর চেয়ে বেশি সন্তোষজনক একটি ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গড়ে তোলা হোক।

সদ্য নিযুক্ত একজন অর্থ কমিশন তাদের পেশ করা প্রতিবেদনে সুপারিশ করেছে কেন্দ্রীয় কর রাজস্বের ২৮ শতাংশ সরাসরি রাজ্য সরকারগুলির জন্য বণ্টন করা হোক। অবশ্য অনুদান ও অন্যান্য হস্তান্তর বাবদ টাকা ধরলে মোট বণ্টনযোগ্য সম্পদ মোট আদায়ের ৩৭.৫ শতাংশ যেন ছাড়িয়ে না যায়। দশম কমিশন এক্ষেত্রে ২৯ শতাংশের ওপরে উঠতে পারেনি। এছাড়া একাদশ কমিশন 'জাতীয় বিপর্যয় মোচন তহবিল' স্থাপন করার সুপারিশও করেছে যাতে শুরুতেই ৫০০ কোটি টাকা ধার্য করা থাকবে। এই টাকাটা কেন্দ্রীয় করসমূহের ওপর সারচার্জ বসিয়ে আদায় করা হবে। তা ছাড়া চিনি, তামাক ও বস্ত্রের ওপর শুল্ক ছাড় দিলে আরও ১.৫ শতাংশ বাড়তি অনুদান আসবে। এর ফলে কেন্দ্রীয় রাজস্বে বিভিন্ন রাজ্যের অংশ খানিকটা বৃদ্ধি পাবে। সর্বাধিক আনুকূল্য পাবে উত্তরপ্রদেশ (১৯.৮%)। পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়বে ৮.১ শতাংশ।

[The Statesman ২৮ জুলাই, ২০০০ দ্রষ্টব্য]

১৪.৫ ভারতের রাষ্ট্রীয় ঋণ (Public Debt in India)

কেন্দ্রীয় সরকারের চলতি আর্থিক বছরের বাজেট আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করার আগে আমরা ভারতের বর্তমান আর্থিক অবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে চাই। বাজেটের মধ্যে বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে ওই বছরে বিভিন্ন

খাতে সরকারের মোট ব্যয় এবং ওই ব্যয়বৃদ্ধির কারণ। ব্যয়বৃদ্ধির ফলে বাজেট ঘাটতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনার জন্য ওই বাজেটেই বিভিন্ন সূত্র থেকে রাষ্ট্রীয় আয় যতটা সম্ভব বাড়ানোর জন্য কিছু প্রস্তাবও রাখা হয়ে থাকে। কিন্তু এতেও আমরা দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থার একটি সঠিক ও সামগ্রিক ছবি পাই না। তার জন্য আমাদের প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ঋণ সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ছবি। নীচে সেটি দেওয়া হচ্ছে :

ভারতের রাষ্ট্রীয় ঋণ (কোটি টাকায়)

	১৯৮৮	১৯৯১	১৯৯৪	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৮-৯৯ (বাজেট)
১। আভ্যন্তরীণ ঋণ	৯৮,৬৪৬	১,৫৪,০০৪	২,৪৫,৭১২	৩,৪৪,৪৭৬	৪,৩৭,১০৮
২। বৈদেশিক ঋণ	২৩,২২৩	৩১,৫২৫	৪৭,৩৪৫	৫৪,২৩৯	৫৭,২৯৫
মোট ঋণের পরিমাণ (১+২)	১,২১,৮৬৯	১,৮৫,৫২৯	২,৯৩,০৫৭	৩,৯৮,৭১৪*	৪,৯৪,৪০৩
৩। অন্যান্য দায়	৭৩,৬৯২	১,২৯,০২৯	১,৮৪,৯১১	২,৭৬,৯৬২	৩,৭৩,৮০৪
৪। মোট ঋণ ও দায়	১,৯৫,৫৬১	৩,১৪,৫৫৮	৪,৭৭,৯৬৮	৬,৭৫,৬৭৬	৮,৬৮,২০৬*

সূত্র : India 1999 পৃঃ ২৬১

উপরে যে সারণিটি দেওয়া হয়েছে, তা থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৮৮ সালে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ছিল ৯৮,৬৪৬ কোটি টাকা ; ১৯৯৪ সালে তা বেড়ে ২,৪৫,৭১২ কোটিতে পৌঁছয়, ১৯৯৮-৯৯ সালে ওই ঋণের সম্ভাব্য পরিমাণ হয়েছে, ৪,৩৭,১০৮ কোটি টাকা। বৈদেশিক ঋণও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে ; ১৯৮৮ সালে মোট বৈদেশিক ঋণ ছিল ২৩,২২৩ কোটি টাকা ; ১৯৯৮-৯৯ সালে তার পরিমাণ হয়েছে ৫৭,২৯৫ কোটি টাকা। এই সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮-৯৯—এই ১০/১১ বছরে মোট ঋণ ও দায়ের পরিমাণ হয়েছে ১,৯৫,৫৬১ কোটি টাকা থেকে ৮,৬৮,২০৬ কোটি টাকায়, অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ ১০/১১ বছরে ৪ গুণেরও কিছু বেশি।

কিছুকাল পূর্বে রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের রাষ্ট্রীয় ঋণের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এক বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ সম্পর্কে কথাগুলি এখনও মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য ; সুতরাং এখানে আমরা সেগুলির পুনরুল্লেখ করছি। প্রথমত, তাঁরা হিসাব করে দেখিয়েছেন, মোট ঋণের মাত্র শতকরা ১০ ভাগের বিরুদ্ধে কোনও পাওনা বা সম্পত্তি নেই ; বাকি ৯০ ভাগই হল সম্পূর্ণভাবে উৎপাদনশীল ঋণ। ঋণ উৎপাদনশীল হলে তার পরিমাণ বৃদ্ধি কোনও আশঙ্কার কারণ নয়। সুতরাং রিজার্ভ ব্যাংক সম্ভবত প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ভারতে রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেলেও এতে আতঙ্কিত হবার কোনও কারণ নেই। দ্বিতীয়ত, ভারত সরকারের মোট ঋণের একটা বড় অংশই হল অভ্যন্তরীণ ঋণ, যার ভার নেই বললেই চলে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ অত্যধিক হলেও ঋণের ভার সে অনুপাতে কম। তৃতীয়ত, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি সত্ত্বেও ভারত সরকারের সুনাম অক্ষুণ্ণ আছে। সুতরাং ঋণ সংগ্রহের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি। ঋণপত্র বাজারে ছাড়ার সঙ্গেই সঙ্গেই তা বিক্রি হয়ে যায়।

ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির সর্বপ্রধান কারণ যে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়নমূলক নানা প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য অর্থ সংস্থান করা—একথা অন্য প্রসঙ্গে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কারণ, আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলি, বিশেষত পাকিস্তান ক্রমাগত নানা অজুহাতে ভারতের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। ওই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের সামরিক বাহিনীকে সুসজ্জিত করার বিদেশ থেকে আধুনিক সমরাস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য প্রতি বছরই প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বিশেষভাবে বেড়ে চলেছে। এই ব্যয় নির্বাহের জন্যও ভারত সরকার ঋণগ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। তৃতীয়ত, বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে আগেকার পাওয়া ঋণের সুদ প্রদানের জন্য এবং তার মূল পরিশোধের জন্যও সাম্প্রতিক কালে কেন্দ্রীয় সরকারকে নতুন এবং বৃহত্তর ঋণ বহিঃসূত্র থেকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে। এতে ভারত সরকারের বৈদিশিক ঋণের পরিমাণ বিশেষভাবে বাড়ছে। পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, নানা কারণে ভারত সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসামরিক প্রশাসনের ব্যয়, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পরিচালনার জন্য ব্যয় ইত্যাদি সব রকম ব্যয়ই বেশ দ্রুতহারে বাড়ছে। ওই ব্যয় নির্বাহের জন্যও অনেক সময়ে ঋণ গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এই এককটি আমরা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী এককে আমরা কেন্দ্রীয় বাজেট এবং আনুষঙ্গিক নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব।

১৪.৬ অনুশীলনী

(১) কেন্দ্রীয় বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন সম্পর্কে আমাদের সংবিধানে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, সংক্ষেপে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করুন।

(২) অর্থ কমিশন কতদিন পরপর এবং কে নিয়োগ করেন ? এঁদের কাজ কি ?

(৩) রাজ্যগুলির মধ্যে আয়কর বণ্টনের জন্য অর্থ কমিশন এ যাবৎ কি সুপারিশ করেছেন এবং তা কার্যকর করা হয়েছে কি ?

(৪) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রাজ্য সরকারগুলি সম্পদ হস্তান্তর বাবদ এ পর্যন্ত কত কোটি টাকা পেয়েছেন? এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৫) ভারতের রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ গত কয়েক দশকের মধ্যে কি পরিমাণ বেড়েছে ? এই বৃদ্ধি কি উদ্বেগের কারণ?

* বিঃ দ্রঃ সরকারি প্রকাশনা India 1999-এ এই দুটি সংখ্যা সামান্য ভুল দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭-এর ক্ষেত্রে মোট ঋণের পরিমাণ এখানে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ৩,৯৮,৭১৫ কোটি টাকা হচ্ছে; ১৯৯৮ ৯৯-এ মোট ঋণ ও দায়ের পরিমাণ হওয়ার কথা ৮,৬৮,২০৭ কোটি টাকা। ভুলগুলি সামান্য হলেও উল্লেখ করলাম।

১৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

1. Misra & Puri–Indian Economy.
2. মুখোপাধ্যায়, দেবেশ—সমকালীন ভারতীয় অর্থনীতি।
3. Bhattacharya, Mohit–New Horizons of Public Administration.
4. Govt. of India–India 1999.

একক ১৫ ☐ কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য
১৫.২ প্রস্তাবনা
১৫.৩ কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট (১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৯৮-৯৯)
১৫.৪ কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট (চলতি বছর ২০০০-২০০১)
১৫.৪.১ কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রধান প্রধান উৎস : প্রত্যক্ষ কর
১৫.৪.২ কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রধান প্রধান উৎস : পরোক্ষ কর
১৫.৪.৩ কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়
১৫.৫ অনুশীলনী
১৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১৫.১ উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসন ব্যবস্থার এটি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ একক। এই এককটি ভাল করে পড়ার ও আলোচনার পর আপনারা জানতে পারবেন :

- গত কয়েক বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও চলতি বছরের বাজেটের বিস্তারিত একটি হিসাব।
- কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রধান উৎসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় : প্রত্যক্ষ কর।
- কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রধান উৎসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় : পরোক্ষ কর।
- কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়।

১৫.২ প্রস্তাবনা

রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আগের ২টি এককে আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামো ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের কিছুটা ধারণা দেবার চেষ্টা করেছি। শেষ এককটিতে আমাদের সংবিধানে বাজেটে তৈরি, অনুমোদন, প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব বিধান দেওয়া আছে, সেগুলি সম্বন্ধেও যতটা সম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ঐ সঙ্গে অর্থ কমিশনগুলির কার্যাবলী সম্পর্কেও বেশ কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রাজ্যগুলির কাছে কোটি টাকার ভিত্তিতে সম্পদ হস্তান্তরের একটি বিরাট তথ্যপূর্ণ সারণি দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে ১৯৯৮-৯৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০ বছরের একটি অতি

দুষ্প্রাপ্য হিসাবও দেওয়া হয়েছে। সব শেষে রয়েছে, ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ সম্পর্কে আরও একটি সারণি যার মধ্যে পাওয়া যাবে ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৮-৯৯ পর্যন্ত শেষের এই এগারো বছরের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য।

এই দুটি এককে আমরা যেসব তথ্য আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে নতুন তুলে ধরেছি, তার মধ্যে আমাদের আর্থিক প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যা কিছু প্রয়োজনীয় প্রায় সব তথ্যই উপস্থাপিত করা হয়েছে। একমাত্র বাকি থেকে গেছে চলতি বছরের কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব, কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রধান উৎসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সব শেষে, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় সম্বন্ধে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য।

আমাদের ইচ্ছা রয়েছে, এর পরের এককটিতে, যেটি নাকি হবে আমাদের শেষ একক, বিশাল বিশাল অংকের খরচের হিসাব রাখার পদ্ধতি (Accounts) এবং সেগুলির নিরীক্ষা (Audit) সম্পর্কে যেটুকু তথ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায় সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া এবং ঐ সঙ্গেই আইন-বহির্ভূত বিপুল পরিমাণ অর্থ দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের হাতে নষ্ট হবার কিছু দৃষ্টান্ত এবং ভবিষ্যতে ঐ জাতীয় ব্যাপার আর যাতে ঘটতে না পারে সে সম্পর্কে কিছু পরামর্শ।

১৫.৩ কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট : ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৯৮-৯৯ (Central Budget 1950-51 to 1998-99)

কেন্দ্রীয় সরকারের চলতি বছরের বাজেট সম্পর্কে আলোচনার আগে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই, যার মাধ্যমে আমাদের সরকারের বাজেট নীতি সম্বন্ধে আপনারা কিছুটা অবহিত হবেন। এই আলোচনা আরম্ভ করার আগে আপানদের মনে করিয়ে দিতে চাই, বাজেট ব্যবস্থা সংস্কারের প্রথম ধাপ হিসাবে ১৯৪৬ সাল থেকে আমাদের দেশ ভারতবর্ষে পৃথক একটি মূলধনি বাজেট প্রণয়নের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। হয়ত আপনাদের মনে আছে, ঠিক ঐ সময়েই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর চতুর্দিকে বহু প্রস্তাব ও আলোচনার পর বিভিন্ন দেশে পৃথক পৃথক ধরনের বাজেট ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে গঠিত হয় পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission), যার সভাপতি হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ১৯৫১ সালের ১ এপ্রিল। স্বাধীন রাষ্ট্রে অর্থনৈতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রথম যে পরিকল্পনার সূত্রপাত ঐ তারিখ থেকে হয়, ঠিক তার আগের মুহূর্তে এবং তার পরবর্তী প্রায় দুই দশক আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল তারই সামান্য পরিচয় দেওয়া হয়েছে পরের পাতার সারণিতে এবং সে হিসাবে এর ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

পরিকল্পনা-কালে নির্বাচিত কয়েকটি বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটের অবস্থা

(কোটি টাকায়)

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৯-৭০
রাজস্ব খাতে					
১. রাজস্ব ...	৪০৫.৩৬	৪৮১.১৯	৮৭৭.৪৬	২৩৪৫	৩০৬৭
২. ব্যয় ...	৩৪৬.৬৪	৪৪০.৭৪	৮২৬.২১	২০২৫	২৯৪২
৩. ঘাটতি (-)					
বা উদ্বৃত্ত (+) ...	+৫৯.২২	+৪০.৪৫	+৫১.২৫	+৩২০	+১২৫
মূলধন খাতে					
১. প্রাপ্তি ...	১০৬.০৩	২৮৮.৩৭	১১৫৫.৮০	১৬৪৬	২৫০৮
২. বণ্টন ...	১৮৪.১৭	৪৭৮.৩৪	১০২৯.৩৩	২১৩৯	২৬৭৯
৩. ঘাটতি (-)					
বা উদ্বৃত্ত (+) ...	-৭৮.১৪	-১৮৯.৯৭	+১২৬.৪৭	-৪৯৩	-১৭১
বিবিধ খাতে ...	+১৫.২৬	-১০.৩৫	-৬০.৮৭		
মোট ঘাটতি (-)					
বা উদ্বৃত্ত (+) ...	-৩.৬৬	-১৫৯.৮৭	+১১৬.৮৫	-১৭৩	-৪৬

সূত্র : R. B. Annual Report 1970-71, Statement 64

প্রথম পরিকল্পনার পূর্ববর্তী বছরে, অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালে রাজস্ব-খাতে সংগ্রহ হয়েছিল মাত্র ৪০৫.৩৬ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছিল ৩৪৬.৬৪ কোটি টাকা, অর্থাৎ ঐ বছরে রাজস্ব খাতে কোন ঘাটতি ছিল না। মূলধন খাতে প্রাপ্তি ও বণ্টনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০৬.০৩ এবং ১৮৪.১৭ কোটি টাকা, অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ ছিল -৭৮.১৪ কোটি টাকা। অন্যান্য প্রাপ্তি ও ব্যয় হিসাবের মধ্যে ধরলে ঐ বছর ঘাটতির পরিমাণ ছিল মাত্র -৩.৬৬ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনাকালে মূল ব্যয়বরাদ্দ ছিল ২৩৭৮ কোটি টাকা (যদিও শেষ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় হয়েছিল ২০০০ কোটি টাকারও কিছুটা কম)।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূচনায় (১৯৫৫-৫৬ সালে) রাজস্ব খাতে প্রাপ্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৮১.১৯ ও ৪৪০.৭৪ কোটি টাকা, যার ফলে সে বছরও রাজস্ব-খাতে উদ্বৃত্ত হয়েছিল +৪০.৪৫ কোটি টাকা। মূলধন খাতে প্রাপ্তি ও বণ্টন হয়েছিল যথাক্রমে ২৮৮.৩৭ ও ৪৭৮.৩৪ কোটি টাকা। অবশ্য ঘাটতির পরিমাণ হয়েছিল আগের তুলনায় অনেক বেশি -১৮৯.৯৭ কোটি টাকা। অন্যান্য ব্যয় ও প্রাপ্তি হিসাবের মধ্যে ধরলে ঐ বছর মোট ঘাটতির পরিমাণ হয়েছিল -১৫৯.৮৭ কোটি টাকা। মনে রাখা দরকার, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূল ব্যয়বরাদ্দ ছিল ৪৮০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দের সঙ্গে সঙ্গে মোট ঘাটতির পরিমাণও অনেকটা বাড়বে, একথা স্পষ্টভাবে বোঝা গিয়েছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনার সূচনায় (১৯৬০-৬১ সালে) রাজস্ব খাতে প্রাপ্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৭৭.৪৬ ও ৮২৬.২১ কোটি টাকা যার ফলে সে বছরও রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্ত হয়েছিল +৫১.২৫ কোটি টাকা।

মূলধন খাতে প্রাপ্তি ও বণ্টন হয়েছিল যথাক্রমে ১১৫৫.৮০ ও ১০২৯.৩৩ কোটি টাকা, ফলে সে বছর ঘাটতির পরিবর্তে উদ্বৃত্ত হয়েছিল +১২৬.৪৭ কোটি টাকা। অন্যান্য ব্যয়ও প্রাপ্তি হিসাবের মধ্যে ধরলে এ বছর মোট উদ্বৃত্তের পরিমাণ হয়েছিল +১১৬.৮৫ কোটি টাকা। এই বছরের বাজেটের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হল কোন ঘাটতির পরিবর্তে উদ্বৃত্ত হয়েছিল +১১৬.৮৫ কোটি টাকা, যদিও সেই সময়ে তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৭৫০০ কোটি টাকা, কিন্তু ব্যয় হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ৮৫৭৩ কোটি টাকা।

চতুর্থ পরিকল্পনার সূচনা হবার কথা ছিল ১৯৬৬ সালের ১ এপ্রিল, কিন্তু নানা কারণে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিবর্তে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা চালু করা হয়েছিল, এদের মধ্যে শেষটির কার্যকাল ছিল ১৯৬৯ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত। আগের সারণিটি থেকে দেখা যাচ্ছে, ঐ ৩ বছর পরিকল্পনা বিরতির (Plan Holiday) ঠিক পরের বছর যখন চতুর্থ পরিকল্পনার সূচনা করা হয়, তখন রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্ত হয়েছিল +১২৫ কোটি টাকা এবং মূলধন খাতে ঘাটতি হয়েছিল -১৭১ কোটি টাকা। সর্বসমেত মোট ঘাটতির পরিমাণ হয়েছিল -৪৬ কোটি টাকা। ১৯৫১ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এটাই ছিল সবচেয়ে কম ঘাটতি। এর দ্বারা সম্ভবত অনুমান করে নেওয়া যায়, পরিকল্পনার সাময়িক বিরতির সময় যখন গঠনমূলক কাজকর্ম অনেক ধীরগতিতে চলে, তখন বাজেট ঘাটতির পরিমাণও অনেকটা কমে যায়।

রাজস্ব ও মূলধন খাতের জন্য নীচে আর একটি সারণি দেওয়া হয়েছে, যার কার্যকাল হল ১৯৭৩-৭৪ থেকে ১৯৮০-৮১ সাল পর্যন্ত মাত্র ৮ বছর।

পরিকল্পনা-কালে নির্বাচিত কয়েকটি বছরে কেন্দ্রীয় বাজেটের অবস্থা

(কোটি টাকায়)

	১৯৭৩-৭৪	১৯৭৪-৭৫	১৯৭৭-৭৮	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১
রাজস্ব খাতে					
১. রাজস্ব	৫০৭৩	৬৫৫৭	৯৭৯২	১১,১৭৭	১২,৩২৭
২. ব্যয়	৪৮৩৬	৫৭৯৩	৯৩৬২	১২,০৪৭	১৪,২৫৬
৩. ঘাটতি (-) বা উদ্বৃত্ত (+)	+২৩৭	+৭৬৪	+৪৩০	-৮৭০	-১৯২৯
মূলধন খাতে					
১. প্রাপ্তি	৩৬৪৬	৩২৯৭	৫৫৮৮	৬১৫৩	৯৮৭৭
২. বণ্টন	৪২১১	৪৭৮২	৬৯৫১	৭৯৮৩	৯৩৯৪
৩. ঘাটতি (-) বা উদ্বৃত্ত (+)	-৫৬৫	-১৪৮৫	-১৩৬৩	-১৮৩০	+৪৮৩
বিবিধ খাতে মোট ঘাটতি (-) বা উদ্বৃত্ত (+)	-৩২৮	-৭২১	-৯৩৩	-২৭০০	-১৪৪৬

সূত্র : R. B. Annual Reports 1974-75 & 1979-80, Statements 62 & 77

এই ৮ বছরে তাহলে দেখা যাচ্ছে, রাজস্ব-খাতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ প্রতি বছরই কিছুটা করে কমতে কমতে ১৯৭৯-৮০ এবং ১৯৮০-৮১ তে যথাক্রমে -৮৭০ ও -১৯২৯ কোটি টাকার ঘাটতিতে পরিণত হয়েছে। মোট ঘাটতির পরিমাণও ৮ বছরে বেড়েছে -৩২৮ কোটি টাকা থেকে -১৪৪৬ কোটি টাকায় অর্থাৎ ৪ গুণেরও কিছু বেশি। উন্নয়নমূলক কাজের জন্য মূলধন খাতে অর্থব্যয় খুব বেশি হলেও ঐ অর্থ ব্যয় তেমন গুরুতরভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় না, কারণ ঐ অর্থ দিয়েই তৈরি হয় দীর্ঘকালীন কোন অর্থ উন্নয়নমূলক প্রকল্প যা জাতীয় সম্পদ হিসাবে গণ্য করা যায়। কাজেই ঘাটতি সত্ত্বেও আমাদের আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি তেমন কোন বড় মাপের হয় না।

এবার আমরা এই শতকের শেষ দশ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটের ও ঘাটতির পরিমাণের কিছুটা পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করছি :

কেন্দ্রীয় বাজেট ১৯৯২-৯৩ থেকে ১৯৯৮-৯৯

(কোটি টাকায়)

	১৯৯২-৯৩	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৮-৯৯
১। রাজস্ব সংগ্রহ	৭৪,১২৮	৯১,০৮৩	১,২৬,২৭৯	১,৬১,৯৯৪
২। রাজস্ব খাতে ব্যয়	৯২,৭০২	১,২২,১১২	১,৫৮,৯৩৩	২,১০,০৬২
৩। রাজস্ব খাতে ঘাটতি	-১৮,৫৭৪	-৩১,০২৯	-৩২,৬৫৪	-৪৮,০৬৮
৪। মূলধন খাতে প্রাপ্তি	৩৬,১৭৮	৬৮,৬৯৫	৭৪,৭২৮	১,০৫,৯৩৩
৫। মূলধন খাতে বন্টন	২৯,৯১৬	৩৮,৬২৭	৪২,০৭৪	৫৭,৮৬৫
৬। মোট প্রাপ্তি	১,১০,৩০৬	১,৫৯,৭৭৮	১,৮৭,৮২৩*	২,৬৭,৯২৭
৭। মোট ব্যয়	১,২২,৬১৮	১,৬০,৭৩৯	২,০১,০০৭	২,৬৭,৯২৯
৮। বাজেট ঘাটতি	-১২,৩১২	-৯৬১	-১৩,১৮৪	...
৯। ফিসকাল ঘাটতি	-৪০,১৭৩	-৫৭,৭০৩	-৬৬,৭৩৩	-৯১,০২৫

সূত্র : India 1999, Table 13.2 Page 260.

* এখানে হিসাবে হয়ত কিছুটা গোলমাল আছে। বইতে যে সংখ্যা আছে, তাই দেওয়া হয়েছে।

উপরের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯২-৯৩ ও ১৯৯৪-৯৫ সালে রাজস্ব খাতে ঘাটতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে -১৮,৫৭৪ ও -৩১,০২৯ কোটি টাকা। ১৯৯৬-৯৭ সালেও ঘাটতির পরিমাণ প্রায় একই ছিল, -৩২,৬৫৪ কোটি টাকা; কিন্তু ১৯৯৮-৯৯ সালে হঠাৎ এই ঘাটতি -৪৮,০৬৮ কোটি টাকা পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। কিছুটা আশ্চর্যের বিষয়, মূলধন খাতে ঘাটতির পরিমাণ এই দশ বছরে প্রায় ছিল না বললেই চলে। সব মিলিয়ে বাজেট ঘাটতির পরিমাণও এই দশ বছরে প্রায় সহ্যের সীমার মধ্যেই ছিল এবং সম্ভবত এই কারণেই এই সময়ে মুদ্রাস্ফীতির হারও আগের তুলনায় অনেকটা কমে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ এতে কিছুটা স্বস্তিলাভ করেছেন বলেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক দাবি করে থাকে। তবে ফিসকাল ঘাটতির পরিমাণ ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে ১৯৯৮-৯৯ সালের মধ্যে -৪০,১৭৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে -৯১,০২৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছিল।

এবার আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের চলতি বছরের বাজেট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

১৫.৪ কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট (চলতি বছর ২০০০-২০০১)
(Central Budget 2000-2001)

২০০০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীযশবন্ত সিনহা ২০০০-২০০১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট লোকসভায় পেশ করেন। বক্তৃতার প্রথম অংশে তিনি ১৯৯৯-২০০০ সালের সংশোধিত বাজেটের উল্লেখ করে বলেন, ঐ বাজেটে প্রস্তাবিত যে ব্যয়বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তা ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপর-পক্ষে, রাজস্ব সংগ্রহ কমে গেছে অন্ততপক্ষে ৪ শতাংশ। সুতরাং বাজেট ঘাটতির পরিমাণ স্বভাবতই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭,৪৬১ কোটি টাকা (ঐ বাবদ প্রস্তাবিত ব্যয় ২,০৬,৮৮২ কোটি টাকার ৮.৪ শতাংশ বেশি)। অপরদিকে যোজনা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২,৩৯৫ কোটি টাকা (ঐ বাবদ প্রস্তাবিত ৭৭,০০০ কোটি টাকার ৩.১ শতাংশ বেশি)। যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ের পরিমাণ সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বর্ধিত হারে পেনশন দেবার জন্য ৪১৭৩ কোটি টাকা, ঋণবাবদ প্রদেয় সুদ ৩৪২৫ কোটি টাকা, রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত অনুদান ৩০০০ কোটি টাকা, প্রতিরক্ষা ব্যয়বৃদ্ধি ২,৮১০ কোটি টাকা, অতিরিক্ত সুদ প্রদানের জন্য ১৩০৪ কোটি টাকা, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবাবদ সরকারি সাহায্য বা ভরতুকি ১০০০ কোটি টাকা, ডাক বিভাগকে সাহায্যদান ৮৪৮ কোটি টাকা এবং রাজ্যগুলিকে নানারকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য সাহায্য ১০৬৪ কোটি টাকা। যোজনা-খাতে ব্যয়বৃদ্ধির প্রধান প্রকল্পগুলি হল : জাতীয় সড়কের উন্নয়ন বাবদ ১৯০০ কোটি টাকা, রাজ্যগুলির সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১০০০ কোটি টাকা, রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন বাবদ ২০০ কোটি টাকা ইত্যাদি।

রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে মোট ১,৩২,৩৬৫ কোটি টাকার জায়গায় সংগ্রহ হয়েছে ১,২৬,৪৬৯ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৫৯০০ কোটি টাকা কম। ঐ বছরের জন্য ফিসকাল ঘাটতি হয়েছে GDP-র (অন্তর্দেশীয় উৎপন্নের) ৫.৬ শতাংশ যেখানে বাজেট তৈরির সময় আশা করা গিয়েছিল ৪ শতাংশের মধ্যেই সেটি সীমাবদ্ধ থাকবে।

২০০০-২০০১ সালের জন্য নতুন যে বাজেটটি তৈরি করা হয়েছে, তাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩,৩৮,৪৮৭ কোটি টাকা, যার মধ্যে যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ের পরিমাণ বরাদ্দ করা হয়েছে ২,৫০,৩৮৭ কোটি টাকা এবং যোজনা সংক্রান্ত ব্যয় ৮৮,১০০ কোটি টাকা। যোজনা সংক্রান্ত ব্যয়বরাদ্দ ৮৮,১০০ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ মঞ্জুর করা হয়েছে বিদ্যুৎ ও শক্তি উৎপাদন, যানবাহন ও যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা গঠন ও উন্নয়নের জন্য। সমাজসেবা উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ হয়েছে ১৯৯৯-২০০০ সালের ব্যয়ের উপর ২১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির যোজনা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য ২০০০-২০০১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করবেন ৩৬,৮২৪ কোটি টাকা। ১৯৯৯-২০০০ সালের সংশোধিত বাজেটে এই বাবদ ধার্য হয়েছিল ৩৫,৭৩৫ কোটি টাকা।

২০০০-২০০১ সালের জন্য যোজনা-বহির্ভূত খাতে মোট বরাদ্দ করা হয়েছে ২,৫০,৩৮৭ কোটি টাকা। ১৯৯৯-২০০০ সালের সংশোধিত বাজেটে ঐ বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছিল ২,২৪,৩৪৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৬,০৪৪ কোটি টাকা। যোজনা-বহির্ভূত অতিরিক্ত বরাদ্দের

একটি বড় অংশই দেওয়া হয়েছে প্রতিরক্ষা বাবদ বর্ধিত ব্যয় মেটানোর জন্য (১০,০৮৩ কোটি টাকা), রাষ্ট্রীয় ঋণের অতিরিক্ত সুদ বাবদ ৯৮৪১ কোটি টাকা এবং রাজ্যগুলির সাহায্যের জন্য ৯৩৯২ কোটি টাকা। অর্থ কমিশন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট-বক্তৃতায় বলেছেন, একাদশ অর্থ কমিশন ইতিমধ্যেই তাঁদের অন্তর্বর্তী সুপারিশ রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করেছেন। রাজ্যগুলির মধ্যে কর-রাজস্বের অংশবিশেষ এবং তাদের প্রাপ্য অনুদান সম্পর্কে এই অন্তর্বর্তী রিপোর্টে একাদশ অর্থ কমিশন যে সুপারিশ করেছেন অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার তা গ্রহণ করেছেন এবং ২০০০-২০০১ সালের বাজেটে সেই সুপারিশগুলি যতটা সম্ভব কার্যকর করা হয়েছে।

এখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের ২০০০-২০০১ সালের বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের সম্পর্কে আরও কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জানাবো।

১৫.৪.১ কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রধান প্রধান উৎস : প্রত্যক্ষ কর (Principal Sources of Revenue of the Union Government : Direct Taxes)

আগেই বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের উৎসকে মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা হয় : (১) কর-রাজস্ব এবং (২) কর-বহির্ভূত রাজস্ব। কর-রাজস্বকেও আবার দু-ভাগে ভাগ করা হয় : (১) প্রত্যক্ষ কর ও (২) পরোক্ষ কর। প্রত্যক্ষ কর সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আয়করের। আয়কর আবার দু-ধরনের : ব্যক্তিগত আয়কর এবং করপোরেশন কর বা কোম্পানির দেয় আয়কর। ভারতের আয়কর প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৮৬০ সালে। এর পর বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আয়কর বর্তমান অবস্থায় এসেছে। ভারতে ব্যক্তি, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার, রেজেস্টারিভুক্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর যে কর ধার্য করা হয় তাকেই ব্যক্তিগত আয়কর বলা হয়ে থাকে। অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে আয়করের একটা নির্দিষ্ট অংশ (দশম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ৭৭.৫ শতাংশ) রাজ্যগুলির কাছে হস্তান্তরিত হয়। অধিক রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট আয়ের ওপর সারচার্জও ধার্য করে থাকেন। যেমন, ১৯৯০-৯১ সালের বাজেটে ৭৫ হাজার টাকা বা তদূর্ধ্ব করযোগ্য আয়ের ওপর ৮ শতাংশ হারে সারচার্জ ধার্য করা হয়। পরে উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সামাল দেওয়ার জন্য সারচার্জ বাড়িয়ে ৮ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ করা হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেটে ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে সারচার্জ তুলে নেওয়া হলেও ১৯৯৯-২০০০ সালের বাজেটে আবার আয়করের ওপর ১০ শতাংশ হারে সারচার্জ ধার্য করা হয়েছিল। এ বছর অর্থাৎ ২০০০-২০০১ সালের বাজেটে সারচার্জের হার আরও কিছুটা বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব রয়েছে। আয়কর সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় করলে তবেই আয়কর দিতে হবে এবং আয়ের পরিমাণ যত বাড়তে থাকে, তত বেশি হারে আয়কর দিতে হবে। সুতরাং, এক হিসাবে বলা যায়, আয়কর হল ভারতীয় কর ব্যবস্থার গতিশীলতার নির্দেশক। বর্তমানে আয়করের ক্ষেত্রে ছাড়ের সীমা হল ৫০ হাজার টাকা। এছাড়াও, আরও নানা ধরনের অব্যাহতির ব্যবস্থা আছে। যাঁরা চাকরি করেন অথবা চাকরির কার্যকালের শেষে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং মাইনের বদলে পেনশন পাচ্ছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও আর একটা

বড় ধরনের অব্যাহতির ব্যবস্থা আছে যাকে বলা যায় 'প্রামাণিক ছাড়' বা Standard Deduction। বাৎসরিক আয়ের ভিত্তিতে এই বাবদ সর্বোচ্চ ছাড় পাওয়া যায় ২৫,০০০ টাকা। অন্যান্য বিভিন্ন সূত্র, যথা ব্যাংক, সঞ্চয় সংস্থা অথবা ঐ জাতীয় অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া সুদ, ডিভিডেন্ড ইত্যাদি বাবদ বছরে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যায়। এত রকমের ছাড় পাওয়া সত্ত্বেও অনেকে মনে করেন ভারতে আয়করের হার অনেক বেশি। ১৯৭৫ সালের আগে পর্যন্ত আয়করের প্রান্তিক হার ছিল ৯৭.২৫ শতাংশ (অবিশ্বাস্য হলেও ষোলোআনা সত্যি), বর্তমানে তা ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে এখন যে হার প্রযোজ্য, তা নীচের সারণিতে দেওয়া হল :

ব্যক্তিগত আয়করের হার : ২০০০-২০০১ সালের বাজেট অনুযায়ী

আয়ের পরিমাণ	বর্তমান হার	প্রস্তাবিত হার
বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	নেই	নেই
৫০,০০০ টাকার উপরে এবং ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১০ শতাংশ	১০ শতাংশ
৬০,০০০ টাকার উপরে এবং ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২০ শতাংশ	২০ শতাংশ কর এবং ১০ শতাংশ সারচার্জ
১,৫০,০০০ টাকার উপরে	৩০ শতাংশ	৩০ শতাংশ কর এবং ১৫ শতাংশ সারচার্জ

খুবই আশ্চর্যের বিষয়, ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ৯৭.২৫ শতাংশ হারে যখন ব্যক্তিগত আয়কর সংগ্রহ করা হত, তখন লোকে বলত আয়করের হার অত্যাধিক এবং অস্বাভাবিক বলে তেমন রাজস্ব আদায় হয় না, করদাতাদের একটা বড় অংশই কর ফাঁকি দিয়ে থাকেন। বর্তমানে করের হার অবিশ্বাস্য রকম নীচে নামানো সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। ভারতে আয়করদাতার সংখ্যা খুব বেশি নয়—দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১.২৬ শতাংশ, যেখানে হওয়া উচিত ছিল অন্ততপক্ষে ২৫-৩০ শতাংশ, অর্থাৎ বর্তমানে যখন আমাদের মোট জনসংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়িয়েছে, তখন করদাতার সংখ্যা আরও কয়েক কোটি হওয়াটাই উচিত এবং স্বাভাবিক বলে গণ্য হতে পারত। গত কয়েক বছর কেন্দ্রীয় সরকার আয়করের জাল উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে নতুন একটি বিধান করেছেন। এই বিধান অনুযায়ী ভারতবর্ষের অধিকাংশ বড় শহর (বর্তমানে বিধান অনুযায়ী যেসব শহরে অন্তত ৫ লক্ষ লোক থাকেন) যেসব লোকের কর-প্রদান সামর্থ্যের প্রমাণ অনুযায়ী ৬টি মাপকাঠির যে কোন একটি আছে, তাদের অন্ততপক্ষে আয়করদাতা হিসাবে নিদেনপক্ষে খুব ছোট একটি আয়কর রিটার্ন ফর্ম বাধ্যতামূলকভাবে জমা দিতেই হবে। এই ৬টি মাপকাঠি হল : (১) মাঝারি ধরনের একটি ফ্ল্যাট বা বাড়ি : (২) ৪ চাকায় চালানো যায় এমন অন্তত একটি মোটরগাড়ি ; (৩) টেলিফোনের ব্যবস্থা থাকার অধিকার ; (৪) নিজের খরচে বছরে একবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বাদে দূরের কোন দেশে বেড়াতে যাওয়া (হজযাত্রী এবং কৈলাস-মানস সরোবরের তীর্থযাত্রী বাদে) ; (৫) নগদ ছাড়াই কোন কার্ডের সাহায্যে যে কোন

দামী জিনিস কেনার অধিকার এবং সবশেষে (৬) ধনীদের জন্য সংরক্ষিত কোন ক্লাবের সদস্য হওয়া যেখানে ভর্তি হওয়ার ফী অন্ততপক্ষে ২৫,০০০ টাকা। নির্দিষ্ট আয়কর রিটার্ন ফর্মটি সময়মত জমা না দিলে কঠিন শাস্তি হতে পারে। কিন্তু এমন কঠিন আইন সত্ত্বেও; ব্যক্তিগত আয়কর থেকে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ১৪০ কোটি টাকা (১৯৫০-৫১) থেকে বেড়ে ১৯৯৭-৯৮ সালে (সংশোধিত হিসাবে) ২৮,৭৫০ কোটি টাকা অথবা মোট কর-রাজস্বের ২০.১৪ শতাংশ হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বয়স্ক লোকেদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কিছুটা দয়া বা দাক্ষিণ্যের একটি বড় প্রমাণ উল্লেখ না করাটা খুবই অন্যায় হবে। উপযুক্ত প্রমাণসহ ৬৫ বছরের বেশি বয়সের কোন ব্যক্তি—স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ের মধ্যে যে কেউ—আয়করদাতা হিসাবে বড় রকমের একটা ছাড় পেতে পারবেন। ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত দেয় আয়কর থেকে তাঁরা অব্যাহতি পাবেন। ধীরে ধীরে আয়কর ছাড়া অন্য অনেক ক্ষেত্রেই—যথা বিমান ভাড়া, রেলের ভাড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তাঁরা ভালরকম ভরতুকি পেতে আরম্ভ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এজন্য বয়স্ক দেশবাসীর কাছে বিশেষভাবে ধন্যবাদের পাত্র।

কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ করের আর একটি বড় মাপের দৃষ্টান্ত হল কর্পোরেশন কর বা কোম্পানি কর। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের দিক থেকে বর্তমানে কর্পোরেশন কর সহ আয়কর তৃতীয় স্থান অধিকার করে। যৌথ কোম্পানির করকে বলা হয় কর্পোরেশন কর। (Corporation Tax)। রেজিস্টারিভুক্ত কোম্পানি বা যৌথ মূলধনি কোম্পানিগুলোর লাভের ওপর এই কর ধার্য করা হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালে কোম্পানি করের হার ছিল প্রায় ৪৬ শতাংশ। বিদেশি কোম্পানি এবং দেশীয় কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কর হারের পরিবর্তে একটি মাত্র কর-হার চালু করা হয়েছে। এই কোম্পানিগুলি যাদের লাভ ৭৫ হাজার টাকা বা তার বেশি, তাদের ১৫ শতাংশ হারে সারচার্জ দিতে হবে। সারচার্জ ছাড়া কোম্পানি করের হার হল ৪০ শতাংশ। একটি নির্দিষ্ট হারে (flat rate) এই কর ধার্য করা হলেও নানারকম রেয়াত (rebate) এবং কর অব্যাহতির ব্যবস্থা করা হয়। এই কর থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ৪০ কোটি টাকা (১৯৫০-৫১) থেকে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে ২১,৩৬০ কোটি টাকায় বা মোট কর-রাজস্বের ১৫%-এ নিয়ে আসা হয়েছে (১৯৯৭-৯৮ সালের সংশোধিত হিসাবে)। কর সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি শিল্পায়নের পরিচালক হলেও এই করের বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল মুদ্রাস্ফীতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে চেলিয়া কমিটির (এই কমিটি ভারতীয় কর ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য গঠিত হয়েছিল এবং ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এদের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেন। চেলিয়া কমিটির পরামর্শ অনুযায়ীই ১৯৯২-৯৩ থেকে ১৯৯৮-৯৯ সাল পর্যন্ত বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছিল) সুপারিশক্রমে কর্পোরেশন করের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৯৭-৯৮ সালে বিদেশি ও দেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানি কর-হার ধার্য করা হয়—দেশীয় কোম্পানির ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ ওবং বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে ৪৮ শতাংশ। দেশীয় কোম্পানির ওপর ধার্য সারচার্জ (৭.৫ শতাংশ) বিলোপ করা হয়েছে।

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কর্পোরেশন করের ক্ষেত্রে সংগৃহীত রাজস্বের সমস্ত অংশটাই ভোগ করে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার—আয়করের মতো এই করের কোন অংশই রাজ্যগুলোর মধ্যে অর্থ কমিশন বণ্টনের সুপারিশ করে না। স্বভাবতই, এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলোর কিছুটা ক্ষোভ রয়েছে এবং এরা এই

করের বণ্টনের দাবি জানিয়েই চলেছে। তবে, যেহেতু ব্যাপারটি সরাসরি সংবিধানের আওতার মধ্যে রয়েছে, এ বিষয়ে কোন পরিবর্তনের জন্য সংবিধানের সংশোধন করা সবথেকে আগে প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় রাজস্বের উৎস হিসাবে আরও যে কয়টি কর আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণত আসে সেগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য হল : (১) সম্পদকর (Wealth Tax) ও (২) দানকর (Gift Tax)। এর মধ্যে দানকরটির সম্প্রতি বিলোপ সাধন করা হয়েছে। এই করটি থেকে সংগ্রহের পরিমাণ ছিল নিতান্তই সামান্য— ১৯৯৮-৯৯ সালে এই বাবদ মাত্র ৫ কোটি টাকা সংগৃহীত হবে বলে ধরা হয়েছিল। সম্পত্তি-কর থেকে আদায়ের পরিমাণ ছিল দান-করের চেয়ে কিছুটা ভাল। ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেট প্রস্তাবে এ বাবদ মাত্র ১৪৫ কোটি টাকা সংগ্রহ হবে বলে ধরা হয়েছিল।

এবার আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের সূত্র হিসাবে দুটি পরোক্ষ করের কথা আলোচনা করব।

১৫.৪.২ কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রধান প্রধান উৎস : পরোক্ষ কর (Principal Sources of Revenue of the Union Government : Indirect Taxes)

পরোক্ষ কর : (১) বাণিজ্য শুল্ক—কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাণিজ্য শুল্ক (Customs Duty)— কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের পরেই। বাণিজ্য শুল্ক তথা আমদানি শুল্ক ও রপ্তানি শুল্ক থেকে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট সংগৃহীত অর্থের মোটামুটি এক-পঞ্চমাংশ পাওয়া যায়।

বর্তমানে (১) রাজস্ব সংগ্রহ, (২) বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ এবং (৩) পরিকল্পনার প্রয়োজন— প্রধানত এই তিনটি উদ্দেশ্যে বাণিজ্য শুল্ক ধার্য করা হয়। পরিকল্পনার প্রয়োজন বলতে লেনদেন ঘাটতি নিবারণ, দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণ ইত্যাদি বোঝায়। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে খুব উচ্চহারে আমদানি শুল্ক ধার্যের মাধ্যমে আমদানি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। অবশ্য ১৯৯১-৯২ সাল থেকে আমদানি শুল্ক কিছুটা কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং ১৯৯৩-৯৪ থেকে ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেটগুলিতে ব্যাপকভাবে আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে। অপরদিকে, রপ্তানি প্রসারের জন্যও শুল্ক যথাসম্ভব হ্রাসের নীতিই গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৮০-৮১ সালে এই সূত্র থেকে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৩৪১০ কোটি টাকা। ১৯৯৭-৯৮ সালে (সংশোধিত) তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪১,০০ কোটি টাকা বা মোট কর-রাজস্বের ২৮.৭ শতাংশ। রাজস্ব সংগ্রহের তাগিদে সরকার বাণিজ্য শুল্কের হার বৃদ্ধি করতে করতে সর্বোচ্চ ৩০০ শতাংশে নিয়ে আসেন। চেলিয়া কমিটির সুপারিশক্রমে বাণিজ্য শুল্কের হার কমাতে কমাতে ১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেটে তা কয়েকটি জিনিস ছাড়া অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশে আনা হয়েছে।

(২) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক : বর্তমানে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কই (Union Excise Duty) কেন্দ্রীয় কর-রাজস্বের সর্বপ্রধান সূত্র বা উৎস। ১৯৭০-৭১ সালে সংগৃহীত মোট কর-রাজস্বে কেন্দ্রীয় উৎপাদন-শুল্কের অবদান ছিল ৫৬ শতাংশ। ১৯৯০-৯১ সালে তা কমে গিয়ে ৪২.৫৮ শতাংশে এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে আরও কমে মাত্র ৩৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তবুও কর-রাজস্বের দিক থেকে এই করের অবদান এখনও সবচেয়ে বেশি। ১৯৯৭-৯৮ সালে উৎপাদন-শুল্ক বা অন্তঃশুল্ক বাবদ অর্থপ্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৪৭,৭০০ কোটি টাকা।

১৫.৪.৩ কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় (Expenditure of the Union Government)

আগেই বলা হয়েছে, সরকারি আয় ও ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব সরকারের বাজেটের চলতি খাতে এবং মূলধনি দ্রব্যের আয় ও ব্যয়ের হিসাব বাজেটের মূলধনি খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সরকারের যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যয় রাজস্ব বা বাজেটের চলতি খাতে দেখানো হয়। প্রশাসনিক ব্যয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়, ভরতুকি, ত্রাণ বা সাহায্য ইত্যাদি ব্যয় হল সরকারের চলতি খাতের ব্যয়। অপরদিকে, মূলধন সম্পদ সৃষ্টির জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ করা হয়, তা বাজেটের মূলধনি খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন, রেলপথ, সেচব্যবস্থা, নতুন শিল্প স্থাপন ইত্যাদি বিশেষ ধরনের উন্নয়নমূলক ব্যয় হল বাজেটের মূলধনি খাতের ব্যয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি অর্থব্যবস্থায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি হতে থাকে। এর প্রধান কারণ হল, জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের (Welfare State) ধারণার আবির্ভাব। সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হল জনকল্যাণ সর্বাত্মক করা। এই উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্য সরকার নানা ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করেছেন এবং সমাজের একটা বড় অংশকে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন। ভারতের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ১৯৫১ সাল থেকে ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয় এবং সেই সময় থেকেই সরকারকে নানা খাতে বহুলপরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৯৭-৯৮ সালের মধ্যে সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী পরিকল্পনা বা যোজনা ব্যয় (plan expenditure) এবং যোজনা-বহির্ভূত ব্যয় (non-plan expenditure) সব মিলিয়ে মোট ব্যয় ২২,২৫৬ কোটি টাকার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২,৩৫,২৪৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ২,৩৫,২৪৫ কোটি টাকার মধ্যে যোজনা খাতে ব্যয় হয়েছিল ৬০,৬৩০ কোটি টাকা বা মোট ব্যয়ের ২৬ শতাংশ এবং যোজনা-বহির্ভূত খাতে ব্যয় হল ১,৭৪,৬১৫ কোটি টাকা বা মোট ব্যয়ের ৭৪ শতাংশ। অর্থাৎ মোট সরকারি ব্যয়ে যোজন-বহির্ভূত ব্যয়ের প্রাধান্য অনেক বেশি। শতকরা হিসাবে ১৯৮০-৮১ সালে মোট ব্যয়ে যোজনা ব্যয় ও যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ের অংশ ছিল যথাক্রমে ৪০ শতাংশ এবং ৬০ শতাংশ। অর্থাৎ, যোজনা-বহির্ভূত ব্যয় উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। নীচে যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল, যা থেকে পাঠক-পাঠিকারা পরিকল্পনার যুগে, অর্থাৎ ১৯৫১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত, এ বিষয়ে একটি পরিষ্কার ছবি দেখতে পাবেন।

(১) প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় : বর্তমানে ভারত সরকারের পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা-বহির্ভূত মোট ব্যয়ের ১০.২ শতাংশের মতো যায় প্রতিরক্ষা খাতে। ১৯৫০-৫১ সালে এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৭১ কোটি টাকা। তখন থেকে নিয়মিত বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭-৯৮ (বাজেট হিসাব) তা ৩৫,৬২০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। মোট অনুন্নয়নমূলক ব্যয়ের এটি ছিল ১৭.৩৬ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বিশৃঙ্খলা, ভারতের সীমান্তে গোলযোগ, পাকিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্যের অভাব ইত্যাদির পরিপ্রক্ষিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবার যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তার জন্যই প্রতিরক্ষা খাতে বিশেষ ব্যয়বৃদ্ধি ঘটেছে। উপরন্তু, প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মীদের বেতন, ভাতা, পেনশন ইত্যাদিও বৃদ্ধি করা হয়েছে। আরও দুঃখের কথা, সম্প্রতি কাশ্মীর সীমান্তে ও উত্তর-পূর্ব ভারতে যেসব বীর সৈনিক দেশ রক্ষার জন্য শহিদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারের ভরণপোষণ ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য বেশ মোটা অংকের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্যও প্রচুর পরিমাণে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। তবে একটাই ভাল খবর : প্রতিরক্ষা খাতে আনুপাতিক ব্যয় ক্রমশ কমে আসছে ; দু-দশক আগে এটি ছিল মোট অনুন্নয়নমূলক

ব্যয়ের প্রায় ৩০ শতাংশ।

(২) সুদ প্রদান ও ঋণজনিত ব্যয় : বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন প্রয়োজনে সরকার যে ঋণগ্রহণ করেছেন, প্রধানত তার সুদ বাবদ সরকারি ব্যয়কে ঋণজনিত ব্যয় বলা হয়। এটি রাজস্ব খাতের অন্তর্ভুক্ত। ঋণ পরিশোধজনিত ব্যয় মূলধন খাতের হিসাবে ধরা হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ঋণজনিত ব্যয় ছিল ৩৭ কোটি টাকা ; ১৯৯৭-৯৮ সালে তা ৮১,১১৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে এই ব্যয়ের স্থান বর্তমানে প্রথম—মোট অনুন্নয়নমূলক ব্যয়ের ৪০ শতাংশ (১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেট হিসাব অনুযায়ী)।

(৩) ভরতুকি : ভরতুকি প্রদানের জন্য ভারত সরকারের পরিকল্পান-বহির্ভূত ব্যয় বিরাট আকার ধারণ করেছে। ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেট হিসাব অনুযায়ী এই খাতে ২২,০২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ভরতুকি দেওয়া হয় খাদ্য, সার, রপ্তানি প্রসার ইত্যাদির জন্য। বর্তমানে ভরতুকি হ্রাসে সরকার বদ্ধপরিকর। তাই বর্তমানে (১৯৯৭-৯৮ সালের সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী) এই খাতে ব্যয় হল মোট অনুন্নয়নমূলক ব্যয়ের ৯ শতাংশের সামান্য কম।

(৪) সাধারণ সেবা খাত : সাধারণ সেবা খাত বলতে বোঝায় রাজস্ব সংগ্রহ, কেন্দ্রীয় পুলিশ, পেনশন ইত্যাদির জন্য ব্যয়। এটিও দিন দিন বেড়ে চলেছে (বর্তমানে মোট ব্যয়ের ৮.৮৬ শতাংশ)। ১৯৯৭-৯৮ সালে এটির পরিমাণ ছিল ১৮,১৯০ কোটি টাকার মতো।

(৫) সমাজসেবা : পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে শিক্ষা, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, জনপ্রচার ইত্যাদি সমাজকল্যাণমূলক ব্যয় সমাজসেবা বলে অভিহিত। ১৯৮০-৮১ সালে এই ব্যয় ছিল ২৫০ কোটি টাকা। ১৯৯৭-৯৮ সালের সংশোধিত হিসাবে তা বেড়ে ৩,৪৬১ কোটি টাকা হয়েছিল। অবশ্য সমাজসেবার জন্য অধিকাংশ ব্যয়ই পরিকল্পনার অঙ্গবিশেষ বলে স্বীকৃত।

(৬) অর্থনৈতিক পরিষেবা : কৃষি, শিল্প, শক্তি, পরিবহন ইত্যাদির জন্য পরিকল্পনা-বহির্ভূত বা রাজস্ব খাতে ব্যয়কেই অর্থনৈতিক পরিষেবা বলা হয়। এর পরিমাণ ১৯৯৭-৯৮ সালে ৪৫০১ কোটি টাকার মতো ছিল। অবশ্য এইসব বিষয়ে উন্নয়ন ব্যয় আসে পরিকল্পনার দরুন বরাদ্দ থেকে।

(৭) অনুদান ইত্যাদি : রাজ্যসমূহকে অনুদান ও ঋণ পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয়ের অংশবিশেষ। বর্তমানে (১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেট হিসাব অনুসারে) এটি ৪৯৭০ কোটি টাকার মতো। ১৯৮৪-৮৫ সালে রাজস্ব খাতে মোট ব্যয়ের মধ্যে প্রতিরক্ষাজনিত ব্যয়, সুদ প্রদান ও ঋণজনিত ব্যয়, ভরতুকি ও রাজ্যগুলিকে অনুদান ও ঋণবাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩ শতাংশ, ২১.৪ শতাংশ, ১৩.৭ শতাংশ ও ১৮.৭ শতাংশ। ১৯৯৩-৯৪ সালে ঐ খাতগুলিতে ব্যয় হয়েছিল যথাক্রমে মোট ব্যয়ের ২০ শতাংশ, ১৪.৭ শতাংশ, ২৭ শতাংশ এবং ১৭ শতাংশ। কার্যত, প্রতিরক্ষা, সুদ ও ভরতুকি বাবদ ভারত সরকারের মোট ব্যয়ের প্রায় ৫০ শতাংশ ব্যয় হয়। ১৯৯৭-৯৮ সালের সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী অংকটি শতাংশের হিসাবে আরও কমে গেছে। এইভাবে যোজনা-বহির্ভূত খাতে ব্যয়বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনেক উন্নয়নমূলক ব্যয়কে কিছুটা কম করতে হচ্ছে। আনন্দের কথা, বর্তমানে যোজনা-বহির্ভূত ব্যয় ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে—অবশ্য শতাংশের হিসাবে।

সরকারি ব্যয়বৃদ্ধির কারণ : ১৯৫১ সাল থেকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে এবং তার

পর এ পর্যন্ত ৪৯ বছর ধরে একটানা অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য সরকারকে বিবিধ খাতে, বিশেষত কৃষি, শিল্প, পরিবহন, বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় ও বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। পরিকল্পনা যত এগোচ্ছে, ততই সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে সরকারি ব্যয়ের মাত্রাও বেড়ে গেছে এবং সেই বৃদ্ধির হার ক্রমশই দ্রুততর হচ্ছে। এটাই প্রথম এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণ।

এছাড়াও সরকারি ব্যয়বৃদ্ধির গতি ক্রমেই দ্রুততর হচ্ছে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে। প্রথমত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সূচনার পর থেকেই একটানা এই ৪৯ বছর ধরে জনকল্যাণকে সার্বিক রূপ দেবার জন্য সরকারকে বহুবিধ এবং যথেষ্ট ব্যয়বহুল সমাজসেবামূলক অনেক কাজে হাত দিতে হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সরকারকে খাদ্যদ্রব্য, সার, রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য বিপুল পরিমাণ ভরতুকি দিতে হচ্ছে। এর সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও ঋণজনিত ব্যয় সংযুক্ত করলে মোট ব্যয়ের পরিমাণ স্ফীত হয়ে ৫০ শতাংশের কাছে পৌঁছেছে এবং বৃদ্ধির গতি ভবিষ্যতে আরও দ্রুততার সঙ্গে বাড়বে বলে মনে হচ্ছে।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন রাজ্যকে নানাভাবে সহায়তা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি বিরাট ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে। কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলির প্রাপ্তব্য অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াও হল সরকারি ব্যয়বৃদ্ধির আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

চতুর্থত, সংসদীয় গণতন্ত্রকে সম্মান জানাতে গিয়ে সরকারি ব্যয়ের বহর ক্রমশ বেড়েই চলেছে। যেখানে প্রতি পাঁচ বছরে একবার সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ সংবিধানে দেওয়া হয়েছে, ইদানীংকালে সেখানে দেখা যাচ্ছে সাধারণ নির্বাচন একটি বার্ষিক ঘটনা না হলেও গড়পড়তা অন্তত পক্ষে দু-বছর পর পর ঘটেছে। এক একটি সাধারণ নির্বাচনে কেবলমাত্র সরকারি তরফে কমপক্ষে ১৫০/২০০ কোটি টাকা খরচ হয়, এর ওপর রয়েছে কয়েক হাজার প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারের জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয়। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের জন্য এগিয়ে আসছেন হাজার হাজার দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি, তাঁদের শাস্তি হওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন।

সবশেষে উল্লেখ করা যায়, সরকারি ব্যয়বৃদ্ধির আর একটি কারণ সম্ভবত অমিতব্যয়িতা। ভারতের সরকারি সংস্থাগুলিতে ব্যয় সংক্ষেপের নীতিটি তেমন যত্নসহকারে মেনে চলা হয় না। উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকে পেট্রল-জাতীয় তেলের দাম প্রতি বছরই একাধিকবার বাড়ছে, কিন্তু তেলের ব্যবহারের অন্তত কিছুটা ব্যয় সংক্ষেপের নির্দেশ আদৌ মানা হয় বলে মনে হয় না। এটা শুধু একটা ছোট দৃষ্টান্ত মাত্র। অন্য বহু ক্ষেত্রে ব্যয় সংক্ষেপের নীতি মেনে চলার জন্য কড়া সরকারি নির্দেশও মনে হয় অবলীলাক্রমে অমান্য করা হচ্ছে। সরকারি ব্যবস্থায় অকারণ অর্থের অপচয় এবং বেআইনিভাবে ব্যক্তিগত লাভের জন্য অর্থ সংগ্রহ বন্ধ করার অনেক নির্দেশ রয়েছে; ঐ সব নির্দেশ ঠিকমত মানা হচ্ছে কিনা দেখার জন্য তদারককারী কয়েকটি সংস্থা এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বেশ কিছু অধিকারিকও রয়েছেন, যথা Public Accounts Committee বা সরকারি হিসাব সমিতি, Comptroller and Auditor General (CAG) বা রাষ্ট্রীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও হিসাব পরীক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ আধিকারিক এবং সর্বোপরি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি। সংবিধান এঁদের সবাইকে অপরাধীদের ধরারও কঠিন শাস্তি দেবার পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন। সেই ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা, তা দেখার জন্য আমাদের পরবর্তী ও শেষ এককটিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব এবং আশা করব দেশের প্রতিটি সৎ ও আদর্শবাদী নাগরিক এ ব্যাপারে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন এবং সব রকম সহযোগিতা করবেন।

১৫.৫ অনুশীলনী

(১) চলতি বছরের কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
(২) কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান উৎসগুলি কি?
(৩) ঐ উৎসগুলির মধ্যে থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করগুলির কিছুটা পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করুন।
(৪) কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে আপনার মতামত জানান।

১৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

1. Bhattacharya, Mohit–New Horizons of Public Administration
2. মুখোপাধ্যায় দেবেশ—সমকালীন ভারতীয় অর্থনীতি
3. Reserve Bank of India–Annual Reports on Currency & Finance
4. Government of India–India 1999.

একক ১৬ ☐ বাজেট অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ, বিভিন্ন খাতে ব্যয় এবং আয়ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ

গঠন

১৬.১ উদ্দেশ্য
১৬.২ প্রস্তাবনা
১৬.৩ আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষা ও তদারকি
১৬.৩.১ বাজেট সম্পর্কে অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব
১৬.৩.২ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও হিসাব-পরীক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ আধিকারিক
১৬.৩.৩ সরকারি হিসাব সমিতি
১৬.৪ আইন-বহির্ভূত ব্যয় ও দুর্নীতি রোধ করা
১৬.৫ অনুশীলনী
১৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১৬.১ উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একক এবং এখনকার মতো এ বিষয়ে এটিই শেষ একক। অনুমোদিত বাজেট অনুসারে কর-রাজস্ব ও অন্যান্য উৎস থেকে একদিকে অর্থ সংগ্রহ করা হবে এবং অন্যদিকে সংগৃহীত অর্থ প্রথমে রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা হবে এবং তার পরে সেই তহবিল থেকে অনুমোদিত ব্যয়বরাদ্দ অনুসারে তা বিভিন্ন খাতে প্রয়োজন অনুযায়ী একে একে ব্যয় করা হবে। স্বভাবতই আয় ও ব্যয়ের হিসাব যথেষ্ট যত্নসহকারে এবং বাজেট সংক্রান্ত আইন ও বিধান অনুযায়ী তৈরি করা হবে এবং সব শেষে বিভিন্ন স্তরে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মারফত দেখতে হবে, সংবিধান ও আইন অনুযায়ী বছরের আয়ব্যয় ঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা, সুতরাং এই শেষ এককটি ভাল করে পড়ার ও আলোচনার পর আপনারা জানতে পারবেন :

- রাজস্ব সংগ্রহ কিভাবে হচ্ছে এবং কোন্ তহবিলে কিভাবে জমা হচ্ছে।
- ঐ সংগৃহীত রাজস্ব কোন্ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে তুলে অনুমোদিত ব্যয়বরাদ্দ অনুসারে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রকের মারফত খরচ করা হচ্ছে।
- রাজস্ব সংগ্রহ এবং তা থেকে অনুমোদিত ব্যয় যা হচ্ছে, তার তদারকি ও আয়ব্যয়ের হিসাব রক্ষার কি ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে।
- আয়ব্যয়ের ঐ হিসাব অত্যন্ত যত্নসহকারে প্রাথমিক অবস্থায় কিভাবে করা হচ্ছে।
- পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চতর এবং শেষ পর্যায়ে সর্বোচ্চ স্তরে ঐ হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কি ব্যবস্থা রয়েছে এবং তা কতখানি কার্যকর এবং সব শেষে—
- কোনরকম অনিয়ম ও-আইন-বহির্ভূতভাবে সংগ্রহ বা ব্যয় হয়ে থাকলে তার জন্য কি ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১৬.২ প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনায় নতুন করে বলার তেমন কোন কথা নেই। তবে বাজেট ব্যবস্থা অনুযায়ী সারা বছরের আয়ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ রাখার এবং বিশেষ যত্নসহকারে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে ব্যবস্থার কথা উপরে আমরা বলেছি, সে সম্পর্কে কিছু বিশেষজ্ঞের মতামত আমরা এখন পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। জনপ্রশাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের অন্যতম ডঃ মোহিত ভট্টাচার্যের মন্তব্য দিয়েই আমরা এই আলোচনা শুরু করছি। তাঁর অনবদ্য ভাষায় অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন, "ছোটখাটো একটি আর্থিক তহবিল ছাড়া যেমন একটি পরিবার চালানো যায় না, সেইভাবেই একটি দেশ বা সমাজের দৈনন্দিন কাজও সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়, যদি দেশে একটি সুসংগঠিত সরকার না থাকে এবং তাদের হাতে অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা না থাকে। সরকার অর্থ সংগ্রহ করে থাকেন কর-রাজস্ব ও অন্যান্য কর-বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহের সূত্র থেকে। সংগৃহীত অর্থ ঐ দেশের জনসাধারণ ও সমাজের নিজস্ব তহবিল এবং ঐ তহবিল থেকে সরকারকে তাঁরা অনুমোদিত কার্যক্রম সুসম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে থাকেন।" ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলিতে এখন তাঁরা বেসরকারি উদ্যোগের উপরই প্রধানত নির্ভর করেন। কিন্তু ভারতবর্ষ সহ তৃতীয় বিশ্বের মানুষ ও তাঁদের সরকার এখনও পর্যন্ত সরকারি উদ্যোগের উপরই বেশি নির্ভর করেন এবং তার সাফল্যের আশায় তাঁরা বসে থাকেন। এর পরিণতি যে সব সময়ে খুব সফল ও সার্থক হয়, তার কোন নিশ্চয়তা নেই—বরং উলটোটাই ঘটে থাকে অধিকাংশ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সেজন্য এইসব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে উপদেশ দেয়, সরকারের বিভিন্ন ধরনের কাজ ও সেই সঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের সংখ্যা এবং ঐ বাবদ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে কমিয়ে আনতে। জানি না, একে এগিয়ে যাওয়া বলা হবে কিনা, অথবা অসফল হয়ে ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসা! সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশগুলি সাধারণত এ প্রস্তাবে রাজি হয় না, কিন্তু আমাদের নিজেদের দেশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ বিষয়ে আমাদের অনেক ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন আছে বলে চিন্তাশীল পণ্ডিত ব্যক্তিরা অনেকেই মনে করেন ও সেই অনুসারে উপদেশও দিয়ে থাকেন।

১৬.৩ আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষা ও তদারকি (Maintenance & Supervision of Accounts : Receipts & Expenditure)

আমরা আগেই বলেছি, সংবিধানের ১১২ নং ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত মন্ত্রক ও বিভাগ নতুন বছর আরম্ভ হওয়ার অন্ততপক্ষে ৬/৭ মাস আগে থেকেই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিভাগীয় উচ্চপদাধিকারী আমলাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করে ঐ বিভাগের জন্য আয় ও ব্যয়ের একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করে। ব্যয়ের অংশটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমে তৈরি করা হয়। এই অংশ তৈরির সময়ে নতুন কোন প্রকল্প যা সংসদে বা মন্ত্রীসভায় ইতিমধ্যে আলোচিত ও নীতিগতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি নতুন বছরের বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চালু প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে যে যে প্রকল্প সরকারের অনেক আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়েছে বা জনগণের কাছে

তেমন প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়নি, সেগুলি হয় পুরোপুরি বাতিল করা হয় অথবা তাদের আংশিক সংশোধন করা হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় বাজেটের ওপর সংসদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ও বাজেটের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটিও গঠিত হয়। যার নাম 'প্রস্তাবিত আয়ব্যয় সংক্রান্ত কমিটি' (Estimates Committee)। এই কমিটি এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উচ্চপদাধিকারী আমলারা এবার বাজেটের অন্য দিকটি —অর্থাৎ আয়বৃদ্ধির ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনায় বসেন। ব্যয় বৃদ্ধি যতটা সহজ, আয় বৃদ্ধি ততটাই—এবং সম্ভবত তার চেয়েও কঠিন। কোন কোন কর থাকবে, ঐসব করের হারের কোন পরিবর্তন হবে কিনা, নতুন কোন কর ধার্য করা হবে কিনা এবং কি হারে সেগুলি ধার্য হবে, কর-বহির্ভূত অন্য কোন পথ অবলম্বন করে রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানো হবে কিনা, কোন্ বিভাগে লোক ছাঁটাই ও নতুন লোক নেওয়া হবে, নতুন কোন প্রকল্পের জন্য দামী যন্ত্রপাতি কিনতে হলে তার জন্য অর্থ কিভাবে আসবে—এ সবই দীর্ঘ আলোচনার পর চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হবে।

এইভাবে বাজেট তৈরি ও অনুমোদনের পর তা কার্যকর হবে। আমাদের এই গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য কয়েকটি বিধান সব বিভাগ ও মন্ত্রকেই বাধ্যতামূলকভাবে চালু হবে। এগুলি হল: (১) সংসদের অনুমোদন বা সম্মতি ভিন্ন কোন কর ধার্য করা চলবে না অথবা সেই উৎস থেকে কোন রাজস্ব সংগ্রহ করা চলবে না। (২) সংগৃহীত রাজস্ব বা রাজস্ব-বহির্ভূত সংগৃহীত সমস্ত অর্থ জমা দেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান তহবিলে যার নাম, আগেই বলা হয়েছে পুঞ্জীভূত রাষ্ট্রীয় তহবিল বা Consolidated Fund of India. (৩) এই তহবিল থেকে কোন অর্থ তোলা যাবে না বা খরচ করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা সংসদের অনুমোদন না পাবে। (৪) বিভাগ ও মন্ত্রকগুলি অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হলে, তা সংসদের অনুমোদিত পদ্ধতিতেই মাত্র খরচ করা যাবে। অন্য কোনভাবে নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাজেট এবং তার থেকে আয়ব্যয়ের পুরো ব্যাপারটিই দেখাশোনা করবেন কেন্দ্রীয় অর্থ-বিষয়ক মন্ত্রক (The Ministry of Finance)। যে কোন ক্ষেত্রে সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয়বরাদ্দ বিভাগীয় মন্ত্রক তার নিজস্ব ইচ্ছানুসারে যেমন খুশি বা যখন খুশি ব্যবহার করতে পারবে না। সংসদের পক্ষ থেকে পুরো ব্যবস্থাটাই নিয়ন্ত্রণ করবে অর্থ-বিষয়ক মন্ত্রক এবং তারপরে রাষ্ট্রীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও হিসাব পরীক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ আধিকারিক (Comptroller and Auditor General of India)। তাঁকে এখন থেকে সংক্ষেপে CAG বলে অভিহিত করব।

১৬.৩.১ বাজেট সম্পর্কে অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব (Responsibility of the Finance Ministry in respect of the Budget)

বাজেট চালু রাখা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের ক্ষমতা ও দায়িত্বের কথা একটু আগেই সংক্ষেপে বলা হয়েছে, এখন এ বিষয়ে আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক এক হিসাবে সারা দেশের আর্থিক প্রশাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রকের মারফত অর্থসংগ্রহ এবং অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং ঐ ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার না করলে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন বিভাগই এক পয়সা রাজস্ব বা রাজস্ব-

বহির্ভূত আদায় বা খরচ করতে পারে না। এই মন্ত্রকই শুধু অর্থব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে না, বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রকের মধ্যে সংযোগ রক্ষার ব্যাপারেও এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রায় সীমাহীন। অর্থব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রকের মধ্যে সংযোগ রক্ষা ছাড়াও, কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক নীতি নির্ধারণেও এই মন্ত্রকের হাতে প্রচুর ক্ষমতা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সাধারণত যোজনা কমিশনের সহকারী চেয়ারম্যান হন এবং সেই পদের অধিকারী হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই তিনি দেশের সমস্ত প্রকল্পের পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারেও প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হন। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ও নীতি নির্ধারণেও তাঁর বিশাল দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেসব আন্তঃরাজ্য কমিটি গঠিত হয়, তিনি সেইসব কমিটিরও চেয়ারম্যান হন এবং তাঁর মতামত অনুযায়ীই সাধারণত আমাদের দেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারিত হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাতেও তাঁর স্থান সাধারণত প্রধান মন্ত্রীর পরেই। অপর যে প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী আধিকারিকের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে নিঃসন্দেহে তিনিই হলেন CAG। এবার আমরা তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতা ও দায়িত্বের কথা আলোচনা করব।

১৬.৩.২ রাষ্ট্রীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও হিসাব পরীক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ আধিকারিক (Comptoller and Auditor General of India)

ভারতীয় সংবিধানে যে কয়জন আধিকারিককে বিরাট ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, রাষ্ট্রীয় ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ও হিসাব-পরীক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ আধিকারিক বা সংক্ষেপে CAG। এক হিসাবে তিনি মহাশক্তিশালী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকেও ক্ষমতার লড়াইয়ে হারাতে পারেন—কিভাবে ও কেন তা আমরা এখনই জানাব।

সংবিধানে ১৪৮ নং ধারায় বলা হয়েছে : "There shall be a Comptroller and Auditor General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and Seal and shall only be removed from office in the manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court". অর্থাৎ ভারতের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রীয় ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ও হিসাব-পরীক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ আধিকারিক CAG-কে নিয়োগ করবেন এবং একমাত্র সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের যে কারণে ও যে পদ্ধতিতে তাঁদের নিজ নিজ পদ থেকে অপসারিত করা যায়, কেবলমাত্র সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেই তাঁকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করা যাবে। CAG-র ক্ষমতার প্রধান উৎস এটাই, কারণ স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী, যাঁরই সঙ্গে যে কোন ব্যাপারে তাঁর মতপার্থক্য হোক না কেন, তাঁকে তাঁর পদ থেকে সহজে অপসারিত করতে পারেন না বা কোন ব্যাপারে কোন মতানৈক্য হলে তাঁকে বাধ্য করতে পারেন না তাঁদের মতানুসারে কোন কাজ করতে বা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে । CAG রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৬ বছরের জন্য নিযুক্ত হন এবং ৬৫ বয়স বছর পর্যন্ত কাজ করতে পারেন। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের মতোই তাঁরা অবসর গ্রহণের পর অন্য কোন সরকারি কাজে যোগদান করতে পারেন না, অর্থাৎ অন্য কোন উচ্চ বা উচ্চতর পদের প্রলোভন দেখিয়ে কেউ তাঁদের কোন ব্যাপারে নিজের মত পরিবর্তনে বাধ্য করতে পারেন না। এখন দেখা যাক, তাঁদের ক্ষমতার উৎসটি ঠিক কি, অর্থাৎ কোন্ পদ্ধতিতে তাঁদের নিজ নিজ পদ থেকে অপসারিত করা যায়।

সংবিধানের ১২৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, সুপ্রিমকোর্টের কোন বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি তাঁর পদ থেকে

অপসারিত করতে পারেন যদি সংসদের একই অধিবেশনে সংসদের উভয় সভাতেই সদস্যদের মোট সংখ্যার অন্তত অর্ধেক এবং উপস্থিত থেকে ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ তাঁর বিরুদ্ধে মত প্রকাশের পর তাঁর অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানান। সংসদের উভয় সভায় মোট সদস্যদের অন্তত অর্ধেক এবং উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি পাওয়া এমনিতেই অত্যন্ত কঠিন কাজ। বর্তমান অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অর্থাৎ সংবিধানে ব্যবস্থা থাকলেও বাস্তবে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা সংসদ কেউই তাঁদের বর্তমান বা অনুরূপ অবস্থায় পদ থেকে অপসারিত করতে পারেন না। তাঁদের অপরিসীম ক্ষমতা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁরা ব্যবহার করতে পারেন। চাকরির ক্ষেত্রে CAG-র পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংবিধানে আরও বলা হয়েছে, কাজে যোগদানের আগেই সংসদ আইন মারফত তাঁদের মাহিনা, অন্যান্য বিশেষ ধরণের ভাতা, ছুটি সংক্রান্ত নিয়মাবলী, অবসর গ্রহণের বয়স এবং চাকরির ব্যাপারে অন্য নিয়মাবলী স্থির করবেন এবং এদের কোনটিতেই তিনি নিজের কাজে যোগদান করার পর তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনক হয় এমন কোন পরিবর্তন করা যাবে না। CAGর অফিসের অন্য কর্মচারীদের মাইনে, ভাতা, পেনশন এবং অফিস চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব খরচপত্রও পুঞ্জীভূত রাষ্ট্রীয় তহবিল (Consolidated Fund of India) থেকে সংসদের অনুমোদন ছাড়াই নেওয়া যাবে।

সংবিধান তাঁকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার জন্য যা যা প্রয়োজন তা সবই দিয়েছেন এবং অর্থসংগ্রহ, অর্থব্যয় ও পুঞ্জীভূত রাষ্ট্রীয় তহবিল সম্পর্কেও পূর্ণ দায়িত্ব তাঁরই হাতে তুলে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লি ছাড়াও প্রত্যেকটি রাজ্য-রাজধানীতেও তাঁর অফিস রয়েছে, বিভিন্ন জেলা বা মহকুমা সদরেও তাঁর অফিসের শাখা বা কোষাগার রয়েছে। তাঁর ক্ষমতার মাত্রা এতই বেশি যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক বা অর্থমন্ত্রীর অনুমোদনের পরও তিনি বা তাঁর অফিস যে কোন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করতে আপত্তি করতে পারেন। বিভিন্ন বিভাগে যে অর্থ জমা পড়ে এবং যা ব্যয় হয়, তার সমস্ত হিসাব রক্ষার পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতাও তাঁর রয়েছে এবং এসব ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত তিনি নেন, সেটাই চরম ও প্রায় অপরিবর্তনীয় বলে সরকারি মহলে সকলকে গ্রহণ করতে হয়। তিনি বা তাঁর অফিস সমস্ত বিভাগের জমা ও খরচের বিস্তারিত হিসাব রাখেন, ঐ হিসাব তৈরি করার জন্য তাঁর কর্মচারীরা সদলবলে প্রতি বছর সমস্ত বড় বড় অফিসের নথিপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র ও ফাইল দেখে থাকেন। যে কোন ব্যাপারে কোন সন্দেহ হলে, তাঁরা সে-সম্পর্কে ঐ অফিস-প্রধানের মতামত ও জবাব চাইতে পারেন এবং তাতে সন্তুষ্ট না হলে তাঁদের নিজস্ব অফিসের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের কাছেও তা জানাতে পারেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

CAG-র ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের সংবিধানের ১৫০ নং ধারায় আরও বলা হয়েছে, "The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the President may, after consultation with the CAG, prescribe". অর্থাৎ CAG-র সঙ্গে আলোচনা করে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত নেবেন কিভাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির আয়ব্যয়ের হিসাব রাখা হবে। এর পরের ধারাতেই (১৫১ নং ধারা) বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ব্যয় সম্পর্কে CAG-র রিপোর্ট তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি সেটি সংসদের দুই সভাতেই একে একে পেশ করবেন। বলা বাহুল্য, আর্থিক ব্যাপারে লোকসভার ক্ষমতা রাজ্যসভার চেয়ে বেশি হওয়ায় রিপোর্টটি সাধারণত প্রথমে সেখানেই পেশ করা হয়। রাজ্য সরকারগুলির আয়ব্যয়ের রিপোর্টও অনুরূপভাবে রাজ্যপালদের কাছে CAG জমা দেবেন এবং তাঁরা সেগুলি রাজ্য আইনসভায় পেশ করবেন।

CAG-র কাজ শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির আয়ব্যয়ের হিসাব তৈরি ও পরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর এবং তাঁর অফিসের দায়িত্ব বা কাজ হল, এই হিসাবগুলি বিশেষ যত্নের সঙ্গে নিরীক্ষা করা, যাকে আমরা চলতি ভাষায় বলে থাকি অডিট করা। অডিটের কাজ হিসাব-রক্ষকের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ। অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্যের মত বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতবর্ষের মধ্যে বা বাইরে কোন দেশে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি যে অর্থ সংগ্রহ করেছেন এবং যা এই হিসাবের মধ্যে ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে, সেই ব্যয়গুলি করার আইনগত অধিকার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের ছিল কিনা এবং ঐ অর্থ ব্যয় করার আগে প্রযোজ্য সব আইনকানুন ও বিধান ঠিকমত মানা হয়েছিল কিনা, এ সবই CAG-র প্রতিনিধিরা খুব যত্নের সঙ্গে দেখবেন। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, হিসাব রক্ষার কাজের চেয়ে (maintenance of accounts) ঐ হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ (auditing the accounts) আরও কত বেশি কঠিন, দায়িত্বপূর্ণ ও সমস্যাসংকুল। অডিট রিপোর্টের মধ্যে আরও দেখাতে হবে, কোন বিষয়ে যে পরিমাণ অর্থব্যয় মঞ্জুর হয়েছিল, প্রকৃত ব্যয় তা ছাড়িয়ে গেছে কিনা, ঐ ব্যয়ের জন্য যথাযথ উচ্চতর আধিকারিকদের সম্মতি যথাসময়ে পাওয়া গিয়েছিল কিনা এবং সরকারি অর্থের কোন অপচয় ঘটেছে কিনা বা দুর্নীতি অবলম্বনে বেআইনিভাবে সরকারি অর্থ কোন অসৎ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আত্মসাৎ করেছে কিনা (whether there was any case of misappropriations or waste of funds)। CAG-র কাজের মধ্যে সম্ভবত এই কাজটিই সবচেয়ে কঠিন, বিপজ্জনক ও দায়িত্বপূর্ণ। 'বিপজ্জনক' বলা হল কেন, একটু চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারবেন। যেসব সৎ ব্যক্তি দুর্নীতিপরায়ণ অসাধু লোকদের সম্পর্কে সরকারকে টাকা আত্মসাৎ করার ব্যাপারটি সাক্ষ্যপ্রমাণ-সহ জানাবেন, তাঁদের পক্ষে সেটা যে কত বড় ঝুঁকি তা বলার নয়। এই সৎ কাজের জন্য তাঁদের অনেককেই জীবনের চরম মাশুল দিতে হয়েছে। তবুও গণতন্ত্রের খাতিরে এ ব্যাপারে সৎ ব্যক্তিদের সাহায্য করা, কাজে প্রেরণা জোগানো দেশের বাকি সৎ ব্যক্তিদের পক্ষে অতি পবিত্র জাতীয় কর্তব্য।

CAG-র রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অতি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। তবে তার সদ্ব্যবহার বা অপচয় সম্পর্কে শেষ কথা বলার অধিকার সম্ভবত আইন বা সংবিধানে তাঁর নেই। সে অধিকার আছে দেশের জনগণের যাঁদের ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সাংসদরা নির্বাচিত হয়েছেন। এই কাজটুকু করার জন্য তাই প্রয়োজন আরও একটি সংস্থার যার নাম সরকারি হিসাব সমিতি বা Public Accounts Committee. এখন এই কমিটি সম্পর্কে আমরা পাঠক-পাঠিকাদের কিছুটা অবহিত করার চেষ্টা করব।

১৬.৩.৩ সরকারি হিসাব সমিতি (Public Accounts Committee)

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ব্যয় নির্ধারণ করা এবং হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য CAG ছাড়া অন্য যে দুটি কমিটি গঠিত হয় তাদের মধ্যে সরকারি হিসাব সমিতি (Public Accounts Committee) নিঃসন্দেহে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী এবং এই সমিতি অত্যন্ত যত্নসহকারে তাঁদের প্রধান দায়িত্বগুলি—সরকারি অর্থের অপচয় বন্ধ করা এবং সংসদের অনুমোদন ছাড়াই আইন-বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে না দেওয়া—নিয়মিতভাবে পালন করে থাকেন। সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত এই সরকারি হিসাব সমিতির সভাপতি সাধারণত বিরোধী দলের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হন এবং লোকসভা থেকে

সাধারণত ১৫ জন ও রাজ্যসভা থেকে ৭ জন এই সমিতির সদস্য হন।

CAG-র রিপোর্ট অত্যন্ত যত্নসহকারে তৈরি হয়। একথা আগেও কয়েকবার বলা হয়েছে। রিপোর্ট চূড়ান্তভাবে তৈরি হলে CAG কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে রিপোর্টটি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করেন এবং তার পরবর্তী ধাপে রাষ্ট্রপতি রিপোর্টটি সংবিধানের ১৫১ নং ধারা অনুযায়ী সংসদের দুটি কক্ষের সামনে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপিত করেন।

সরকারি হিসাব সমিতির কাজের ধরন ঠিক কি জাতীয়, তা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাঁদের ১৯৯৬-৯৭ সালের রিপোর্টে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে, সমিতির নির্দেশে সভাপতি ১৯৯৪-৯৫ সালে প্রথম দফায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান বিভাগ ও মন্ত্রকগুলির মধ্যে কয়েকটিকে বেছে নিয়েছেন, যারা অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে। প্রথম দফায় যে মন্ত্রকগুলি তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন, তার মধ্যে ছিল রেল ও চলাচল ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ডাক ও তার বিভাগ, পেট্রোলিয়ম ও স্বাভাবিক গ্যাস উৎপাদন ইত্যাদি। এই বিভাগ বা মন্ত্রকগুলি সম্পর্কে CAG-র অডিট রিপোর্ট তাদের বিস্তারিত মন্তব্য প্রথমে আলোচিত হয়েছে, বিভাগ ও মন্ত্রকগুলির বক্তব্যও লিখিতভাবে বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে। তার পরবর্তী পর্যায়ে ঐ বিভাগ ও মন্ত্রকগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই সমিতির দীর্ঘ মৌখিক আলোচনা হয়েছে, মৌখিক আলোচনার শেষে এই সমিতি আবার তাঁদের শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং তার পর তাঁদের রিপোর্ট সংসদে পেশ করেছেন। নিয়ম-বহির্ভূত অতিরিক্ত যেসব ব্যয় করা হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাঁরা সেগুলি যথাযথভাবে অনুমোনের ব্যবস্থাও করে নিয়েছেন। এইভাবে দফায় দফায় আরও কয়েকটি বিভাগ ও মন্ত্রকের আয়ব্যয় সম্পর্কে CAG-র পেশ করা রিপোর্টেও এই সমিতি এই একই পদ্ধতিতে আইনগত দোষগুলি সংশোধনের ব্যবস্থা করেছেন সংবিধানের ১১৫নং ধারা অনুসরণ করে এবং ভবিষ্যতে ঐ জাতীয় ভুলভ্রান্তি যাতে আর না হয়, সেভাবে তাদের পরামর্শ ও উপদেশ দিয়েছেন।

উপরে যে বিবরণটি দেওয়া হল তা থেকে বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় CAG ও সরকারি হিসাব সমিতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রকের আর্থিক কাজকর্মগুলি ঠিকমত চালু রাখতে প্রচুর সাহায্য করে থাকেন। রাজ্য সরকারগুলির ক্ষেত্রেও কোনরকম নিয়ম-বহির্ভূত কাজকর্ম হওয়া সম্ভব নয়, কারণ সেখানেও মোটামুটি একই ধরনের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করার আগে একটা অত্যন্ত জরুরি মন্তব্য করা প্রয়োজন বলে বোধ করছি। উপরে যে বিবরণ দেওয়া হল তা থেকে মনে হতে পারে সরকারের নির্বাহী বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে কিছুটা বিবাদ সৃষ্টি করাই বুঝি এই সমিতির উদ্দেশ্য। এই ধারণা কিন্তু একেবারেই ভুল। সরকারের দুই বিভাগের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এবং তার দরুন আর্থিক বিষয়ে তাঁদের মধ্যে যাতে কোনরকম তিক্ততা সৃষ্টি না হয়, সেটাই CAG ও এই সরকারি হিসাব সমিতির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১৬.৪ আইন-বহির্ভূত ব্যয় ও দুর্নীতি রোধ করা (Avoiding Irregular Expenditure and Corruption Cases)

বহু অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ ও উচ্চপদে কর্মরত আধিকারিকদের দৃঢ় ধারণা, ভারতীয় অর্থব্যবস্থা আজ দুর্নীতিতে ভরে গেছে। এই দুর্নীতি কিছুটা দমন করতে না পারলে অদূরভবিষ্যতে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে আমাদের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

সাম্প্রতিক কালে দুর্নীতির যেসব দৃষ্টান্ত আমরা নিজের চোখেই দেখছি বা কানে শুনছি, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর বিষয়টি হল প্রতিরক্ষা বিভাগকে কেন্দ্র করে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের কয়েকজন পর্যন্ত এই ব্যাপারে লিপ্ত রয়েছেন বা ছিলেন বলে অনেকেরই দৃঢ় ধারণা বা সন্দেহ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই গুরুত্বপূর্ণ মামলাটির মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন এবং দোষী ব্যক্তিদের আইন-মাফিক শাস্তি হওয়া দরকার। এত বড় একটি মামলার নিষ্পত্তি যদি শেষ পর্যন্ত না হয় তা হলে আমাদের এই দেশ ও সমাজ দুর্নীতিতে ভরে যাবে।

অপর একটি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পারিবারিক আয় ও সম্পত্তি কয়েক লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে আয়কর বিভাগের নথিপত্র থেকে দেখা যায়। সম্প্রতি একটি পারিবারিক উৎসবে কোটি টাকার ওপর ব্যয় করেছেন, এখন জামিনে রয়েছেন এবং মোকদ্দমা খুব ধীরগতিতে এগোচ্ছে। একই রকম অভিযোগে এক সঙ্গে বেশ কয়েকটি মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন আর একটি রাজ্যের একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

IAS বা IPS-এর অন্তর্গত অনেক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অফিসারদের মধ্যে বিপুলসংখ্যক কর্মী আয়ের তুলনায় অনেক বেশি সম্পদ ও সম্পত্তির মালিক হওয়ার দরুন এবং আয়কর বিভাগকে কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারায়, এঁদের একটি বড় অংশ চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন, অথবা মোকদ্দমা চলাকালীন জামিনে আছেন বা হাজতবাস করছেন অথবা কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। অথচ এঁরাই হলেন আমাদের প্রশাসনের প্রধান খুঁটি, এঁদের দক্ষতা ও সততার ওপরই নির্ভর করছে সারা ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ভবিষ্যৎ। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনার একটি রিপোর্টে জানিয়েছেন, চরম দুর্নীতির অভিযোগে যে-সব উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে IAS রয়েছেন ৯২ জন, IPS ২২ জন, Indian Revenue Service (Income Tax or Customs)-এর কর্মী ৮০ জন, সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার দায়িত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন মোট ১৩৩ জন ইত্যাদি (Statesman, 10.5.2000, p.8)।

শুধুমাত্র একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিদেশে চিকিৎসার জন্য গত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের ৭ কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়েছে বলে সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে। আরও বহু মন্ত্রীর বিদেশে চিকিৎসার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে বা হচ্ছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের কয়েক জনের কাছে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে সরকারি বিমানের ভাড়া বাবদ প্রায় ৩০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি দাবি করেছেন। এই টাকা সরকারি তহবিলে কোনদিনই আসবে কিনা তা ঘোরতর সন্দেহের বিষয়।

এই ধরনের অহেতুক, অযৌক্তিক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন-বহির্ভূত ব্যয় যেভাবেই হোক বন্ধ করতেই হবে। নতুবা এ জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশই বাড়তে থাকবে। এজন্য শুধু CAG ও তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারীদের

সাধ্যমত চেষ্টাই যথেষ্ট নয়। দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অসংখ্য সৎ নাগরিকের একান্ত আন্তরিক প্রচেষ্টাও বিশেষভাবে প্রয়োজন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের জন-প্রশাসন ব্যবস্থায় এগুলির অভাব ঘটবে না এবং ভারত আবার উন্নত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নিজের স্থান খুঁজে নিতে পারবে।

১৬.৫ অনুশীলনী

(১) কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব রক্ষা ও তদারকি কিভাবে হয়, সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(২) কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব কতটা এবং তা ঠিকমত পালিত হচ্ছে কি ?

(৩) রাষ্ট্রীয় ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ও হিসাব-পরীক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ আধিকারিকের (CAG) ভূমিকা সম্বন্ধে একটি রচনা লিখুন।

(৪) আইন-বহির্ভূত ব্যয় ও দুর্নীতি দমন সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মতামত অল্প কথায় জানান।

১৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি

1. Bhattacharya, Mohit–New Horizons of Public Administration.
2. Reserve Bank of India–Annual Reports on Currency & Finance.
3. Annual Reports of Public Accounts Committee.
4. CAG's Annual Reports.

NOTE

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে ; সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—*সুভাষচন্দ্র বসু*

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—*Subhas Chandra Bose*

Price : Rs. 150.00

Published by : Netaji Subhas Open University, 1 Woodburn Park, Kolkata-700 020
and Printed at : SEVA MUDRAN, 43, Kailash Bose Street, Kolkata-700 006